আলোচনা-প্রসঙ্গে

ঊনবিংশ খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

(পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

(ঊনবিংশ খণ্ড)

SATSANG PUBLISHING HOUSE
SATSANG.

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম. এ.

প্রকাশক :
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
বিহার

প্রথম সংস্করণ :
৫ই অগ্রহায়ণ, ১৪০০

মুদ্রাকর :
শ্রীকাশীনাথ পাল
প্রিন্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০১২

Alochana-Prasange
[Conversation with
Sri Sri Thakur Anukulchandra]
19th Part, 1st Edition
Complied by :
Sri Prafulla Kumar Das. M.A.

নিবেদন

মানুষ অমৃতের সন্তান। অমৃতই তার কামনার ধন। এই অমৃতের তপস্যাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে দেওঘর ঠাকুর-বাংলোয় যতি-আশ্রমের প্রবর্ত্তন করেন। যতিবৃন্দের জন্য গৃহরচনা সমাপ্ত হয় ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে। সেই থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ কয়েক বৎসর সকাল, বিকাল ও রাত্রে ওখানেই বসতেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে, ঊনবিংশ খণ্ড সুরু হয় ২৫শে মাঘ, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ৮।২।১৯৫০) থেকে। এই সময় পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে যতিদের সঙ্গে নানা তত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত থাকতেন।

তখন পূর্ব্বপাকিস্তানে পুনর্ব্বার গোলমাল সুরু হয়, ফলে অনেকেই ভিটেমাটি ত্যাগ ক'রে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন। এই দুঃসংবাদে শ্রীশ্রীঠাকুর মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়েন। সেই সময় তিনি হামেশাই দেশবিভাগের কুফল সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। তাঁর মত হ'লো, এটা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে মহা অকল্যাণকর হয়েছে। তিনি বলতেন—ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক এবং প্রেরিতগণ একবার্ত্তাবাহী। সব ধর্ম্মমত মূলতঃ যে এক এবং ধর্ম্মের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কোন স্থান নেই, তা' তিনি অকাট্য যুক্তি সহকারে তুলে ধরতেন। পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার ভিতর দিয়ে সব সম্প্রদায়ের পুনর্বাসন সম্বন্ধেও তিনি সবাইকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতেন।

দীক্ষা, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সুবিবাহ, সুজনন, স্বাস্থ্য, পরিবার সংগঠন, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বর্ণাশ্রম, কর্ম্মীদের করণীয়, রাণাঘাটে কলোনী স্থাপন, স্বস্তিসেবক বাহিনী, নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী-সংগ্রহ, জগৎময় ইষ্টকৃষ্টির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বহু প্রসঙ্গই এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে।

ইউনাইটেড প্রেসের অধিকর্ত্তা শ্রীযুত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত এবং বিয়াসের সৎসঙ্গী শ্রীযুত পি. এস্. ভাণ্ডারীর সঙ্গে কথোপকথন সত্যই হৃদয়গ্রাহী।

আলোচ্য সময়ে একবার পশ্চিমবঙ্গের যুবনেতা শ্রীযুত রাম চাটার্জ্জী সদলবলে এসে নিভৃতে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ ও নির্দ্দেশলাভে পরিতৃপ্ত ও প্রেরণাসন্দীপ্ত হয়ে যান।

গত ১৯৮৬ সাল থেকে আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান মুক্তেন্দু আলোচনা-পত্রিকার জন্য আলোচনা প্রসঙ্গের পাণ্ডুলিপি লিখনে ধারাবাহিকভাবে আমাকে সাহায্য করে আসছেন। তাই আলোচনা-প্রসঙ্গের সপ্তদশ খণ্ড থেকে ঊনবিংশ খণ্ড পর্য্যন্ত এই তিন

খণ্ডের প্রকাশনার ব্যাপারে তার সহযোগিতার জন্য আমি পরিতৃপ্ত। দয়াল তার মঙ্গল করুন। ঐ খণ্ডগুলির পাণ্ডুলিপি সংশোধন, সূচী প্রণয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে অনুজোপম শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে কঠোর শ্রম স্বীকার করেন, সেজন্য উভয়ের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। পরমপিতার চরণে তাঁদের সুস্থ সুদীর্ঘজীবন কামনা করি।

এক সময় পূজনীয় শ্রীবিনায়ক চক্রবর্ত্তীও দয়া ক'রে দীর্ঘদিন আমাকে এই কাজে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। তিনি যুগপুরুষোত্তমের পৌত্র। তাঁর কথা আমার অনেক আগেই উল্লেখ করা উচিত ছিল। পরমপিতার দয়ায় তিনি ইষ্টপ্রতিষ্ঠাব্রতে কৃতকৃত্য হউন।

দয়ালের চরণে প্রার্থনা করি এই পুস্তকের পঠন-পাঠনের ভিতর দিয়ে সকলেই দিব্য-ভাবে প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠুন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

বিবেকবিতান, সৎসঙ্গ
তালনবমী তিথি
৮ই আশ্বিন, ১৪০০
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩

প্রকাশকের কথা

পরমপিতার অশেষ করুণায় পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন-গ্রন্থ 'আলোচনা প্রসঙ্গে' খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হ'য়ে চলেছে। অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই ঊনবিংশ খণ্ডও বিষয়বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ তথা চলার পথের অভ্রান্ত দিগ্‌দর্শন। এই অমূল্য গ্রন্থাবলী ঘরে ঘরে সুরক্ষিত, পঠিত ও অনুশীলিত হ'য়ে মানবের সর্ব্ব ভ্রান্তি বিমোচন করুক, গৃহ ও সমাজ শান্তিসুধায় ভ'রে উঠুক, পরম দয়ালের শ্রীচরণে এই আমাদের প্রার্থনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

প্রকাশক

পুণ্য তালনবমী তিথি,
১৪০০ বঙ্গাব্দ

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা

ধ

র

ল

বিষয়		পৃষ্ঠা

স

আলোচনা-প্রসঙ্গে

২৫শে মাঘ, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ৮।২।১৯৫০)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের সামনে চৌকিতে ব'সে আছেন। বঙ্কিমদা (রায়) রেডিওর খবর বলছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নানাস্থানের বিশৃঙ্খলার কথা শুনে বিশেষ অস্বস্তি বোধ করছেন। তাঁর চোখেমুখে একটা গভীর উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠেছে।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

কান্তিদা (বিশ্বাস), সুরেনদা (বিশ্বাস) প্রমুখ কাছে ছিলেন।

একজনের কথা উঠল। তিনি সম্পত্তির মায়ার অনিবার্য্য বিপদ জেনেও পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আসতে পারছেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়া যদি কায়ারই সর্ব্বনাশ করে তবে সে মায়ার প্রশ্রয় দিয়ে সুবিধা কি ?

কান্তিদা এখানকার জনৈক কর্ম্মীর দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এখানে গরু আছে গোয়াল-ভরা, কিন্তু দুধেল গরু নেই, তাহ'লে আমরা অনেক পুষ্ট হ'তে পারতাম।

এখানে সবরকম লোক আছে—সাধু আছে, চোর আছে, বদমাইশ আছে, ভাল আছে, মন্দ আছে ; তবে সব সত্ত্বেও তাদের সবার ভালোর দিকে কিছুটা টান আছে। মন্দ কাজ করলেও ভুল বুঝে পরে তারা তা' স্বীকার করে। তাছাড়া, একটা সহযোগিতার ভাব এদের মধ্যে আছে। এখানে কোন লোক পাঠাতে গেলে সব কথা আগেই জানিয়ে রাখতে হয়, যাতে তারা একটা উদার সহিষ্ণু দৃষ্টি নিয়ে আসে এবং খারাপ কিছু দেখলে shocked (আহত) হয় কম।

বরিশাল থেকে আগত বিপিনদা (সেন কর্ম্মকার) সেখানকার পরিস্থিতির মর্ম্মন্তুদ বিবরণ দিচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নীরবে সব কথা শুনে পরে বললেন—তোরা যে নিষ্পেষিত হ'তেই চাস্। যাতে ভাল থাকবি তা' তো করিস না। যা' বলি কিছুতেই তা' করবি না এই তোদের বুদ্ধি। তোদের মাথায় কিছু ঢোকে না। এত যে বিধ্বস্ত হচ্ছিস্ তবু প্রতিকারের উপায় আমি যা' বলি তা' করবি না।

বিপিনদা—কিছু করি না, তবু আপনার কৃপায় যেভাবে রক্ষা পাচ্ছি, সে তো অদ্ভূত ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো হ'ল, এখন জনবল, ধনবল, ইষ্টার্থে সংহত ক'রে শক্তিমান হওয়া লাগে। এমনভাবে প্রস্তুত হ'তে হয় যাতে কোন বিপদ সপরিবেশ আমাদের বিধ্বস্ত করতে না পারে। এখন যে দিনকাল এসেছে তাতে বিচ্ছিন্নভাবে অল্প একটু জায়গায় কাজ করলে হবে না। সারা ভারতে, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে হবে তোমাদের। বাইরে থেকে এমন চাপ সৃষ্টি করা লাগে যাতে বিপথগামী বিরুদ্ধ শক্তি নিজেকে সংযত করতে বাধ্য হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে বিছানায় বসে আছেন।

হাউজারম্যানদা, স্পেন্সারদা, আউটারব্রীজদা, কাশীদা (রায়চৌধুরী), শরৎদা (হালদার), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শরৎদা—মহাপুরুষদের অতীত সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান থাকে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কি থাকে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' থাকাই সম্ভব,—মাথায় সাজানই থাকে। আবার, পরিস্থিতির মধ্যে প'ড়ে, স্থান-কাল-পরিবেশ অনুযায়ী যখন যেমন করণীয় তাও তাঁদের মাথায় সহজেই গজিয়ে ওঠে। তাঁরা সবসময়ই নিত্যলোকে বিচরণ করেন এবং অনিত্য জগতে নিত্য বস্তুর প্রতিষ্ঠা যাতে হয় তাই ক'রে চলেন। কখনও তাঁরা স্বভূমি থেকে বিচ্যুত হন না।

শরৎদা—সঞ্জয়ের দিব্যদর্শন ব্যাপারটা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সঞ্জয় মানে যে প্রবৃত্তিকে সম্যক জয় করেছে, যার মনের চাঞ্চল্য ক'মে গেছে। যে অমনতর অবস্থা লাভ করে, তার সত্যদৃষ্টি, দিব্যদৃষ্টি ফুটে ওঠে। আপনাদেরও হয়। ওটা টেলিভিশনের মতো।

শরৎদা—আপনার হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কী ? আপনাদেরই হয়। আমি ও-সব করাই না।

মেণ্টুভাই (বসু)—ইষ্টের উপর টানটা যতদিন অসম্পূর্ণ থাকে ততদিন আমাদের চলনাটা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টানটা সম্পূর্ণ হয় না। যতসময় ইষ্ট আমার জীবনে একমাত্র কাম্য বস্তু ও অন্তহীন হ'য়ে না ওঠেন। মানুষ যখন দেখে যে একজনের মধ্যেই সব-কিছু আছে, তাকে পেয়ে কোনদিন শেষ করা যায় না, তখন তাকে নিয়েই মত্ত হ'য়ে ওঠে।

মেণ্টুভাই—একটা টানাপোড়েন তো লেগেই থাকে !

শ্রীশ্রীঠাকুর—Struggle (সংগ্রাম)-ই জীবন। দুনিয়ায় যা-কিছু করব, তা' করব ইষ্ট-পরিপূরণার্থে। এই হ'ল একমাত্র করণীয়—আর তা' যে যেমন, তেমনতর ভাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে দশটার পর বললেন—আমরা যাই করি, তার মধ্যে কৃষ্টির ধারাটা ধ'রে রাখা চাই। ভাবগত মিলনের সূত্রটা যদি একবার ছিঁড়ে ফেলি, তখন এই আমাদের মতো দশা হয়। পরে তা' ফিরে পাওয়া মুশকিল হ'য়ে যায়।

২৬শে মাঘ, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ৯।২।১৯৫০)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাবুতে বিছানায় বসা। শরৎদা (হালদার), অজয়দা (গাঙ্গুলী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ উপস্থিত।

অজয়দা—শত্রুভাবে উপাসনাটা কী রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও একটা বাজে কথা। যারা নিজেরা অপকর্ম্ম করে, ভগবানের বিরোধী চলনায় চলে, তারা নিজেদের সমর্থনে ঐ কথার অবতারণা করেছে।

অজয়দা—তারা বলে, শত্রুভাবে তাঁর স্মরণ বেশী হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্মরণ করলে কী হবে, অনুসরণ করা চাই। আমি বেঁচে আছি এই কথা যদি স্মরণ করি, অথচ বাঁচার পন্থা যদি অনুসরণ না করি তবে কি বাঁচতে পারি?

অজয়দা—এর একটা দিক তো এও হ'তে পারে যে, তাঁর সঙ্গে বৈরিতায় আমার খারাপটা তাড়াতাড়ি পরাভূত হ'য়ে যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদত কথা হচ্ছে, তাঁর সদ্‌গুণগুলি যদি আমার সত্তায় না গাঁথে, তবে আমার উপকার হ'তে পারে না। তাঁকে যদি অশ্রদ্ধা করি এবং তাঁর ক্ষতিসাধন করতে চেষ্টা করি তাহ'লে আমার অসৎ ভাবগুলি আমার মধ্যে পুষ্ট হ'য়ে আমার সর্ব্বনাশ সাধন করবে।

অজয়দা—প্রিয়কে কেউ যদি নিজের মত ক'রে পেতে চায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যিকার টান থাকলে তা' চায় না। প্রী মানে প্রীণন—প্রিয়ের তুষ্টি, তৃপ্তি, সম্বর্দ্ধনাই সেখানে কাম্য হয়। আর যে ভালবাসে, সে নিজেকে সেইভাবেই পরিচালিত করে।

ননীদা—প্রিয় যদি শ্রেয় না হয়, তাহ'লে কি তাঁকে ভালবেসে আত্মনিয়ন্ত্রণ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা থাকলে ছোটও কত সময় বড় হ'য়ে ওঠে। কত জনে ছেলের মধ্যে কত গুণ দেখতে পায়, তার প্রশংসা করে। ভালবাসা থাকলেই তাকে

বড় ক'রে পেতে চায়। আর, এই আগ্রহের ভিতর-দিয়ে কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণ হয়। কিন্তু প্রিয় যদি সুকেন্দ্রিক না হয় তবে তাতে ভালবাসা ন্যস্ত করতে গিয়ে মানুষের শেষরক্ষা হয় না। প্রিয় যদি সম্যক সুনিয়ন্ত্রিত হন তবে তাঁর প্রতি অচ্যুত সক্রিয় টানের ভিতর-দিয়ে মানুষও সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠতে পারে।

অজয়দা—বিদ্বেষটা তো প্রবৃত্তি-প্রসূত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের প্রবৃত্তি-অভিভূতির অন্তরায় ব'লে মানুষ যাকে মনে করে তার প্রতি তার একটা আক্রোশ হয়।

"কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ।"

দেবদত্ত বুদ্ধদেবের বিরোধী হয়েছিল। শিশুপাল কেষ্টঠাকুরের সঙ্গে পাল্লা দিত, তাঁর মতো বেশভূষা করত, কায়দাকানুন করত। মানুষের মধ্যে হীনম্মন্যতা থাকলে এ-রকম হয়।

ননীদা—যতি-অভিধর্ম্মে আপনি যে বলেছেন—সকলকে তাঁরই বিবর্ত্তিত বিগ্রহ জেনে সেবা করতে হবে—তা' কেমন ক'রে সম্ভব হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা তত্ত্বতঃ সত্য যে, দুনিয়ায় যা'-কিছু আছে সব-কিছু ঈশ্বরেরই পরিণয়ন। তেমন ক'রে ভাবতে-ভাবতে, বলতে-বলতে, বুঝতে-বুঝতে, করতে-করতে বোধটাই তেমন হ'য়ে যায়। অবশ্য ইষ্টের উপর যদি অকাট্য টান না থাকে তাহ'লে কিন্তু এই বোধ দানা বেঁধে ওঠে না। মূল জিনিস হ'ল ইষ্টানুরাগ। তখন সব করা, সব ভাবা, সব বলার মধ্যে ইষ্ট জড়িয়ে থাকেন। এমনি ক'রে আমাদের অন্তরের দুনিয়া এবং বাইরের দুনিয়া ইষ্টময় হ'য়ে ওঠে। যে সেই ভাবে সিদ্ধ হয়, তাঁর সংস্পর্শে এসে অন্য মানুষেরও দেবভাব জাগ্রত হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। শরৎদা, ননীদা, হরেনদা (বসু) প্রমুখ উপস্থিত।

জনৈক দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমার দীক্ষা নিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু মা'র অনুমতি তো গ্রহণ করিনি, এখন কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাঁকে দিয়ে সব, তাঁর আরাধনায় কারও অনুমতি লাগে না। কারণ, তাঁর মধ্যে সবারই মঙ্গল নিহিত। তবে স্ত্রী দীক্ষা নিতে গেলে স্বামীর সম্মতি থাকলে ভাল হয়। কিন্তু কারও যদি তীব্র টান থাকে এবং সে যদি ভগবানের পথে এগিয়ে চলে, তাহ'লে গোড়ায় স্বামীর সম্মতি ও সায় না থাকলেও পরে স্বামী কাবেজ্ হ'য়ে যায়। মীরাবাঈ-এর কথাই ভেবে দেখ না কেন?

প্রফুল্ল—আপনি যা' বলছেন তা' করা আমাদের পক্ষে অনিবার্য্য হ'য়ে উঠতে পারে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হ'তে পারে, যদি তেমন দরদভরা দম থাকে, আর হয় induction-এ (সঞ্চালনায়)। তা' করতে গেলে আমাকে অনেক খাটা লাগে। কিন্তু তাতে তোমাদের যোগ্যতা বাড়বে না, ভিতরের পরিবর্ত্তনও তেমন কিছু হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—একজাতীয় মানুষ আছে মাকড় জাতীয়। তারা সুযোগ-সুবিধার খোঁজে ওৎ পেতে ব'সে থাকে এবং সুযোগ-সুবিধা পেলে তার সদ্‌ব্যবহার করে। আর একজাতীয় মানুষ আছে, তারা শিকারী জাতীয়, তারা খুঁজে-পেতে যেন-তেন-প্রকারেণ সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি ক'রে নেয়।

শরৎদা—আপনি যা' করতে বলেন, তা' করতে গেলে আমাদের বিশিষ্ট যারা তাদের সবারই একভাবে ভাবিত হওয়া দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যদি concentric (সুকেন্দ্রিক) হন, তবে আপনার induction-এ (সঞ্চালনায়) আর সবাই তেমন হ'য়ে উঠবে। আপনার conviction (প্রত্যয়) ও glow (দীপ্তি) তাদের মধ্যে imparted (সঞ্চারিত) হবে। একটা মানুষও যদি ঠিক-ঠিক অনুপ্রাণিত হয়, তাহ'লে তাকে দিয়ে সবাই অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়। মনে করুন, আপনি একাই আছেন, আপনারই সব করা লাগবে এবং সেই ভাব যদি আপনার বোধকে স্পর্শ করে তাহ'লে অনেকখানি পারবেন। By induction (সঞ্চালনা দ্বারা) কাজ হয় কিন্তু Prime man (প্রধান মানুষ)-কে যদি induce (সঞ্চালিত) করা লাগে তাহ'লে মুশকিল। যে-মানুষকে induce (সঞ্চালিত) করা লাগে না এবং যে সবাইকে তাতিয়ে রাখতে পারে নিজ উদ্দীপনায়, সে-ই বড় কাজ করতে পারে। লেগে থাকা একটা বড় জিনিস। বাধা-বিঘ্ন কাউকে যদি দুর্ব্বল ক'রে দেয়, তাহ'লে সে কিন্তু বড় কাজ ক'রে উঠতে পারে না। বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হ'য়ে যে রুখে দাঁড়ায় এবং সাময়িক অসুবিধা সত্ত্বেও বিধিবদ্ধভাবে করণীয় ক'রে চলে সে একদিন কৃতকার্য্য হয়ই, অবশ্য যদি তার চলনায় গোল না থাকে। তবে প্রয়াসটা সাধু প্রয়াস হওয়া চাই। দাঁও মারার বুদ্ধি থাকলে হবে না।

কী করলে কাজ হতে পারে সে-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চরিত্র, উৎসাহ ও সুকেন্দ্রিক জ্বলন্ত আকুতি যদি থাকে তাহ'লেই পারা যায়। আর সহকারী সংগ্রহের দিকে নজর রাখতে হয়। আপনার যদি উদ্দীপনী ব্যক্তিত্ব থাকে তাহ'লে আপনার কাছে ভিড়বেও তেমনতর মানুষ। যে যেমন, তার কাছে এসে তেমনতর মানুষই জোটে। এই হল প্রকৃতির বিধান।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর লেখা সম্বন্ধে বললেন—আমার এই লেখাগুলি যদি পড় তাহ'লে ঠিক পাবে—এক সুতো সবকিছুর মধ্যে চালিয়ে কেমন ক'রে সব সমস্যার সমাধান করা যায়। আর, সেই সুতো হ'ল ভালবাসা, যা ভগবানে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভূমায়িত হয়ে পড়ে।

আশ্রমের প্রথম আমলে কিভাবে কাজকর্ম হ'ত সেই বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তখন মা ছিলেন। মা সকলকে নিজের ছেলের মতো দেখতেন। যে যা' পারত সে তাই করত। সবাই মিলে আনন্দবাজারে খেত। সবার মধ্যে একটা পারস্পরিকতা ছিল। দু'পয়সার মুড়ি কেউ কিনলে সবাই মিলে ভাগজোখ ক'রে খেত। আর, সবারই বুদ্ধি ছিল আশ্রমটাকে গ'ড়ে তোলা। তাদের বিশ্বাস ছিল, তারা সবাই মিলে যেন এক পরিবারভুক্ত। তাদের মনে একটা স্বপ্ন ছিল। আমার ইচ্ছাগুলি পরিপূরণ করতে পারলে যে তাদের নিজেদের এবং দেশের-দশের মঙ্গল হবে—এ বিশ্বাস তাদের ছিল। এই ভাবের মধ্যে দিয়ে কাজ হ'ত। ব্যক্তিগত ধান্দা যাদের কাছে প্রবল, তাদের দিয়ে এ কাজ হবার নয়। অ্যালাউন্স নেবার পর থেকে বেশীর ভাগ কর্ম্মীর মধ্যে আত্মস্বার্থী ভাবটা প্রবল হয়েছে। চাকরেরা যেমন দায়িত্বহীন হয়, এরাও তেমনি দায়িত্বহীন। আমি যে কী চাই, খুব কম মানুষেরই সে বিষয়ে মাথাব্যথা আছে। তাই, যা' হবার তাই হচ্ছে। এর মধ্যে দু-চারজনও যদি ফিঙে হ'য়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে আবার ভোল বদলে যায়।

২৯শে মাঘ, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ১২।২।১৯৫০)

আজ মাঘ মাসের শেষ রবিবার। আজ কর্ম্মীদের মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে চৌকিতে ব'সে কর্ম্মীদের বিনতি-প্রার্থনার পর মাইকের সামনে বললেন—আমরা প্রার্থনা করি কেন? প্রার্থনার গোড়ার ব্যাপার হ'চ্ছে সঙ্কল্প-উদ্দীপ্ত হওয়া—সঙ্কল্প উদ্‌যাপনের জন্য যেমন ক'রে ভাবতে হয়, বলতে হয়, করতে হয়, আবেগ-আগ্রহকে উদ্বুদ্ধ ক'রে আপ্রাণ সম্বেগে তেমন ক'রে তা' করা। এইটেই প্রার্থনার তাৎপর্য্য। যেখানে উন্মাদনা নেই, ভাব নেই, আগ্রহ নেই, সঙ্কল্প সেখানে সফল হয় কমই। সঙ্কল্প যদি পাকা না হয়, তা' যদি গভীর না হয়, তা' সুসিদ্ধ হয় না। প্রার্থনা কথার মানেও তাই, অর্থাৎ ঐ সঙ্কল্প ও ভাবকে পাকা ক'রে তুলে সাফল্যের পথে চলা।

আজ আমাদের দুরূহ সমস্যা। দেশের এ-রকম পরিস্থিতি আসতে পারে জেনেই আমি আগেই বলেছিলাম—আমাদের এমনভাবে প্রস্তুত থাকা দরকার, যাতে

দুঃখ, দৈন্য, দুর্বিপাক থেকে বাঁচাতে পারি মানুষকে। স্বস্তি-বাহিনীর কথা বলেছিলাম—যাতে তারা যথোপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে সংহত সামর্থ্যে উন্নীত হ'য়ে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন সকলকেই বাঁচাতে পারে এ দুর্বিপাক থেকে।

আর একটা কথা, আমাদের স্থিতি এখনও ঠিক হয় নি। জমি কয়েকটা জায়গায় কেনা হয়েছে বটে কিন্তু অচিরেই কোথাও আমাদের এমন একটা সুষ্ঠু সংস্থান গ'ড়ে তোলা দরকার যেখানে, এমনকি দরিদ্রতম পর্ণকুটীরবাসী ভক্তের পর্যন্ত তার মতো ক'রে বসবাসের সুযোগ-সুবিধে হ'তে পারে। প্রত্যেকের জীবনধারণ ও জীবিকা-সংস্থানের উপযোগী ব্যবস্থা ও কাজকর্ম সেখানে সহজভাবে যাতে গ'ড়ে ওঠে, সেদিকে নজর দিতে হবে। এই কাজে সরকারের সাহায্যের উপর প্রত্যাশা ক'রে ব'সে থাকলে হবে না, তাতে যোগ্যতা হারাব, পারব না। আমাদের নিজেদেরই করতে হবে যা' করণীয়।

কৃষ্টিবান্ধব এতদিন হওয়া উচিত ছিল। প্রত্যেকের কাছে যদি আমাদের কথা পৌঁছে দিতে পারতাম, তাহ'লে মানুষ ভাবতে পারত, বুঝতে পারত ও করতে পারত তেমনি ক'রে ; তা' না ক'রে ক্ষতি করেছি জনগণের ও আমাদেরও।

আমাদের শ্রদ্ধার্হ চলনে চলতে হবে। শ্রদ্ধার্হ চলন মানে তেমনি ক'রে চলা, যাতে মানুষ শ্রদ্ধা ক'রে সুখী হয়, তৃপ্ত হয়, আনন্দিত হয়। আমার ব্যবহারে মানুষকে সুস্থ, দীপ্ত, সুখী, সম্বর্দ্ধিত ও সেবাপ্রাণ ক'রে তোলা চাই। এর মূল ব্যাপার অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠা। সেখানে খাঁকতি থাকলে, ইষ্টানুরাগের ভাঁওতা দেখিয়ে চললে, শ্রদ্ধার্হ চলনে খাঁকতি এসে যায়। তাতে মানুষ ইষ্টনিষ্ঠ হয় না। সংহতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

লোক জেগে উঠতে চায়, উন্নত হ'তে চায়, ছোট হ'য়ে থাকতে চায় না কেউই। কিন্তু ধর্মের বার্ত্তাবাহী যারা, ঋত্বিক যারা, যারা তুলে ধরবে জীবনের পথ, উন্নতির আলো, তারা তেমনতর হয় তবে তো!

মানুষ আপনা-আপনি শিক্ষিত হ'তে পারে না। শিক্ষিত হ'তে লাগে উপযুক্ত শিক্ষক। শ্রদ্ধার্হ চরিত্রযুক্ত তেমন শিক্ষক যদি সামনে থাকে, তার প্রতি সক্রিয় শ্রদ্ধার ভেতর-দিয়ে মানুষ শিক্ষা লাভ করে আপসে আপ।

সরকারের যেমন মন্ত্রী দরকার, অফিসার দরকার, প্রত্যেক পরিবারেরও তেমনি দরকার। পরিবারের মধ্যেও একজন সংহতি-সম্পাদনী মানুষ চাই। আর, তার উপর থাকবে ঋত্বিক—Ministering Agent (শুভসঞ্চারণী হোতা)। এরা মিলে একটা পরিবারকেও পড়তে দেবে না। বুদ্ধি, পরামর্শ, সেবা, সাহায্য, সাহচর্য্য দিয়ে

প্রত্যেকটি পরিবারকে উদ্বর্ধনের পথে তুলে ধরবে, পতন অসম্ভব ক'রে তুলবে।

মা-বাবা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সক্রিয় সেবা-সম্বর্ধনী, প্রীতি-উদ্দীপনী ভাব নিয়ে যদি চলে তবে সংসার স্বর্গ হ'য়ে ওঠে। বাপ-মা অমন হ'লে জন্মায়ও এক একটা দেবসন্তান—উত্তম জৈবী-সংস্থিতি নিয়ে। ঐ সংস্থিতির দরুন তারা জন্মের পর থেকেই ভালটা ধরতে পারে, বুঝতে পারে এবং চলতেও পারে সেই পথে। এতে সমাজেরও রূপ বদলে যায়।

মেয়েদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা উঁচুর দিকে ছাড়া নীচুর দিকে না যায়। মেয়েকে কখনও নীচু ঘরে বিয়ে দিতে নেই। তার ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও কুলসংস্কৃতির পরিপূরণী সর্ব্বাংশে শ্রেয় উঁচু ঘরে তাকে দেওয়া চাই।

ছাত্রদের ব্যাপারেও সেই একই কথা। তারা ইষ্টানুগ চলনে যদি চলে, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবা নিয়ে যদি শেখে, তবে তা' সত্তায় গেঁথে ওঠে। ও বাদ দিয়ে যে শিক্ষা, তা' কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে না, সার্থকভাবে বিন্যস্ত হয় না। ঐ শেখাটা কলের গানের রেকর্ডের মতো হওয়া ছাড়া আর কিছু হয় না।

ঘরে-ঘরে কুটীরশিল্পের প্রবর্ত্তন করতে হবে। এতে মানুষ স্বাবলম্বী হ'য়ে ওঠে এবং বাড়ীতে এ-সব দেখে ছেলেপেলেরাও শেখে। তখন তাদের কারও গলগ্রহ হওয়া লাগে না, তারা স্বাধীনভাবে কিছু ক'রে দাঁড়াতে শেখে। শুধু আয়ের দিক থেকে নয়, এর ভিতর-দিয়ে উদ্ভাবনী প্রতিভা গজিয়ে ওঠে। আরও সুন্দর, আরও ভাল, আরও উপযোগী কোন্-কোন্ জিনিস উৎপাদন ক'রে দশের, দেশের অভাব পরিপূরণ করা যায় সেই বুদ্ধিই মাথায় খেলে। আর, এই সেবার ফলে আশীর্ব্বাদস্বরূপ যে-পয়সাটা মানুষ পায় তাতে পায় একটা আত্মপ্রসাদ।

শিল্পের উন্নতির জন্য চাই পারিবারিক শান্তি এবং দাম্পত্যপ্রীতি। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসবে, স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসবে। এইটা যত বাড়ে তত আসে শান্তি। মনের সেবা না ক'রে শুধু বাইরের সেবা করায় শান্তি হয় না। এটা শুধু স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে নয়,—সব ক্ষেত্রেই। পরিবারে পরস্পর-পরস্পরের মনকে ফুল্ল ক'রে বাহ্যিক সেবা যদি করে, তবে পরিবারের সকলের মধ্যেই একটা প্রীতিপ্রফুল্ল ভাব বিরাজ করে। আর একটা জিনিস—সেবা করতে গিয়ে একটা সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। সেবা করতে গিয়ে গায়ে পড়াপড়ি ভাল না। যার সঙ্গে যেখানে যেমনতর দরকার, সেখানে তেমনতর চলাবলা করা উচিত। মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া ভাল নয়। এটা স্বামী, আত্মীয়স্বজন, যেই হোক না কেন, সকলের সেবার বেলাতেই স্মরণ রাখতে হবে।

দেশে-দেশে আজ শান্তির কথা। শান্তির জন্য কত প্রস্তাব ও পরিকল্পনা রচিত

হচ্ছে। কিন্তু যে-প্রয়াসের মূল নেই, তা ব্যর্থ হবেই। সানুকম্পিতা যত ঘনীভূত ও কেন্দ্রায়িত ক'রে তুলতে পারবে, ততই শান্তি এগিয়ে আসবে। অর্থাৎ পুরুষমাণ জীবন্ত মহাপুরুষে সক্রিয়ভাবে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে পারস্পরিক সহযোগী সমবেদনায় প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যেকটি মানুষের স্বার্থ যত হ'য়ে উঠবে, শান্তি তত স্বতঃ হ'য়ে উঠবে।

আমরাই শান্তি সংস্থাপক হ'তে পারি যদি এই পথে চলি। যে সংস্থা এমন ক'রে চলবে তারাই পারবে। আমরাও পারব যত ক্ষিপ্র, সুদৃঢ় ও সুষ্ঠুভাবে করব।

আমরা শুনেছি বহু, করিনি কিছু। স্বস্তিবাহিনীর কথা আমি কত আগেই বলেছিলাম। এই peace army volunteers (শান্তিবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকরা) যদি সময়মত সংগঠিত হ'য়ে থাকত, তবে আমরা তো উপকৃত হতামই, আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র উপকৃত হ'ত। আভ্যন্তরীণ শান্তি নিজেরাই বজায় রাখতে পারতাম।

কতকগুলি সন্ন্যাসী চাই যারা ইষ্টসর্ব্বস্ব হ'য়ে লোকসেবা করবে। কতকগুলি দীক্ষিত চাই যারা প্রতিদিন তিন টাকা ইষ্টভৃতি করবে। তারপর চাই শ্রমণ, যারা ঘরে-ঘরে গিয়ে মঙ্গলের বার্ত্তা পরিবেশন করবে। তা' করলে কী যে হয়, ব'লে শেষ করা যায় না।

মনে রেখো, মানুষগুলি যদি সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হ'য়ে ওঠার পথে না চলে, সরকার কী করতে পারে? আমরা চাই সংহতি, ঐক্য ও সম্বর্দ্ধনী চলন এবং তা' রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, মানুষে-মানুষে সব দিক দিয়েই।

বেলা এগারটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে ব'সে আছেন।

কাছে অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আমার কথা শোনা যাচ্ছিল?

উপস্থিত মায়েরা একযোগে বললেন—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো বক্তৃতা করতে পারি না, যারা বক্তৃতা করে, মাইকের সামনে বলা তাদের পোষায়।

হরপ্রসন্নদা (মজুমদার)—বক্তৃতা তো যথেষ্ট শুনেছি, কিন্তু আপনার কথাগুলি যেন healing balm (আরোগ্যকারী মলম)-এর মত লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা যদি healing balm (আরোগ্যকারী মলম)-এর মত হয় তবে তোমাদের কথা অন্তত pain killer (বেদনা উপশমকারী) হওয়া চাই। উপভোগের নেশা সকলেরই আছে। তোমরা যদি তেমন না হও, আমার উপভোগটা

কোথায় ? তোমরা যদি দেশের, দশের একজন হও, মানুষ যদি তোমাদের দিয়ে স্বস্তি পায়, শান্তি পায় এবং তোমাদের প্রাণভরে ভালবাসে, সুখ্যাতি করে তাহ'লেই আমার সুখ হয়। আমার ইচ্ছে করে তোমরা আমার চাইতে অনেক বড় হ'য়ে ওঠ।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে। শরৎদা (হালদার) ওয়েস্ট এণ্ড-এর কর্ম্মিসভা শেষ ক'রে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—কাজল সভায় বেশ সুন্দর বলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতিই ওকে পরিচর্য্যা করছে। লজ্জা-সঙ্কোচ ভেঙে যাচ্ছে।

১লা ফাল্গুন, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ১৩।২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ন'টার সময় গোলতাঁবুতে আসলেন।

শিবরামদা (চক্রবর্ত্তী), ক্ষেত্রদা (সিকদার), উমাশঙ্করদা (চরণ), অজয়দা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ আছেন।

অজয়দা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম মানে কী তা' ধর্ম্ম কথার মধ্যেই র'য়ে গেছে। ধর্ম্ম ধারণ করে আমাদের সত্তাকে। Physics (পদার্থবিদ্যা) যেমন বস্তুধর্ম্ম নিয়ে আলোচনা করে, ধর্ম্মও তেমনি জীবনবৃদ্ধির মূল নীতি নিয়ে কারবার করে। ধর্ম্মের মধ্যে আছে আত্মানুসন্ধিৎসা—নিজের মূল প্রকৃতি খুঁজে বের করা। ধর্ম্ম মানুষকে নিয়ে যায় evolution (বিবর্ত্তন)-এর দিকে।

শিবরামদা স্বস্তিসেবকের কাজ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ ওঠালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বস্তিবাহিনীর কাজ হবে অন্যায়-অত্যাচারকে নিরুদ্ধ করা—অত্যাচারী যাতে পথ না পায়, এগুতে না পারে, তাই করা। স্বস্তিবাহিনী হবে সৎসঙ্গ থেকে আলাদা একটা সংস্থা। কিন্তু তা' থাকবে সৎসঙ্গীদের পরিচালনাধীন।

স্বস্তিসেবকদের allround education (সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা) থাকা চাই। সব কাজ তাদের পারা চাই—কুলির কাজ থেকে প্রশাসনের কাজ পর্য্যন্ত।

২রা ফাল্গুন, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ১৪।২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় গোলতাঁবুতে। মায়েরা ও দাদারা অনেকে উপস্থিত।

এক মা বললেন—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যাতে আমার শুচিবায়ুটা চ'লে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের নাম ক'রে যা ছোঁয়া যায় তাই শুদ্ধ। "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ।" যে মুহূর্ত্তে তাঁর নাম করবি সেই মুহূর্ত্তেই জানবি তুই পবিত্র। আর, সব অশুচিভাবের জায়গায় তাঁকে এনে বসাবি। তোর

ভাবনা কী? তোর সংস্পর্শে সব পবিত্র হ'য়ে যাবে। ভগবানের চাইতে পাকা পবিত্র আর কিছু নেই। ভগবানকে নিয়ে থাকবি, ভগবানকে নিয়ে চলবি। চারিদিকে ভগবানকে দেখবি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে মায়ের মলিন মুখখানি সহাস্য হ'য়ে উঠল।

হাউসারম্যানদা—Grace (কৃপা) মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Grace (কৃপা) মানে protection (রক্ষা)। তাঁর প্রতি ভালবাসা আমার মধ্যে যতখানি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে, আমি ততখানি grace (কৃপা) পাব অর্থাৎ protected (রক্ষিত) হব। কারণ, protected (রক্ষিত) হওয়ার law (বিধি) আমি fulfil (পূরণ) করেছি।

রামশঙ্করদা (সিং) বিলাতে গিয়ে লোকের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন বৃদ্ধিদ ও আদর্শের কথা প্রচার করায় তা' মানুষের খুব ভাল লেগেছে—এই সংবাদ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রত্যেকেই message of life (জীবনের বার্ত্তা) চায়।

হাউসারম্যানদা—প্রত্যেকেই চায় কিন্তু তা' দেওয়া যাবে কতদিনে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত আমরা জানব when and how to put things (কখন এবং কীভাবে বিষয়গুলি উপস্থাপন করতে হবে), ততই কাজ এগিয়ে যাবে।

হাউসারম্যানদা—যাদের হয়, এমনিতেই হয়। যাদের বুদ্ধি থাকে না, তাদের থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে যেই চেষ্টা করবে সেই পারবে একদিন। স্কুলে প্রথম শ্রেণীর ছেলেও থাকে আবার নিম্নতম শ্রেণীর ছেলেও থাকে। নিম্নতম শ্রেণীর ছাত্রের যদি প্রথম শ্রেণীর ভাল ছাত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে সে ক্রমে-ক্রমে উপরের দিকে এগুবেই।

হাউসারম্যানদা—কয় জন্ম লাগবে তার ঠিক কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি খুব চেষ্টা করে তবে কিছুদিন পরে হয়তো পারে, আর চেষ্টা না করলে কয় জন্ম লেগে যাবে।

কোন বিশিষ্ট এক ব্যক্তির সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর হাউসারম্যানদাকে বললেন—Do, speak and behave with him in a lovely way and exalt him soothingly (তাঁর সঙ্গে সুন্দর আচরণ করবে, সুন্দরভাবে কথা বলবে, সুন্দরভাবে চলবে এবং তাঁকে তৃপ্তিপ্রদভাবে উদ্দীপ্ত করবে)।

মেন্টুভাই—কেউ কেউ বলে অহং না থাকলে মানুষ বোকা মতো হ'য়ে যায়, জেল্লা ক'মে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অহংটা তাঁর রঙে রাঙায়ে নিতে হয়। "তোমারই গরবে গরবিনী

হাম, রূপসী তোমারই রূপে।" সেই ছাঁচে নিজেকে গ'ড়ে নিতে হয়। আমার এই আমিটাই তখন গৌরবান্বিত হ'য়ে ওঠে। কাঁচা আমি পাকা আমি হ'য়ে যায়।

মেণ্টুভাই—Surrender (আত্মসমর্পণ) দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Surrender (আত্মসমর্পণ) কি, ভালবাসা চাই।

মেণ্টুভাই—ভালবাসার organ (ইন্দ্রিয়) কী? যেমন নাক দিয়ে শুঁকি। অন্যান্য বিশেষ ইন্দ্রিয় দিয়ে বিশেষ-বিশেষ কাজ করি। তেমনি ভালবাসার organ (ইন্দ্রিয়) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেক কোষের ভেতর যে টান আছে, যার দরুন কোষগুলি সংলগ্ন থেকে এই দেহবিধান গ'ড়ে ওঠে, সেই দেহবিধান-সমন্বিত সমগ্র সত্তাটাই হ'ল ভালবাসার organ (ইন্দ্রিয়)। সত্তার কোন একটি অংশ যদি ইষ্টের প্রতি বিমুখ থাকে তাহ'লে সেখানে ভালবাসার খাঁকতি আছে জানতে হবে।

হাউসারম্যানদা—বন্ধু মদ খায়, তার মদের বোতলটা হয়তো টেনে ফেলে দিলাম, তাহ'লে সে তো আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কখন কিভাবে কী করতে হয় সেটা বোঝা চাই। মদের বোতলটা ছুঁড়ে ফেলা নয়, ঐ আগ্রহটারই নিরসন করা লাগবে। আক্রমণ করতে হবে মনের গভীরে। হেমকবি মদ খেত। আমি বললাম, তুমি মদ খাও তো আমার কাছে ব'সে খেও। আমিই তোমাকে মদ দেব। আমিই মদ আনিয়ে নিজে হাতে ক'রে গ্লাসে মদ ঢেলে দিয়ে তাকে খাইয়েছি। পরে সে নিজে থেকেই মদ ছেড়ে দিল। মাঝে-মাঝে গোল করত খাবে ব'লে। কিন্তু আমি ব্যথা পাব ভেবে খেত না।

৩রা ফাল্গুন, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ১৫।২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। অনাদিদা (সেন) শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। পূজনীয় বড়দা এবং হেমদা (মুখার্জি) ও যতিবৃন্দ প্রমুখ কাছে আছেন। যতি-আশ্রমের বেড়ার বাইরে দাদারা ও মায়েরা দাঁড়িয়ে সাগ্রহে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করছেন।

অনাদিদা কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—সরকারের সাহায্য নিলে কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সরকারের সাহায্য আমি কোনদিন নিইনি। একবার রবার্টসন সাহেব জোর ক'রে পাঁচশ টাকা দিয়েছিলেন। সাহায্য না নিয়ে যত পারি ততই ভাল।

অনাদিদা—নেব না কেন? আমাদেরই তো সরকার, আমাদেরই তো টাকা!

শ্রীশ্রীঠাকর—এখন নিলে পরে পাব না। গোড়ায় সরকারের সাহায্য নিতে গেলে

গৌরবটা যেন একটু ম্লান হ'য়ে যায়। গোড়া থেকে সরকারের কাছে 'দেহি' 'দেহি' করা আর নিজেরা করা অনেক তফাত। তোমরা নিজেরা যদি একটা আদর্শ গ্রাম গ'ড়ে তুলতে পার, তখন নেহরুই দেখুক আর যেই দেখুক, তাদের একটা শ্রদ্ধা হয়। ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ কোন্‌টায় বেশী? আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে করায় ব্যক্তিত্বের এমন স্ফুরণ হবে যা' হয়তো একদিন সারা ভারতকে পরিচালিত করতে পারবে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার জন্য অন্তত কুড়িটি বাড়ী ক'রে দিতে হবে। প্রত্যেক বাড়ীতে ১৬×১২ মাপের অন্তত পাঁচখানা ভাল bedroom (শোবার ঘর) থাকবে। আর যা'-যা' থাকা লাগে তা' তো থাকবেই। বাড়ীগুলির যেন একঘেয়ে রকম না হয়। নানারকম সুন্দর অথচ সরল ডিজাইনওয়ালা বাড়ী হবে। জাঁকজমকওয়ালা বাড়ী আমার ভাল লাগে না। সরল সহজ সুন্দর রকমটাই আমার ভাল লাগে। বহুরকম লোক আসবে, তাই এমনতর আইন করা লাগে যাতে অবাঞ্ছনীয় লোকের কাছে কেউ বাড়ী বিক্রয় ক'রে না দিতে পারে। বহু গরীব লোক আসবে। সহজ কিস্তিতে তাদের যাতে জমি, বাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যায় সেই চেষ্টা দেখতে হবে। তারা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে তা' করা লাগবে।

অনাদিদার বংশে অনেক ভাল কবিরাজ হয়েছেন। অনাদিদা নিজেও কবিরাজী পাশ—হেমদা সেই কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনাদিদাকে বললেন—তুই আবার তেমনি ক'রে আশ্রম ক'রে দে যাতে তেমন-তেমন কবিরাজ সেখান থেকে বেরতে পারে। কবিরাজীতে আবার তেমনি আধুনিক ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা যাতে শুরু হয়, তার ব্যবস্থা করা লাগে। তোমরা যদি ভালভাবে করতে পার, ভেবেছি, নাজিমুদ্দিনকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে সব দেখাব। হয়তো আসবে না। চূর্ণীর ওপারে কতকগুলি মন্দির-টন্দির করা লাগে যাতে একটা তীর্থের পরিবেশের মত হয়—একটা কৃষ্টির পীঠস্থানে যেমন থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাণাঘাটে আরও জমি সংগ্রহ সম্পর্কে হেমদাকে বললেন—মানুষগুলির সঙ্গে ভাব করা চাই। যদি শুধু জমি নেও তাতে জমি হবে কিন্তু তার সঙ্গে বান্ধবতা পাবে না। তাই প্রত্যেকটা মানুষকে আপন ক'রে তোলা চাই। নিজেদের সম্পদ ক'রে তোলা চাই তাদিগকে বাস্তবে সম্পদশালী ক'রে তুলে।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে। অষ্টানুচর্য্যা সম্বন্ধে কথা উঠল।

প্রফুল্ল—ওটা ছাপতে দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যামা—ছাপা জিনিস ঘরে-ঘরে থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘরে-ঘরে থাকলে কী হবে? চরিত্রে-চরিত্রে থাকে তবে তো হয়।

শান্তিমা—আপনি যখন যেটা বলেন, সেটা তখন সহজ মনে হয়, কিন্তু পরে সে-ভাবটা থাকে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তি ঠেসে ধরে। এখানে সামনে আসলে প্রবৃত্তিগুলি নরম থাকে। দূরে গেলে আবার চেপে ধরে। সমস্ত প্রবৃত্তিকে ছাপিয়ে ইষ্টানুরাগ যদি সত্তায় গেঁথে যায়, তখন আর অমন হয় না।

বিদ্যামা—আগে বুকের মধ্যে কেমন একটা জ্বালা ছিল, এখন তা' টের পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসার মধ্যে একটা জ্বালা থাকেই।

ব্যোমকেশভাই (ঘোষ)—যাকে ভালবাসি তার জন্য যা' করতে চাই, তা' যদি না করা যায়, তবে একটা কষ্ট লেগে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো ভাল।

শান্তিমা—আমাদের যে থাকে অভিমান!

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভিমান মানে তার থেকে নিজেকে বড় ক'রে দেখা। তুলসীদাস বলেছেন—"দয়া ধরম কি মূল, নরম কি মূল অভিমান।"

বিদ্যামা—পাওয়া মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাওয়া মানে হওয়া।

বিদ্যামা—ভালবাসলেই তো পাওয়া হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবেসে তাঁর মনের মত যখন হওয়া যায়, তখন পাওয়া হয়।

রাত আটটার সময় হেমদা ও অনাদিদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনাদিদাকে বললেন—কলোনীটা তাড়াতাড়ি যেমনটি চাচ্ছি, সেইভাবে ক'রে তুলতে পারলে তোমার creative genious ও experience (সৃজনী প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা)-এর দাম যা' হবে, তা' কওয়া যায় না। তখন বাইরের এক-একজনকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে দেখিও।

পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—স্কুল-কলেজ ছেলেদের এবং মেয়েদের আলাদা হবে। Co-education (সহশিক্ষা) আমি পছন্দ করি না। আমাদের আগুলে আমলের socialism (সমাজতন্ত্র) ফিরিয়ে আনতে হবে। আমরা প্রতিলোম চাই না, অনুলোম চাই।

আবাসিক কলেজের হোস্টেল সম্বন্ধে বললেন—আটজন ক'রে ছাত্রের এক-একটা কটেজ থাকবে। মাঝখানে থাকবে একজন অধ্যাপকের বাসস্থান। প্রত্যেক কটেজের সঙ্গে থাকবে একটা লাইব্রেরী। রান্নাঘর, শৌচাগার, ভাঁড়ার ঘর, কমন-রুম ইত্যাদি

যা'-যা' প্রয়োজন তাও রাখতে হবে। সাধারণ লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, গ্যালারি, কোন্‌টা কীভাবে করা লাগবে—তার plan (পরিকল্পনা) ক'রে ফেলতে হয়। একটা নমুনা এমনতর দেখায়ে দেও, যা' ভারত কেন, পৃথিবীতে পাওয়া দুষ্কর। কত কম খরচে কত ভাল জিনিস করা যায়, তার একটা নমুনা মানুষ দেখুক। কোম্পানীর শেয়ারগুলি তাড়াতাড়ি লোকের মধ্যে চারিয়ে দেওয়া লাগে। ইটকাটা কল আনতে পারলে সবদিক থেকে সুবিধে হবে।

হেমদা—অনাদিদা আমাকে খুব সাহায্য করেন। ছেলের বই কিনে দিয়েছেন, মেয়ের বিয়ের সময় সাহায্য করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাহায্য করা ভাল, কিন্তু সাহায্য না করতে হয়, বরং তুমি আর পাঁচজনকে সাহায্য করতে পার, এমন করে দিতে পারেন তাহ'লে হয়।

হেমদা—ছেলেটার পড়ার জন্য আমার একটা ভাবনা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-সব ভাবনা ভাবতে নেই। নিয়তি পিছটানের ভাবনা ভাবায়। পিছটানের ভাবনার দরুন নিজেও আমার কাজে মাতোয়ারা হ'তে পার না এবং অন্য কাউকেও মাতোয়ারা করে তুলতে পার না। তাই, সংসারের কষ্ট ঘোচে না। আমাকেই মুখ্য ক'রে যদি এগিয়ে যেতে পারতে তবে ওরাও বাঁচত, তুমিও বাঁচতে।

অনাদিদার একটু সর্দ্দি হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই প্যারীদাকে লক্ষ্মীবিলাস (বড়ি) এনে দিতে বললেন।

প্রসঙ্গত হেমদা বললেন—ওদের ঘরে দু'-তিন পুরুষের জারিত অনেক লোহা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলি নষ্ট করো না, সাবধানে রেখে দিও।

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১৬।২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে ব'সে ছিলেন। তখন অনাদিদা (সেন), নীরদদা (মজুমদার), হেমদা (মুখার্জী) প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরকে রানাঘাটের জমির ম্যাপ দেখালেন।

কোথায় কী করা যেতে পারে শ্রীশ্রীঠাকুর সে সম্বন্ধে কিছু-কিছু নির্দ্দেশ দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তারপর প্রফুল্লর কাছে নিম্নলিখিত চিঠির বয়ান বলে গেলেন।

খেপু,

অনেকদিন তোমাদের কোন সংবাদ না পেয়ে বিশেষ চিন্তার ভিতর আছি। আগের চিঠিতে লিখেছিলে তুমি ও যতীনদা কলকাতায় গিয়ে হাঁপের টানে

কষ্ট পাচ্ছ। এখন তা' কেমন বুঝতে পারছি না। খুকীর অসুখ পুরোপুরি সারল কিনা তাও জানতে পারিনি। বড়বৌ ও বড়খোকাদের মুখে যা' শুনেছি তা'ছাড়া। তাড়াতাড়ি ভাল খবর পেলে কতকটা সুখী ও নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম হয়তো।

তোমার চিঠি না পেলে অস্বস্তি লাগে। যতীনদাও আমার কাছে কোন চিঠি লেখে না।

তোমার মুর্শিদাবাদ যাবার কথা শুনেছিলাম। যেখানেই যাও খুব সাবধানে থেকো।

বাদল ও অন্নপূর্ণা ছেলেপিলেসহ কেমন আছে?

শান্তু, কানু, কল্পনা, অর্চ্চনা, তোতা, মঞ্জু, কল্পনার ছেলেমেয়ে ভাল আছে তো?

এখানকার সব একপ্রকার।

রানাঘাট থেকে হেমদা, নীরদ, অনাদি প্রমুখ এসেছে, শীঘ্রই চ'লে যাবে।

আমার আন্তরিক রাধা জেনো, যারা চায় তাদিগকে দিও।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
"দাদা"

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আছেন।

শরৎদা (হালদার) সত্যযুগ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যযুগ আনতে হয় ক'রে। আমার যত লেখা ও বলা, সব করারই কথা। মানুষের নিশ্চল অবস্থায় থাকবার জো নেই। হয় সে উপরে উঠবে, না হয় নিচে নামবে। প্রত্যেক যুগেই উন্নত-অনুন্নত দুই শ্রেণীর লোকই থাকে। এক শ্রেণী হয়তো খুব cultured (পরিশীলিত) হ'য়ে গেল, কিন্তু আর একটা হয়তো পিছনে পড়ল।

দূরে একটা মরা সাপের সামনে ছেলেপেলেরা আছে লক্ষ্য ক'রে শরৎদা মোহনকে ডেকে বললেন ওদের সাবধান ক'রে দিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন শরৎদাকে বললেন—আপনার চোখে ওটা পড়ল, এতে আমার

মনে একটা সুখ জেগে উঠল। ভাবলাম আপনার চোখ কতখানি active (সক্রিয়)। একটা ছেলে পড়া পারলে যেমন ভাল লাগে এতেও আমার সেইরকম লাগল।

বিভিন্ন যুগ-প্রসঙ্গের কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অন্ধকার যুগে অনেকেই ছিল, আমরাও হয়তো ছিলাম, সেই অন্ধকার যুগ থেকেই ক'রে-ক'রে, চ'লে-চ'লে কৃতযুগ এসেছিল। কৃতযুগকেই বলে সত্যযুগ। এই যুগে মানুষ সত্ত্বপ্রধান হয়। তাই বলে, সত্যযুগে ধর্ম্ম চারপাদ, ত্রেতায় ধর্ম্ম তিনপাদ, দ্বাপরে দুইপাদ, কলিতে একপাদ। এখান থেকে আবার চারপাদে যাওয়া লাগবে। সে যা' হবে তা' অপূর্ব্ব।

মানুষ যখন এগোতে পারে না, তখন তার ভিতরে একটা অস্বস্তি হয়। তার ভিতর-দিয়ে অগ্রগতির চেষ্টা আসে। এমনিভাবে মানুষ এগোয়।

মন্বন্তর সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্বন্তর মানে মননধারার পরিবর্ত্তন। যখন উন্নত মননধারা চালু হয়, তখন বাঁচার আকূতিতে মানুষ সেইদিকে ঝোঁকে। মহাপুরুষদের মধ্যে-দিয়েই মানুষ পায় এই জীবনীয় সম্পদ—leaven to grow (বিবর্দ্ধনের বীজ)।

হেমদা—ঈশ্বর কি মানুষ হ'য়ে আসেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকলেই ঈশ্বর। ঈশ্বর নয় কে? ঈশ্বরই তো মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে যা' কিছু হয়েছেন। তবে মানুষ যত সময় পর্য্যন্ত তার ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়, ততসময় পর্য্যন্ত তার ঈশ্বরত্ব থেকেও না থাকার সামিল। কারণ, তার আচার-আচরণ, চিন্তা-চলন সবই ঘোষণা করে যে ঈশ্বরের সঙ্গে তার যোগ নেই। সেই জাগ্রত-বোধওয়ালা যিনি, তিনি অন্যের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে পারেন সেই বোধ। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই হলেন আমাদের কাছে ভগবানের মতো। যেমন আমরা বলি, ভগবান বশিষ্ঠ। ব্রহ্মজ্ঞ যিনি, তাঁর সত্তার প্রতিটি অণু-পরমাণু ঈশ্বর-চেতনায় সচিৎ। তাঁর সঙ্গ ক'রেও মানুষের প্রভূত লাভ হয়। অবশ্য অনুরাগ ও অনুসরণ থাকা চাই।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অনাদিদাকে দেখে বললেন—ওকে যা' বলেছি, যদি করে, তবে জানা লাগবে, বোঝা লাগবে কখন কোন্ কাজ বা কথা কেমন ক'রে করতে হবে, বলতে হবে। কোন্‌টার পরে কী করবে সেসব পারম্পর্য্য নিয়ে ফুটে উঠবে। অচ্যুত নিষ্ঠা যদি নিরেট হ'য়ে না ওঠে, তবে কিন্তু এ-কাজ পারবে না। কারণ পারিপার্শ্বিকের থেকে বহুরকম সংঘাত আসবে, তা adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা কঠিন হবে। বহুরকম প্রলোভন, স্বার্থ ও লিপ্সার দরুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'তে পারে,

কারও সাথে মতান্তর হ'য়ে মনান্তর হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু নিষ্ঠা ঠিক থাকলে আমার কাজের ক্ষতি হয়, তেমনতর কিছু হ'তে দেবে না।

রমনদার মা'র রান্নাবান্না ক'রে খাবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসদাকে (সিংহ) দিয়ে উনুন, হাঁড়ি, কড়াই, বালতি, শিলনোড়া, হাতা, বাটিল প্রভৃতি বাজার থেকে কিনিয়ে এনেছেন।

হরিদাসদা জিনিসগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালেন।

জিনিসগুলি পছন্দসই হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হরিদাসের নজর ভাল। সুন্দর জিনিসগুলি এনেছে।

অনাদিদা—আমি বাজে লোককে সইতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Intolerance (অসহিষ্ণুতা) কাজের খুব ক্ষতি করে। একজন খুব হয়তো বাজে কথা বলছে কিন্তু সেইই হয়তো তোমার বিশেষ কাজে লাগতে পারে। তাই দুর্ব্যবহার ক'রে তাকে যদি হারাও তাহ'লে তুমিই ঠেকে পড়বে। আর, কোন মানুষের সম্বন্ধেই একটা তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব থাকা উচিত না। একটা রাখালের কাছ থেকে এমন জিনিস পেতে পার, যা' তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন ক'রে দিতে পারে। তাই, প্রত্যেকের প্রতি একটা যথাযোগ্য শ্রদ্ধার ভাব থাকা উচিত। নইলে বঞ্চিত হ'তে হয়। কাউকে যদি পর ক'রে দাও, তার মানে, তুমি নিজেকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করলে। কিন্তু এমন সময় আসতে পারে যে, তাকে না হলে তোমার চলবে না। তাই, ইষ্টে অটুট থেকে প্রত্যেকের সঙ্গে এমনতর ব্যবহার করতে হয় যাতে সে প্রবুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, খুশী হয়। মানুষ নিয়ে যে চলতে জানে, দুনিয়ায় তার কোন ভাবনা নেই। জীবনে প্রথম শিক্ষণীয় এইটেই। অনেক জানে, অনেক পারে, কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষকে নিয়ে চলতে জানে না যে, সে আদতে কিন্তু অযোগ্য।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার একটা কথা মনে হয়—চূর্ণী নদীর মধ্যে কায়দামতো জায়গায় যদি তামার পাত দিয়ে দেওয়া যায়, যাতে নৌকো চলাচলের অসুবিধা না হয়, এমনতরভাবে, তাহ'লে জলটা দূষণমুক্ত থাকতে পারে। নদীতে bridge (সেতু) থাকে, bridge (সেতু)-এর pillar (থাম) গুলি তামা দিয়ে মুড়ে দিলেও কাজ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

ডাঃ কালিদা (সেন) বললেন—এখানে এত লোক ভিক্ষা চায় যে সেটা একটা উপদ্রবের মত মনে হয়। এমনভাবে বিরক্ত করে যে মনের শান্তি নষ্ট হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর একটা সুবিধা এই আছে যে, কেউ যদি indolent (অলস)

হয়, তাহ'লে তুমি তাকে indolent (অলস) থাকতে দেবে না। কারণ, তুমি বুঝবে সেটা তোমারই স্বার্থের প্রতিকূল।

তোমার কথায় বোঝা যায় যে, তুমি খুব বিরক্ত হয়েছ এবং এর প্রতিবিধান চাও। প্রতিবিধান চাইলে লোকগুলির পিছনে তোমাকে এমন ক'রে খাটা লাগবে যাতে তারা অলস ও দরিদ্র না থাকে। পরিবেশের জন্য যা' করণীয়, তা' যদি আমরা না করি তাহ'লে কিন্তু আমরা রেহাই পাব না।

কালিদা—এইভাবে ভিক্ষাটা normal (স্বাভাবিক) না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fellow-feeling (পারস্পরিকতা) না থাকলে normal (স্বাভাবিক) নয়। তুমি যেমন আজ দুটো দানা পাচ্ছ, ধর তোমার যদি এমন অবস্থা হয় যে তোমার কোন সামর্থ্য ও সঙ্গতি নেই, তখন কিন্তু এর সুবিধা পাবে। রবির অসুখের সময় দশ ভাইয়ে মিলে কী করাটা করল।

কালিদা—সত্যিকার fellow-feeling (পারস্পরিকতা) নেই, আপনি পেছনে আছেন তাই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা হোক করে তো। সব ক্ষেত্রেই তো আমি পেছনে লেগে থাকি না। আর, একদিনেই তো পুরোপুরি হয় না। আস্তে-আস্তে সদভ্যাস রপ্ত হয়।

হরিদাসদার প্রায়ই রকমারি জিনিস কিনতে হয় বাজার থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই তাকে একটা খাতা করতে বলেছেন, যাতে লেখা থাকবে কী কী আনতে হবে, কী কী আনা হয়েছে, এবং কী আনা হয়নি।

কিন্তু হরিদাসদা তাড়াহুড়ার মধ্যে সে খাতা ক'রে উঠতে পারেননি এবং মাঝে-মাঝে কাজে ভুল হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসদাকে তাই গম্ভীরভাবে বললেন—একটা তাচ্ছিল্য দশটা তাচ্ছিল্যকে ডেকে আনে। আমার কথাগুলি কালবিলম্ব না ক'রে ক্ষিপ্রভাবে পালন করতে চেষ্টা করবে। নইলে কিন্তু তুমি এত ক'রেও দায়িত্বহীন ব'লে প্রমাণিত হবে।

শরৎদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যতীন দাস যে চৌষট্টি দিন ধ'রে অনশন ক'রে তিল-তিল ক'রে জীবনটা দিলেন তা' কি তিনি একটা তীব্র আদর্শানুসরণ ছাড়া পারতেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই আবেগ, উদ্দীপনা ও ত্যাগ খুব ভাল, খুব admirable (প্রশংসনীয়) কিন্তু কোন উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ-নিবন্ধ হ'য়ে সে যদি তা' করত তাহ'লে হয়তো সে আরও বড় কাজ করতে পারত। না মরেই হয়তো সে তার কাজ সিদ্ধ করার পথ খুঁজে পেত। শিবাজীর জীবনটা লক্ষ্য ক'রে দেখলেই হয়,

যাকে বলে কূটকৌশলী, শিবাজী ছিল তাই। রামদাসের প্রতি অকাট্য টানই ছিল তার জীবনের নিয়ামক।

বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এক আপদ্‌ধর্ম্ম ছাড়া বিধবাকে বিয়ে দিতে গেলেও সন্তানবতী বিধবাকে বিয়ে না দেওয়াই ভাল। তাতে সন্তান তো খারাপ হয়ই, তাছাড়া পূর্ব্বের সন্তানগুলির দুর্দ্দশার একশেষ হয়।

কালিষষ্ঠীমা, ননীমা, হেমপ্রভামা, মঙ্গলামা, সুধাপানিমা, সরোজিনীমা, কালিদাসীমা, রানীমা, সেবাদি, রেণুমা প্রমুখ অনেকেই এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে আছেন।

মায়েদের জ্ঞানার্জ্জন সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—লেখাপড়া জানা থাকলেও একটা মেয়ে যদি তার সমস্ত মনের নিষ্ঠা নিয়ে স্বামী সেবা করে, তার ভিতর-দিয়েই সেই পরিধির ভিতর তার এমন একটা thorough knowledge (সম্যক জ্ঞান) হয় যে, সে অনেক কিছুই জানতে পারে, বুঝতে পারে ও করতে পারে। মায়েরা যদি অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে ছেলেপিলে মানুষ করতে শেখে তার ভিতর-দিয়েই তাদের অনেক জ্ঞান খুলে যায়। শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা-যত্ন যারা বুঝে-বুঝে করে, তারা একেবারে তুখোড় হ'য়ে যায়। আমাদের শাস্ত্রে বলে—গুরুজনের সেবা ধর্ম্মের একটা বিশেষ অঙ্গ। যে-সব মেয়েরা হোমরা-চোমরা হয়, অথচ পরিবার-পরিজনের সেবার ধার ধারে না, শ্বশুর-শাশুড়িকে অবজ্ঞা করে, তাদের সন্তানাদি ভাল হ'তে পারে কমই। ঐ সন্তানেরাও তাদের উপেক্ষা করতে শেখে এবং পরে সেই মায়েরাই পস্তায় ও আপসোস করে। এ হ'ল প্রকৃতির পরিশোধ। কর্ম্মফল কারও এড়াবার জো নেই।

পরে রাত দশটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটা বাণী দিলেন।

৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ১৭।২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে চৌকিতে ব'সে আছেন। স্পেন্সারদা এসে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে একটা গান গাইতে বললেন।

স্পেন্সারদা নিম্নলিখিত গানটি গাইলেন—

It's love alone
that sees and knows
that finds and follows me
it dods my work
its eyes on me—

and so it comes to me
love loveth all
and hateth none
and so it reaches me.

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেও গাইলেন—

তনয়ে তার তারিণী মা তারা
ত্রিবিধ তাপেতে তারা
নিশিদিন হতেছি সারা।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটুখানি গেয়ে স্পেন্সারদাকে বললেন—আমার যদি তোমার মতো গলা থাকত তাহ'লে সারাদিন গান গাইতাম।

স্পেন্সারদা—আমার বিশ্বাস নেই যে আমি ভালবাসতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে কিছু এসে যায় না। আমার যা' সম্বল আছে তাই নিয়ে আমি ভালবাসতে শুরু করব। একটুখানি আগুন যদি ইন্ধন পায় তাই-ই সারা জগৎকে পুড়িয়ে দিতে পারে।

স্পেন্সারদা—ভালবাসা যদি ব্যভিচারী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ব্যভিচার নানা রকমে ও নানাস্তরে থাকতে পারে। কিন্তু তাই-ই যেন আমার প্রিয়পরমকে সেবা করে। আমার মধ্যে যদি বিষ থাকে তাহ'লে তাও যেন আমার প্রেষ্ঠের মঙ্গল সাধন করে। আমি আমার অন্তর্নিহিত বিষকে তাঁর চরণেই অর্ঘ্য দেব, যাতে তা' তাঁর প্রীতিজনক কিছু করে।

ভগবান যদি মানুষের ভালবাসায় প্রীত না হতেন, তাহ'লে মানুষের আর কোন উপায়ই থাকত না। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন—খাদ না থাকলে গড়ন হয় না, সেটা একটা আশার কথা।

আমরা অল্পবিস্তর পতিত। প্রতি মুহূর্তেই প্রলোভনের দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছি। কিন্তু আশার কথা এই যে, আমাদের সব দোষ সত্ত্বেও তিনি আমাদের ভালবাসেন। আমাদের উচিত আমাদের যা' পুঁজি আছে তাই তাঁর সেবায় লাগানো।

প্রফুল্ল—মানুষ তো নৈর্ব্যক্তিক নয়, ব্যক্তি-হিসেবে তার মধ্যে দোষগুণ থাকেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমস্ত নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যেই যাবতীয় ব্যক্তিত্ব সমাসীন হয়ে আছে। প্রতিটি ব্যক্তিই ভূমারই এক-একটি সংস্করণ।

আমার যত দোষগুণ থাক, সবগুলি দিয়ে যদি তাঁর পূজা করি, সেবা-সম্বর্ধনা করি, তবে সেগুলির রঙ বদলে যায়। দোষও আর দোষ থাকে না, গুণও আর গুণ-

হিসেবে থাকে না, সবটাই হ'য়ে ওঠে তাঁর পূজার উপকরণ। যত সময় এইটে না হচ্ছে, তত সময় ব্যক্তির জীবন সার্থক বা অর্থপূর্ণ হ'য়ে ওঠে না।

যোগেনদা (হালদার)—গহনার তো প্রয়োজন আছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—গহনা যদি তাঁকে দিই তবে সেই গহনার প্রয়োজন আছে। আমার আবার গহনার প্রয়োজন কী? আমরা ভগবান এবং অর্থকে সমানভাবে ভালবাসতে পারি না। অর্থকে যদি অর্থের জন্য ভালবাসতে যাই, তাহ'লে ভগবানকে হারাব। যদি অর্থ এসে পড়ে তাহ'লে তা' ভগবানের সেবায় লাগাব। তখন তা' আর অনর্থের কারণ হবে না। অবশ্য, আমি যদি ইষ্টনিবেদিত হই তাহ'লে আমার সত্তাপোষণী স্বার্থও ইষ্টার্থের মধ্যে পরিগণিত হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গান ধরলেন—

বাবার কাছে সাগরের রূপগুণ শুনেছি ঢের,
তাইতে স্বয়ংবরা হতে
সে প্রশান্ত সাগরপানে ছুটে যাই,
কুলু কুলু কুলু কুলু নদী বয়ে যায়
নদী বলে আমি মস্তগিরিরাজার মেয়ে গো
পিতা তো নোয়ান না মাথা কারো কাছে যেয়ে গো।

হেমদা (মুখার্জী), অনাদিদা (সেন) প্রমুখ আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কুড়িখানা বাড়ী ও ছয়শ' বিঘা ধানের জমির কথা আবার অনাদিদাকে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে। স্পেন্সারদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমি যখন তাঁকে উপভোগ করতে চাই তখন সেটা হয় কাম। যখন আমার সবকিছু দিয়ে তাঁকে উপভোগ করাতে চাই, সেই হল প্রেম। কামের মধ্যেও উপভোগটা উভয়তঃ হওয়া চাই। যদি আমার স্ত্রীর উপভোগের প্রতি লক্ষ্য না রাখি এবং আমাকে যদি সে উপভোগ করতে না পারে তাহ'লে আমিও তাকে উপভোগ করতে পারি না। মানবীয় যে-কোন সম্পর্কে একে অপরকে যদি নিজের দাঁড়ায় না দেখে এবং তদনুযায়ী আচরণ না করে তাহ'লে দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা স্থায়ী এবং গভীর হ'তে পারে না।

প্রফুল্ল—ধরুন, একজন আর একজনের বাড়ীর চাকর। মনিব এবং চাকরের সম্পর্কের বেলায় এ-কথাটা কি খাটে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই মনিবই প্রকৃত মনিব হ'তে পারে যে চাকরকে খাটালেও তার

আত্মমর্য্যাদা-বোধকে কখনও ক্ষুন্ন না করে। মানবিক সম্পর্কের বেলায় এই কথাটা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমি আমার কাছে যেমন মূল্যবান, অপরেও তার নিজের কাছে ততখানি মূল্যবান। এই বোধ ঠিক রেখে যদি চলা যায় তাহ'লে কাউকে শাসন বা ভৎর্সনা করতে গেলেও মানুষ মাত্রা হারায় না। কেউ আমার হ'তে পারে না, যদি আমি তার না হই।

স্পেন্সারদা—আমাদের ভালবাসাটা স্থির নয়। এটা স্থির ও নির্ভরযোগ্য হয় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সূর্য্যকিরণ যে আমরা দেখতে পাই তা' বাতাসের মধ্যে বহু ধূলিকণা থাকে ব'লে। কিন্তু সূর্য্যকিরণের সঙ্গে ধূলিকণা আছে ব'লে তা' যে steady (স্থির) নয়, তা' কিন্তু নয়। কারণ, তা' ঐ সূর্য্য থেকেই আসছে। তেমনি সত্তা থেকে যে ভালবাসা উৎসারিত হয়, তার মধ্যে অল্পস্বল্প মালিন্য থাকলেও সত্তার অংশ তার মধ্যে থাকে।

৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ১৮।২।১৯৫০)

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে।

পূজনীয় বড়দা এবং অজয়দা (গাঙ্গুলী), শরৎদা (হালদার) প্রমুখ উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অজয়দাকে বললেন—প্রত্যেক পরিবারে কিছু-না-কিছু কুটির-শিল্প ক'রে যাতে তারা মাসে আড়াইশ, তিনশ টাকা উপার্জ্জন করতে পারে, তার একটা ব্যবস্থা কর। কতরকম কুটির-শিল্প করা যায়, তার একটা list (তালিকা) ক'রে ফেল। নানারকম কুটির-শিল্পের উপযোগী যন্ত্র বের করতে চেষ্টা কর। কুটির-শিল্পের একটা সর্বাঙ্গীণ নমুনা যদি দাঁড় করাতে পার, সারা দুনিয়ার একটা উপায় হয়।

অজয়দা—পাতলা চিড়ে ও বড় মুড়ির বাজার সারা পৃথিবীতে হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, বড়ি ক'রে যথেষ্ট উপায় করা যেতে পারে। ঘরে-ঘরে টর্চের কারখানা করা কঠিন না। সাইকেল পার্টস্‌ও বাড়ীতে তৈরী করা যেতে পারে। নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও শৌখিন জিনিস পারিবারিক শিল্পের ভেতর-দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। এতে বহু লোকের পেটের ভাত হ'তে পারে।

কাশীদা (রায়চৌধুরী) এসে খবর দিলেন—কুঞ্জন মণিদার (ঘোষ) দোকানের একটি ছেলেকে মেরেছে এবং অনিল (চক্রবর্ত্তী) তারপর গিয়ে আবার মণিদাকে জোর শাসিয়ে এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কুথ্নকে ডেকে পাঠালেন। কুথ্ন ছেলেমানুষ। সে এসে সঙ্কোচ-পীড়িত হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথিতকণ্ঠে বললেন—আমার খুবেই কষ্ট হয়েছে। আমার মনে পড়ে না যে তুমি আমার কখনও কষ্টের কারণ হয়েছ। কিন্তু আজ আমার খুব কষ্ট হয়েছে। ওকে যে এমন ক'রে মারলে—এতে বোঝা যায়, আমি তোমার মাঝে বেঁচে নেই, তা' থাকলে এমন করতে পারতে না। ওকে যে মেরেছ, এখন তোমার এমনতর বুদ্ধি কি হবে যে তার মনটাকে তুমি খুশী ক'রে তুলবে?

মানুষের শরীর নিয়ে অত্যাচার করতে পারা খুব বাহাদুরী নয়। সেটা সমীচীনও নয় বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া। কিন্তু মানুষের মনটাকে আক্রমণ ক'রে তাকে যদি আপন ক'রে তুলতে পার, তবে তো হয়। তুমি যদি তাকে এমনতর করতে পারতে, যাতে সে ভেউ-ভেউ ক'রে কেঁদে তোমার পায়ে পড়তে বাধ্য হয়, তাহ'লে বুঝতাম তুমি আমার বাচ্চার মত কাজ করেছ। তোমাদের অনেক বড় দেখতে চাই আমি। তোমার বাবার থেকেও তুমি বড় হও, সেই আমি চাই। ওকে যাতে খুশী করতে পার, তাই দেখ। আর অমন করো না লক্ষ্মী। এতে আমার রাগ হয় না, দুঃখ হয়। আমি যেমন চাই তেমনতর তোমরা যদি না হও, তবে তো আমার সব বৃথা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহল ভৎ'সনা শুনে কুথ্ন কেঁদে ফেলল এবং বলল—ঠাকুর, আমার অন্যায় হয়েছে। যাকে আমি মেরেছি, তার কাছে আমি এখনই যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনিলকে (চক্রবর্ত্তী) ডাকিয়ে তার কাছে সব শুনলেন।

পরে তাকে ভৎ'সনা ক'রে বললেন—মণি ঘোষকে তুই যাস্ শাসন করতে? তোর সাহসটা কি? সে একটা বিশ্বস্ত লোক, পুরানো লোক, তার একটা চরিত্র আছে। শুধু কালির আঁচড়েই মানুষের কদর? তার চরিত্রের কোন দাম নেই? আর তুমি পৈতে গলায় ঝুলিয়ে ভেবেছ বামুন হ'য়ে গেছ? শুধু গলায় পৈতে দিলেই বামুন হয় না। সাথে আরও কিছু লাগে।

অনিলও নিজের অপরাধ স্বীকার করল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মণি ঘোষ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ। তার কাছে নিজের ভুল স্বীকার করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীদাকে বললেন—তুই এর সঙ্গে যা, দেখ্, কী করে, কী বলে? পরে আমাকে এসে সব বলবি।

৭ই ফাল্গুন, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ১৯।২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায়।

স্পেন্সারদা শ্রীশ্রীঠাকুরের একটা কথা বিকৃতভাবে গ্রহণ করায় দু-মাস ধরে দারুণ মানসিক অশান্তি ভোগ করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁর কিছুটা অভিমানও হয়েছিল। কিন্তু এখন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বললেন—আপনি আমার ভালর জন্যই বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভুল বুঝে অযথা কষ্ট পেলাম। এতে আমার কোন লাভ হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটায়ও লাভ হবে। যখন আর কেউ এমন অবস্থায় পড়বে, তখন তুমি তোমার অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে তাকে সে কষ্ট থেকে উদ্ধার করতে পারবে।

স্পেন্সারদা—এতে আমাকে ইষ্ট থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, তাই আমার এ অভিজ্ঞতা দিয়ে কারও ভাল করা যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাময়িক যত দূরে সরিয়ে নিয়ে যেয়ে থাক, ভিতরে মাল থাকলে তোমার টান প্রবলতর হ'য়ে উঠবে। আর টান না থাকলে তুমি তোমার নিজের ভুল বুঝতে পারতে না।

অনাসক্ত কর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনাসক্ত কর্ম্ম মানে বিহিতভাবে ইষ্টপ্রীত্যর্থে কাজে রত থাকা। কাজের ফল সম্বন্ধে বেশী মাক্কামাক্কি না করা। যাদের কামনা অত্যধিক, কাজের ফলের উপর নেশা যাদের অত্যন্ত বেশী, তারা ফলের জন্য পাগলপারা হ'য়ে থাকে। তারা ঠিকমত কাজও করতে পারে না। তাই নিজেদের জলদিবাজিতে ব্যর্থতা ডেকে নিয়ে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—পরে মনে করিয়ে দিস, 'মানুষ দৈন্যগ্রস্ত কেউ না' এ-সম্বন্ধে মাথায় আসলে কিছু বলব।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে।

বর্দ্ধমানের জমিদার যামিনীবাবু (সিংহরায়) এসেছেন।

তাঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দুইরতি আখের গুড়, একরতি আমলকির গুঁড়ো, একরতি মানকচুর শুট দিনে দুবার খেলে বেরিবেরির পক্ষে খুব ভাল।

৯ই ফাল্গুন, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ২১।২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে চৌকিতে ব'সে আছেন। অজয়দা

(গাঙ্গুলী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), স্পেন্সারদা, প্রফুল্ল এবং উত্তরপাড়া থেকে আগত কতিপয় ভদ্রলোক উপস্থিত আছেন।

কাল রাত্রে দেশনেতা শরৎচন্দ্র বসু পরলোকগমন করেছেন। সকালে রেডিওতে সে খবর পাওয়া গেল। এই সংবাদ পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন খুব ভারাক্রান্ত।

রাত্রে অজয়দার উত্তরপাড়ার বন্ধুরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এখন যতি-আশ্রমে।

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন আছেন বাউল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন—বাউলের সুর আবার পাগল ক'রে তুলুক সারা দুনিয়াকে। আবার দেখিয়ে দেন হিন্দুর চরিত্র, হিন্দুর আদর্শ, হিন্দুর জীবন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা হিন্দুদের মারছে। কিন্তু তাই বলে আমি চাই না যে এদেশে কেউ মুসলমানকে মারুক। তবে অসৎ যারা যেখানে আছে, তাদের প্রতিরোধ করাই লাগে। পাপের প্রতি, রোগের প্রতি অহিংস যদি হই, মৃত্যু যে অবধারিত, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে ?

বিবাহের প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রঘুনন্দন যে কলিতে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ব'লে গেছেন সে বিধান বেদানুগ নয়। তাই তা' মানতে গেলে আমরা পতিত হয়ে যাব। আর আমার মনে হয়, নবাব আমলে রঘুনন্দনকে বাধ্য করা হয়েছে এমনতর বিধান দিতে। এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু এটা আমার বদ্ধমূল ধারণা।

বাউল দাদা—পরিণতি কী হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—God created man after His own image (ভগবান নিজের প্রতিকৃতি-অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টি করেছেন)। আমরা যদি তাঁর ভাবে ভাবিত হ'য়ে সংহত হই, তবেই আমরা ঠিক থাকব। কওয়া-করার সঙ্গতি যদি থাকে, তাহ'লেই আমাদের ভাল হবে। নচেৎ বিপর্য্যয় অনিবার্য্য। যোগ্যতা না থাকলে কেউ দুনিয়ার বুকে টিকে থাকতে পারে না।

বাউলদা—ভগবান এসে কি বাংলাকে রক্ষা করবেন না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি আসুন আর না আসুন, আমাদের করা লাগবে তো। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' তিনি আসলেও তো করবেন আমাদের দিয়ে। আমরাই তাঁর যন্ত্র। আমরা যদি বিশ্বাসই করি তাঁতে, তবে তাঁর পথে চলি না কেন ? না ক'রে কি রেহাই পাব ?

বাউলদা—এ রাত কেটে যাবেই, দিন আসবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাতেই যদি আমাদের শেষ হ'য়ে যায়, তবে দিন আর দেখতে পাব না। দিনের মানুষ যারা, তারা দিন দেখবে।

বাউলদাদা—ভগবানের একটা ইচ্ছে আছে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের ইচ্ছা মানে আমাদের ইচ্ছা। আমরা বোধন ক'রে মায়ের পূজা করি। এখনই বোধন শুরু করলে এই রাতের পর যে-দিন আসবে সেই দিন যে কী সুখের, তা' বলা যায় না।

বাউলদাদা—বোধন তো হবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই বোধন থেকে কেউ বাদ যায় কেন? পূর্ববঙ্গে শুনছি পনের হাজার লোক চ'লে গেল। অসুখ যদি হয়, হয় ব্যারাম সেরে বেঁচে উঠব, নইলে মরব। এ দুটো ছাড়া কি কোন পথ আছে? ব্যারামকে যদি overcome (অতিক্রম) না করি, তারই যদি খোরাক যোগাই, আমরা বাঁচব কিভাবে?

জনৈক দাদা হিন্দুদের সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা হিন্দু কেন তাই জানি না। কেউ বলি, ত্যাগই আমাদের মূল মন্ত্র। কেউ বলি, হিন্দু বড় দার্শনিক। কিন্তু হিন্দুত্বের মূল সংজ্ঞা সম্বন্ধেই জ্ঞান নেই। আর, শাস্ত্রীয় বিধিবিধানগুলি আমরা অবিচার ব'লেই মনে করি। অপকর্মের জন্য সামাজিক যে শাসনের ব্যবস্থা ছিল, তাকে আমরা বলি অবিচার, অত্যাচার। বোধই নেই, কেন ঋষিরা কী করেছেন। হিন্দুত্বের গৌরব-বোধ নেই। তাই মুসলমান হ'তেও অনেকের আটকায় না। আমি বলি—কৃষাণ কই, মেষপালক কই, যারা এদের লালন করবে?

আমরা এতখানি নেবে গেলাম কি করে তা বুঝি না। আমাদের বলে দেবজাতি। যাত্রা-টাত্রায় দেখি দেবাসুরের সংগ্রামে দেবতারা কত বাধা অতিক্রম ক'রে বারবার বিজয়ী হয়েছে। সেই বিজয়ের সংকল্প ও সাধনা আমাদের ভিতরে কি আবার জেগে উঠবে না?

জনৈক দাদা—বিনা প্রয়োজনে কি কোন ঘটনা ঘটে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যেমন পাঁঠা খাই ক্ষুধার প্রয়োজনে, তাতে পাঁঠার কী প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলতে পার? সে কি মরার জন্য আমাদের কাছে আর্জি পেশ করে? বরং যখন মারি, তখন সে ককায়, কাঁদে, আমরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করি না।

বাউলদাদা—পাঁঠাও তো ম'রে যাবে, ওর জন্যে এত কষ্টবোধ করি কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মরা ও আমার মরা একই রকম। আমাকে যদি কেটে মেরে ফেলে তবে কেমন লাগে আমার?

বাউলদাদা—অভিভূত হ'য়ে লাভ কি ? প্রতিকার চাই তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও তো সেই কথা বলি। বাঁচার will (ইচ্ছা) যখন ক'মে যায়, cohesive urge (সংসক্তির আকুতি), যার ফলে cell-division (কোষ-বিভাজন) হ'য়ে আমরা মানুষ হ'য়ে উঠেছি, তা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লে disintegration (বিশ্লিষ্টতা) আসে। তখন বাঁচাই দুরূহ হ'য়ে ওঠে। আজ পাকিস্তানে হিন্দুদেরও সেই দশা হয়েছে। হাজারে হাজারে তারা মরণের গহ্বরে যাচ্ছে। Integration (সংহতি) যত বাড়বে, তত অবস্থা অন্যরকম দাঁড়াবে—যদি vital power (জীবনী-শক্তি) অব্যাহত থাকে।

বাউলদাদা—হবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যেমন পাগলের মতো আপনাদের কাছে বলছি, প্রাণের ব্যথায়, প্রাণের কথা, বাঁচার কথা বলছি—তত্ত্বকথার ধার দিয়ে না গিয়ে আমার সেই প্রাণের ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন তো ? এটা যদি আপনার প্রাণে লাগে, আপনি যদি আর পাঁচজনকে এমন ক'রে বলেন,—কাকে দিয়ে কী করান পরমপিতা কে জানে ? আমিও ঐ পাঁঠার মতো প্রাণের দায়ে ভ্যা-ভ্যা করছি। বুঝছেন তো আমার অবস্থাটা। আমার আপনাদের কাছে আবেদন-নিবেদন করা ছাড়া আর কী করার আছে বলুন তো ? করবেন কিন্তু আপনারা। আর এও বলছি করলেই পারবেন।

বাউলদাদা—করতে গেলে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিচারক যেমন আইন জানে, চোরের কাছে তার চাইতে কম আইন খোলা নেই। সে তা' বাঁচিয়ে কাজ সেরে চ'লে আসে। বেঁচে কি ক'রে কাজ হাসিল করতে হয়, সেইটেই মাথায় রেখে চলা লাগে।

বাউলদাদা—আমরা কি সরাসরি বেরিয়ে পড়ব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার সঙ্গে বুদ্ধি-বিবেচনা করা লাগবে—কোথায়, কোন্ অবস্থায়, কেমন ক'রে কী করতে হবে—যাতে প্রতিবন্ধক এড়িয়ে সুষ্ঠুভাবে কাজ সারা যায়।

শুনেছি, পাকিস্তান কাশ্মীরে হানাদার পাঠিয়েছিল। ওদের কিছু বললে ওরা বলত, বাইরের হানাদাররা করছে, আমরা কী করব ? এইভাবে ভারতকে কায়দা ক'রে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল। এই ধরনের কতরকমের কায়দা আছে তার কি ঠিক আছে ? কুশল-কৌশলী হ'য়ে কাজ করা লাগে।

বাউলদাদা—আমার মনে হয়, এ জাতির মরণ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমি বলি, আপনারা কেন এতগুলি মানুষকে জবাই হ'তে দিলেন ? মেয়েগুলিকে কেন এভাবে নির্যাতিত হ'তে দিলেন ? রোগী মরে, অথচ ডাক্তারের যদি চৈতন্য না হয় তো সে কেমনতর ডাক্তার ? ভাল

ডাক্তার যে, তার হাতে একটা রোগী মরলেও সে খতাতে বসে কেন রোগীটা মরল, কিভাবে একে বাঁচানো যেত? এইভাবের আত্মবিশ্লেষণ না থাকলে সে কখনও দায়িত্বশীল ডাক্তার ব'লে গণ্য হবার যোগ্য নয়। আমি জিজ্ঞাসা করি, ভারতবিভাগের পরেও পূর্ব-পাঞ্জাবে ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে পাইকারী হারে নরহত্যা হল কেন? কংগ্রেস তো ভারতবিভাগে রাজী হয়েছিল এই আশায় যে দেশবিভাগ হ'য়ে গেলে, স্ব-স্ব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হ'লে সেখানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হ'তে পারবে না। কিন্তু তবু কেন এটা হ'ল? এর জন্য দায়ী কে? আমি বলি, কেন সরকারকে দায়ী করা হবে না এ-সব মৃত্যুর জন্য?

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—মানুষকে সাবাড় হ'তে দেব অথচ দার্শনিক তত্ত্ব আওড়াব যে এটা কিছু না, সেটা কি হৃদয়বত্তার পরিচয়? শুনেছি একবার কলেরা লেগে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হ'য়ে যাচ্ছিল, তখন এক ফকির সেই কলেরা রোগের কাছে জিজ্ঞাসা করল, সব লোক খেয়ে ফেললে পরে খাবি কি? তখন তোরই তো উপোস করে মরতে হবে। আমরা কি সবাই সাবাড় হতে চাই? এত ক্ষয়ক্ষতির পরেও যে আমরা সচেতন হচ্ছি না, তার মানে আমাদের চেতনা অসাড় হ'য়ে গেছে। এটা মোটেই শুভলক্ষণ নয়। আমি নৈরাশ্যের প্রশ্রয় দিতে চাই না। কিন্তু তাই ব'লে বিহিত কর্ম্মহীন আশার বুলি ব'লে মানুষকে নিশ্চেষ্ট ক'রে রাখতে রাজী নই। অন্যায়কে রোখাই লাগে—তা' ফকিরী বুলি ক'রেই পারি বা যেভাবেই পারি।

জনৈক দাদা—প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতিকার সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায়। হাল ছেড়ে দিলে হবে না। তোমাকেই নাবতে হবে মাজায় কাপড় বেঁধে। প্রবল-পরাক্রান্ত মোঘলদের বিরুদ্ধে পার্ব্বত্য-মূষিক শিবাজী গুরু রামদাসের নেতৃত্বে কী কাণ্ডটা করেছিল ভেবে দেখ না!

আমরা যে আন্দোলন করলাম, তাতে সংহতি বা কৃষ্টির কথা বললাম না। বাঁধন খুলে দিলাম, বেড়া ভেঙে দিলাম। নিষ্ঠাবান না হ'য়ে উদার হলাম। তার মানে উচ্ছৃংখলতার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। তাই, ছেলে আজ বাপকে মানে না। মেয়েরা বিবাহবিচ্ছেদের আন্দোলনে ঝাণ্ডা ধরে। ছেলে টাকাপয়সাওয়ালা হ'লে মেয়েরা প্রতিলোম বিয়ের ব্যাপারে একপায়ে খাড়া। এসব কি সুস্থতার লক্ষণ? তাই বলি—"মৃদুপ্রতিকারে ব্যাধি হবে না নিপাত গো, তীব্র ভেষজ দেহ দয়াময়।"

জনৈক দাদা—সমাজের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদভাব যাবে কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব মানুষ কখনও এক রকম নয়। উঁচু-নীচু থাকবেই। যে উঁচু,

তার নীচুর উপর প্রীতির ভাব থাকা চাই। আবার, উন্নত যে তার উপর অনুন্নতের শ্রদ্ধা যদি থাকে তাহ'লে কিন্তু সে তার ভিতর-দিয়েই উন্নত হ'য়ে ওঠে।

শরৎদা—সুন্দর, সুখী সমাজ গড়ার উপায় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, আমাদের যা' ছিল তার ময়লামাটি মুছে ফেলে সেইগুলিকে আবার জাগিয়ে তুলতে পারলেই হবে। অন্য কারোটা আমাদের নেওয়া লাগবে না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই ধারণা। তবে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতি যা' হয়েছে আমাদের নিজ বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে তার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

বাউলদাদা—আমার একটা কথা মনে হয়। আমাদের যে-সব কুলগুরু আছেন তাঁদের শ্রদ্ধা করলে আমাদের হবে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে স্কুলে যায়নি, সে এম-এ পড়াতে গেলে যেমন পারে না, এও তেমনি। যাদের উপলব্ধি নেই, চরিত্র নেই, তারা যদি গুরুর আসনে বসে তাহ'লে সমূহ বিপদের কথা।

বাউলদাদা—একলব্য তো মাটির মূর্ত্তি গ'ড়ে তাকে পূজা ক'রে কত বড় যোদ্ধা হ'য়ে গেল!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাটির মূর্ত্তি কার? দ্রোণাচার্য্যের উপর শ্রদ্ধা না হ'য়ে মাটির উপরে শ্রদ্ধা হ'লে কিছুই হ'ত না।

বাউলদাদা—মৃত্তিকা থেকে জ্ঞানলাভের কথাও তো পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মৃত্তিকা থেকে মৃত্তিকার জ্ঞানলাভ করা যায়। তার বেশি যায় না।

বাউলদাদা পদ্মপাদের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পদ্মপাদের যা' হয়েছিল সেও শঙ্করাচার্য্যের প্রতি ভক্তি থেকে হয়েছিল। আর একটা জিনিস দেখবেন, মহাপুরুষেরা কখনও সিদ্ধাই-এর আশ্রয় নিয়ে নিজের ক্ষমতা জাহির করেন না। ওটা ধর্ম্ম-জগতের ব্যাপার না।

বাউলদাদা—সদ্গুরু লাভ করতে হবে—এই কথা বলায় মানুষের যদি বুদ্ধিভেদ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয় না। সদ্গুরু প্রত্যেককে তাঁর বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পরিচালিত করেন। তিনি জানেন কাকে কোন্ পথে নিতে হবে। প্রত্যেককে তিনি নিজ প্রকৃতি-অনুযায়ী ফুটিয়ে তোলেন। সবাইকে একছাঁচে ঢালার বুদ্ধি যাদের,

১১ই ফাল্গুন, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২৩।২।১৯৫০)

কাল রাত থেকে একটু-একটু ক'রে বৃষ্টি হ'চ্ছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে বিছানায় চাদর গায়ে দিয়ে ব'সে আছেন।

স্মরজিৎদা (ঘোষ) এবং উপস্থিত মায়েদের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলছেন।

কাল রাত্রে উত্তরপাড়ার দাদারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে নৃত্যগীতাদি পরিবেশন করেছেন। সেই প্রসঙ্গ ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের কলাকুশলতার প্রশংসা করলেন।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সব-কিছুই সার্থক হ'য়ে ওঠে ইষ্টসেবায় লেগে। জীবনের মূলে ঐ-রকম একজন না থাকলে মানুষের করা, বলা, ভাবা আলগা-আলগা থাকে, ভেসে-ভেসে বেড়ায়। সেগুলি সংহতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় গোলতাঁবুতে আছেন।

মন্মথদা (ব্যানার্জী), হরিদাসদা (সিংহ), গোপেনদা (রায়) প্রমুখ উপস্থিত।

পূর্ব্ববঙ্গের হাঙ্গামার দরুন বহু লোক সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চ'লে আসছে।

প্রসঙ্গতঃ মন্মথদা বললেন—এরা এদেশে এসে খাবে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সরকার তাদের ভরণপোষণ করবে, এ বুদ্ধি থাকলে হবে না। আর, সরকার যদি করেও, ঐভাবে না-ক'রে পেতে-পেতে মানুষের কর্ম্মশক্তি ও যোগ্যতা নষ্ট হ'য়ে যায়। এর চাইতে তারা যদি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়ে মানুষের সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতার উদ্রেক ক'রে নিজেদের কর্ম্ম ও সেবার উপর দাঁড়ায়, সেই ভাল হয়। আর, ব্যবহারটা হওয়া চাই সহানুভূতি-উদ্দীপী। জনগণ যাতে সর্ব্বপ্রকারের সাহায্য, সহযোগিতা করে, তেমনভাবে তাদের জাগিয়ে তুলতে হয়। কাগজগুলি যদি দিনের পর দিন এই ধরনের নানা suggestion (নির্দ্দেশ) দিয়ে লেখে, তবে বহু লোক পশ্চিমবাংলার গ্রামে-গ্রামে পুনর্ব্বাসন লাভ করতে পারে স্থানীয় লোকদের সহায়তায়।

মন্মথদা চুনীদার সম্বন্ধে বললেন, তার চেহারা, ভাবটাব ভাল লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকে কয় bliss (আনন্দ)। ইষ্টানুগ চলনে চললেই এ জিনিস লাভ হয়। ফাঁকা কথায় আনন্দের স্ফুরণ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—মানুষের অনুরাগ যত concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে ওঠে, ততই তার পূর্ব্বকর্ম্মপ্রসূত মস্তিষ্কলেখাগুলি, যা-কিনা আমাদের মধ্যে

বিক্ষিপ্তভাবে সাজান থাকে, তা' সুবিন্যস্ত হ'য়ে চরিত্রকে influence (প্রভাবিত) করতে থাকে। তখন কথাবার্ত্তা, চালচলন যা'-কিছু ইষ্টানুরঞ্জিত হ'য়ে পড়ে। ওতে ঢিল থাকলে মানুষের ব্যক্তিত্ব কখনও প্রভাবশালী হয় না। অনুরাগটা unexpectant ও unrepelling (অপ্রত্যাশী ও অচ্যুত) না হ'লে কিন্তু কাজ হয় না। Expectation (প্রত্যাশা) থাকলেই মাঝখানে একটা পর্দ্দা প'ড়ে যায়। তখন যতই করুক, মানুষ ইষ্টে যুক্ত হয় না। যুক্ত হয় তার প্রত্যাশাতে এবং এই প্রত্যাশা-অনুযায়ী তার জীবন একটা গণ্ডীর মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। 'সে আর লালন একখানে রয়, লক্ষ যোজন ফাঁক'—এমনতর হয়।

১২ই ফাল্গুন, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২৪।২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে। বাউলদাদা, প্যারীদা (নন্দী), গোকুলদা (নন্দী), উমাদা (বাগচী) প্রমুখ উপস্থিত।

সংহতি সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বর্ত্তমান পুরুষোত্তমকে চারানর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। যারা এই করে ও চারায়, তারাই দেবতা। তারা হ'ল crystalising centre (দানা বাঁধার কেন্দ্র)। এই কেন্দ্র যত বাড়বে এবং তাদের মধ্যে ইষ্টপ্রীতি ও পারস্পরিক সম্প্রীতি যত বেশি থাকবে, সমাজ তত সহজে সংহত হ'য়ে উঠবে। আসুরিক মনোবৃত্তি আজ প্রবল। অসুরকে সুরের সাধনার ব্রতী করতে হবে। তাদের একতান ক'রে তুলতে হবে। তার ভিতর-দিয়েই আসবে ঐক্য।

বাউলদাদা—মানুষ ধর্ম্মকথা নেয় না, শুনতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাগজের মধ্য-দিয়ে বারবার মানুষের কাছে ঢাক পেটাতে থাকুন। প্রথমে নেবে না, কিন্তু কোন্ সময় যে কার রস লেগে যাবে তার ঠিক নেই। কারণ, ভাল থাকার চাহিদা প্রত্যেকেরই আছে।

বাউলদাদা—আমি চেষ্টা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একলা করতে পারবেন না, মানুষ চাই।

বাউলদাদা—ভগবান পাওয়া যায়, তবু মানুষ পাওয়া যায় না। ভগবান পাওয়া বরং সহজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোক সংগ্রহ করতে পারি না ব'লে ভগবানকে পেয়েও পাওয়া হয় না।

১৩ই ফাল্গুন, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ২৫।২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে।

নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে।

শরৎদা (হালদার)—আপনি বলেন ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে সবকিছুর সার্থক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন, এই দুনিয়াটা ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের নানা সমাবেশের ভেতর দিয়ে গড়া। এখন সেইটে যদি নানা বস্তুকে অবলম্বন ক'রে আপনি বুঝতে পারেন, তাতে আপনার প্রত্যয়টা অকাট্য হবে। এ যেমন একটা দিক, তেমনি এই ইলেক্ট্রন, প্রোটন যার উপর দাঁড়িয়ে আছে, যার উপর দাঁড়িয়ে যা'-কিছু সংঘটিত হচ্ছে, সেটা যদি আপনি বুঝতে পারেন, তাহ'লে আপনি কিন্তু একেবারে মূলে চ'লে গেলেন। এই মূলে যেতে গেলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বোধ চাই। আবার, সেই সূক্ষ্ম বোধ জাগাতে পারেন এমনতর একজন মানুষ চাই। ইষ্ট হলেন আপনার কাছে সেই মানুষ যিনি আপনার ভিতর সেই বোধ গজিয়ে দিতে পারেন যদি কিনা আপনি তাঁকে অনুরাগের সঙ্গে অনুসরণ করেন। তখন "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" হ'য়ে ওঠে আপনার কাছে। আর, এটা হয় বাস্তবভাবে। যাকে-তাকে দিয়ে আপনার কিন্তু আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সবকিছু বোধগোচর হবে না। তা' সম্ভব শুধু ঐ চেতনার মূর্ত্ত বিগ্রহকে দিয়ে। আবার, ঐ মূর্ত্ত বিগ্রহ আপনার সামনে থাকলেও কিছু হবে না যদি তার উপর আপনার concentric active attachment (সুকেন্দ্রিক সক্রিয় অনুরাগ) না থাকে। যদি সত্যিই সেই মানুষ আসেন এবং তাঁর উপর যদি আপনার হাড়ভাঙা টান হয় তাহ'লে আপনার জ্ঞান ও বোধ উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবেই। এটা একটা বাস্তব ব্যাপার। যার হয় সেই বোঝে। Fact (তথ্য)-কে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

শরৎদা—অনুরাগ তো বুঝলাম। কিন্তু দীক্ষার প্রয়োজন কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষাটা হ'ল সূত্র। যেমন বীজগণিতের $(ক+খ)^২ = ক^২ + ২ কখ + খ^২$। মন্ত্র কয় ওর নাম, ওকে বলা যায় clue (সংকেত)। আবার key (চাবি)ও বলা যায়। ঐ চাবি হাতে থাকলে অজ্ঞাত রাজ্যের সব তালা খুলে ফেলতে পারি, এর বিহিত ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে। তবে ইষ্টের প্রতি অনুরাগ চাই-ই। তা' না হ'লে চরিত্র ভাগবত ভাবে রূপান্তরিত হয় না। সাধনভজন ক'রে রাবণ বা হিরণ্যকশিপু হ'য়ে যেতে পারি। দানবরাও কম সাধক নয়। কিন্তু তাদের নিয়ামক প্রবৃত্তি হ'চ্ছে আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। তাই, তাদের শক্তি জগতের অকল্যাণের কারণ হ'য়ে ওঠে। তখন দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের আয়োজন করা লাগে। ইষ্টপ্রীত্যর্থে যে সাধনা শুরু না হয়, আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে, হীনম্মন্যতা থেকে যে-সাধনের সূত্রপাত হয়, তার পরিণতি বহু সময় অকল্যাণকরই হ'য়ে ওঠে। তবে করতে করতে মন ঘুরে যায় এমনতরও হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ফ্যারেঞ্জাইটিস হয়েছে। মাঝে-মাঝে কাশছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় কাশার পর একটু সামলে নিয়ে বললেন—ভৃগুর কুষ্ঠিতে আছে আমার আগের জন্মে গলরোগে মৃত্যু হয়েছে। এজন্মে তাই গলাতে একটু দোষ থাকবে। আরও আছে আগের জন্মে নাকি গঙ্গাতীরে ছিলাম। সাধনভজন করতাম।

বুদ্ধদেবদা (চট্টোপাধ্যায়) পূর্ণতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।/পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

রবীন্দ্রনাথের কথা আছে—

"যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি
সে মুহূর্তে কিছু তব নাই
তুমি তাই পবিত্র সদাই।"

সবই তো নিজস্ব রকমে পূর্ণ। তবে সব পূর্ণই একেরই রকমারি প্রকাশ। কাণ্ড গুরুতর। কিন্তু এত রকমারি যে হয়েছে এর মধ্যে কোনটা কোনটার মত নয়। প্রত্যেকটারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্যগুলির আবার গুচ্ছ আছে। যাকে বলে বর্ণ। আমের মধ্যেই কত বর্ণ আছে। ন্যাংড়া, বোম্বাই ইত্যাদি। আমরা যে শ্রেণী ভেঙে দিতে চাই তা' কি ভাঙা যায় কখনও? একটা দানাকে যত গুঁড়ো করা যাক, তার মধ্যে ঐ দানাত্ব থাকেই। এটা থাকে যতসময় water of crystalisation (দানাবাঁধার মূলগত উপাদান) ঠিক থাকে। যা' এই দানার গঠনকে বজায় রাখে তাকেই কয় কৃষ্টি। প্রতিলোম হ'লে কিন্তু ঐ গঠনটাই ভেঙে যায়। বংশপরম্পরায় সঞ্চয়, সাধনা ও আহরণ বরবাদ হ'য়ে যায়।

বুদ্ধদেবদা—কলিতে নামই নাকি সম্বল? কতজনে কতরকম করে, সে করার ফল কী হ'চ্ছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিহিতভাবে ক'রে যদি ফলাতে চাই, তবে ফল ফলে। তা' না ক'রে ফলাতে চাইলে কিছুই হয় না। পণ্ডশ্রম হয়। একটা কথা আছে—"কোটি জন্ম করে যদি নাম সঙ্কীর্ত্তন/তথাপি না পায় কেহ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" আবার আছে—"একবার হরিনামে যত পাপ হরে/জীবের নাহিক সাধ্য তত পাপ করে।"

বুদ্ধদেবদা—"একবার হরিনামে যত পাপ হরে, জীবের নাহিক সাধ্য তত পাপ করে" এবং "কোটি জন্ম করে যদি নাম সঙ্কীর্ত্তন/তথাপি না পায় কেহ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" কথা দুটো তো পরস্পরবিরুদ্ধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এর তাৎপর্য্য হচ্ছে, এই যে, যান্ত্রিকভাবে অজস্র নাম করলেও ঈশ্বরলাভ বা আত্মশুদ্ধি হয় না। আবার, অনুরাগ ও একাগ্রতা নিয়ে যদি কেউ একবারও প্রাণের সঙ্গে নাম করে তাহ'লেও তা' মানুষকে পরিশুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে। অবশ্য একথাও ঠিক যে, কিছুটা আগ্রহ নিয়ে নাম করতে-করতে নামের প্রভাবে ধীরে-ধীরে অনুরাগ গজায়। মোটের উপর নাম করাই কিন্তু ভাল।

বুদ্ধদেবদা—শুকদেব জন্মেই চ'লে গেলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার বাবা শিল্পী তো?

বুদ্ধদেবদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার জৈবী-সংস্থিতিই এমন যে গোড়া থেকেই শিল্পপ্রতিভা নিয়েই জন্মেছেন। বাপের কাছ থেকেই এটা পেয়েছেন। শুকদেবেরও জৈবী-সংস্থিতি অমনতরই ছিল। বৈরাগ্যের সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করায় অমনতর হয়েছে। আমাদের বিয়ে-থাওয়ার এমনতর রীতি ছিল যাতে সন্তান পিতার উন্নত ভাবগুলি জন্মসূত্রে লাভ ক'রে আরও উন্নতির পথে সাধনায় রত হয়।

বুদ্ধদেবদা—সবাই যদি শুকদেবের মতো হয় তবে তো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুশকিল কিসের, এ তো ভাগ্যের কথা। এত শুনেমিলে ক'জনের হচ্ছে বলুন। সৃষ্টির ভাবনা সৃষ্টিকর্ত্তা ভাববেন। আপনি তাঁকে পেয়ে ধন্য হন। আমাদের হয়েছে অমৃতে অরুচি। তাই জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য ইত্যাদির কথা উঠলে অবান্তর কথা উঠিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই।

বুদ্ধদেবদা—ভাগবতে আছে শ্বেতদ্বীপ, লবণসমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র ইত্যাদি নানা কথা। এর সঙ্গে আবার নাকি শরীরের সম্বন্ধ আছে। ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের শরীরের মধ্যে সবকিছুই আছে। আমাদের গা ঘামলে তা' থেকে নুন বেরোয়। আমার মনে হয় শ্বেতদ্বীপ মানে সূর্য্যলোক। গায়ত্রী-মন্ত্রের মধ্যে আমরা যে বর্ণনা পাই তা' এক-এক স্তর ও মণ্ডলেরই বর্ণনা। এক-একটা স্তর এক-একজন এক-একভাবে বর্ণনা করেছেন। এসবগুলি আমি যেমন ক'রে বোধ করেছি বা বলেছি তা' সবার সঙ্গে মিলবে কিনা জানি না, কিন্তু যারাই করে তারাই অনেক সূক্ষ্ম স্তরের সন্ধান পায়। এক-একজন সেগুলি হয়তো এক-এক নামে বলে।

বুদ্ধদেবদা—অজামিল মৃত্যুর আগে নিজের পুত্র নারায়ণকে ডেকে মুক্ত হ'ল কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে হয়তো নারায়ণ নাম ডাকতে-ডাকতে নারায়ণের ভাবেই ভাবিত হ'য়ে উঠেছিল। তদ্ভাবভাবিত না হ'লে স্বারূপ্যলাভ হয় না। দেবতার নামে ছেলের নাম রাখে যাতে সেই আকর্ষণের সূত্রে ভগবান বা দেবতার কথা স্বভাবতঃই স্মরণ হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজ ছিলেন, তাঁর ঐ গল্পটা আমার খুব ভাল লাগে। তিনি একবার গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরছেন। রাস্তায় এক বুড়ী তাঁকে দেখে পুজো করবার জন্য অনুরোধ করল। তিনি ওজর-আপত্তি না ক'রে বুড়ীর সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে পুজোয় বসলেন। পুজো করার পর বুড়ী দু'আনা পয়সা দক্ষিণা দিল। তাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে নিলেন। মানুষের ভিতরে হীনম্মন্যতা থাকলে কিন্তু এমনভাবে পারে না। তিনি নিজে নিষ্ঠাবান বামুন ছিলেন ব'লে সশ্রদ্ধভাবে এটা করতে পেরেছেন। মুরগীর ঠ্যাং চিবোয় যারা, তাদের অমনটা হ'তে দেখা যায় না।

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ২৬।২।১৯৫০)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের সামনে চৌকিতে বসেছেন। ক'দিন তিনি কাশিতে কষ্ট পাচ্ছেন। আজ সকালেও মাঝে-মাঝে কাশি হচ্ছে।

কিরণদা (ব্যানার্জী), প্রফুল্লদা (ব্যানার্জী), ব্রজগোপালদা (গোস্বামী) প্রমুখ বারো-তেরজন ইছাপুর থেকে এসেছেন। তাঁরা সবাই একে-একে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে দক্ষিণাস্য হ'য়ে বিছানায় বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ডানদিকে ও বাঁদিকে মাদুর পেতে দেওয়া হ'ল। ইছাপুরের সবাই মাদুরের উপর বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এক-এক ক'রে সবার খবরাখবর নিলেন।

সাম্প্রতিক পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—এই ব্যাপারের প্রতিক্রিয়ায় ভারতে যাতে কোনরকম সাম্প্রদায়িক গোলমাল না হয় সেইদিকে আমাদের শ্যেনদৃষ্টি রেখে চলা দরকার।

উদ্বাস্তু সম্পর্কে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যারা আসছে, তারা সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। সরকারের সাহায্যের উপর দাঁড়িয়ে খায়, অথচ নিজেরা খাটে-পেটে না। এতে কিন্তু মানুষগুলি খোঁড়া হ'য়ে যাবে। তার চাইতে যদি

এরা জনগণের সাহায্যের উপর দাঁড়িয়ে actively (সক্রিয়ভাবে) profitable (লাভজনক) কিছু করতে চেষ্টা করে, তাহ'লে ভাল হয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা যে করে না, তা' কিন্তু নয়, খুব করে। তাদের খুদকুঁড়ো যা' থাকে তাই দিয়েই প্রাণপণে সাহায্য করে। দাঁওমারা লোক সর্বত্রই থাকে। কিন্তু দেশে প্রাণবান লোকেরও অভাব নেই।

কিরণদা—আমাদের তো এখন এমন একটা বলিষ্ঠ সমাজ গঠন করা দরকার যা' প্রয়োজনমত সরকারের পিছনে দাঁড়াতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকদিন আগেই আমি বলেছিলাম অন্ততঃ হাজার তিরিশেক স্বস্তিসেবক ক'রে তাদের সর্বতোভাবে সুগঠিত ক'রে তোলার কথা। তারা প্রয়োজনমত শান্তিসেনার কাজ করতে পারবে এবং সাধারণতঃ লোকসেবা নিয়ে থাকবে, অন্যায়কে প্রতিরোধ করবে, কৃষ্টিবিরোধী কিছু ঘটতে দেবে না।

এরপর অজয়দা (গাঙ্গুলী) এসে বললেন—মণি চ্যাটার্জিকে সব বললাম, ও আপনার কাজ করতে রাজী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ভালই হয়। এমনভাবে প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হয় যাতে নূতন আশ্রম হবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেকটা পরিবারকে এক-একটা ছোটখাট শিল্পকেন্দ্র হিসাবে গ'ড়ে তোলা যায়।

কিরণদা—পাকিস্তান যেভাবে চলছে সেভাবে কি একটা রাষ্ট্র টিকতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ বাদ দিয়ে, জীবন বাদ দিয়ে রাষ্ট্র হয় না। জনসাধারণের যদি সুখ না থাকে, স্বস্তি না থাকে, বহু সংখ্যক মানুষ যদি মৃত্যুর আশঙ্কায় অভিভূত হ'য়ে আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হয় তবে রাষ্ট্রের ভিতই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে।

কিরণদা—যে-কোন কারণেই হোক ভারতের অনেকে উদ্বাস্তুদের প্রতি তত সহানুভূতিসম্পন্ন নন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের বুদ্ধির দোষে আপনজনকেও পর ক'রে ফেলি। ঐ বিদ্যেই তো আমরা শিখেছি। উদ্বাস্তুদের ভেতর এমন ভাব জাগিয়ে তুলতে হয় যাতে তারা নিজেদের ব্যবহার ও সততা দিয়ে এদেশের লোককে আপন ক'রে তুলতে পারে।

এরমধ্যে আলো (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) এসে দাঁড়াতে শ্রীশ্রীঠাকুর তার ভগ্নী ধৃতির খবর জানতে চাইলেন।

ধৃতির ডিপথিরিয়া হয়েছে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর আলোকে বললেন—ওকে খুব সাবধানে রাখবি। ডাক্তার ওষুধপত্র যা' দিয়েছে সেগুলি যেন ঠিকমত খাওয়ান হয়।

কখন কেমন থাকে মাঝে-মাঝে এসে আমাকে খবর দিবি। তোদের কারও অসুখ-বিসুখ করলে আমার মনটা ভাল লাগে না।

দুপুরে ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় ব'সে আছেন। রোজকারমত আজও মায়েদের মধ্যে অনেকে এসেছেন।

প্রফুল্ল বলল—একজনের সুখ, সন্তোষ ও তৃপ্তিতে নিজের সুখ, সন্তোষ ও তৃপ্তি, তাছাড়া নিজের তৃপ্তি নেই—এমনতর মনোভাব দুর্লভ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুখ বলতেই কিন্তু এই। মানুষ কিন্তু এই করছে। তবে বেশীর ভাগ মানুষ সুকেন্দ্রিক নয়। বিচ্ছিন্নভাবে এর পেছনে ঘোরে, তার পেছনে ঘোরে, মূল কেন্দ্র ব'লে কিছু নেই—এই যা' তফাৎ। তাই ঠিক-ঠিক স্বস্তি পায় না। তোমার নিজের কতটুকু লাগে? তোমার দশখানা মোটরগাড়ীই থাক, দশখানা এ্যারোপ্লেনই থাক, তাতে তোমার নিজের প্রয়োজন কতখানি? কিন্তু যখন তুমি দেখ যে, তোমাকে দিয়ে বহু মানুষ সুখী হচ্ছে, অমনি তোমার মনটা আনন্দে ডগমগ হ'য়ে ওঠে। আর, এটাও করা লাগে ইষ্টপ্রীতি ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করে। নইলে তোমার মনে আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি জেগে উঠবে। তখনই তুমি খতাতে বসবে মানুষ তোমাকে খাতির করছে কিনা, তারিফ করছে কিনা। যেই তা' না পাবে, অমনি তাদের উপর তোমার মন বিরূপ হয়ে উঠবে এবং তখন তুমি তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে থাকবে যে, যারা তোমার প্রতি উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল তারাই তোমার বিরুদ্ধে চ'লে যাবে। লোকের কাছে বলবে, লোকটার ধরন এমন যেন আমাদের মাথা কিনে নিতে চায়। এমনতর কত ব্যাপারই না ঘটে।

কিরণদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বস্তিসেবক হ'ল সন্ন্যাসী সৈনিক। এখন তাদের প্রধান কাজ নিরাপত্তা। আর সঙ্গে-সঙ্গে চাই কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য। হয়তো কোনও জায়গায় পতিত জমি পড়ে আছে। এরা হয়তো ট্রাক্টর সংগ্রহ ক'রে জমি চাষ ক'রে জলের ব্যবস্থা ক'রে অন্যের কাছে ছেড়ে দিয়ে এল। তারা সেই জমিতে চাষ করবে সমাজের কল্যাণের জন্য। প্রথমে তিরিশ হাজার স্বস্তিসেবক সংগ্রহ করলে তারাই কত পারবে। পঙ্গপালের মত সারা দেশ ছেয়ে ফেলবে।

কিরণদা—এদের তো আদর্শমুখী হওয়া দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ না থাকলে, নিরাশী না হ'লে প্রবৃত্তি এদের ছিনায়ে নিয়ে যাবে, উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

বুদ্ধদেবদা (চ্যাটার্জী)—আপনাকে পুরুষোত্তম বলে ওরা, আপনি আপত্তি করেন না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ভাল লাগে না, আমাকে যদি শালা ক'ত, তাহ'লেই বা আমি কী করতে পারতাম ? আবার আমি ভাবি, ভক্তির জোরে মানুষ কাঠ-পাথরের থেকে পুরুষোত্তম বের করে, ভগবানের দেওয়া একটা জ্যান্ত শরীর আমার, এর মধ্যে তো তিনিই আছেন, যদি খুঁজে-পেতে কেউ তা' বের করতে পারে তা' করুক। আমার আপত্তি ক'রেই বা কী লাভ ? আর আমার একটু আভিজাত্যও আছে। ভাবি, আমার পূর্ব্বপুরুষ তো শাণ্ডিল্য ঋষি, তিনিও তো ঠাকুরই, তাঁর মাল কি আমার মধ্যে নেই ? ফলকথা, ভগবান ছাড়া তো কিছুই নেই। কেউ যদি আমার মধ্যে তাঁকে খুঁজে পায় তাহ'লে আমার ক্ষতি কী, লোকেরই বা ক্ষতি কী ?

জনৈক দাদা—এখন তাহ'লে আপনার ভালই লাগে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল লাগে পূর্ব্বপুরুষের কথা স্মরণ ক'রে। আমরা তো দেবজাতি, আমরা তো দেবতাই। মঙ্গলমুখী আভিজাত্যবোধ থাকাই ভাল, যদি তার সঙ্গে অন্যকে ছোট ক'রে ভাবার প্রবৃত্তি না থাকে। শাণ্ডিল্যের সন্তান যদি কাশ্যপকে ছোট মনে করে, মহান প্রত্যেককে যদি নতি জানাতে না শেখে, তাহ'লে কিন্তু হ'ল না। আমাকে যখন কেউ ভগবান বলে তখন আমি ভাবি সেও ভগবান। আমি ভগবান থাকব আর সবাই ছোট হ'য়ে থাকবে, আমি সে ভগবান হ'তে চাই না। কেউ ছোট থাকলে তাকে টেনে লম্বা করব না তার মতো ক'রে ? আমার মতন মানুষকেও মানুষ ঠাকুর কয়। তাতেই আমি বুঝি, মানুষের মধ্যে ঠাকুরত্ব এখনও যায়নি। আগে এমন ছিল, বামুন যেখান থেকে হেঁটে যেত সেখানকার ধূলি পর্য্যন্ত তুলে রাখত। ভাবত, তা' কত পবিত্র, তাতে হয়তো কত কল্যাণ হবে মানুষের। আজও মানুষের মাথা থেকে মুছে যায়নি সেভাব। তোমরা দেবতা হ'য়ে ওঠ। মানুষকে দেবতা ক'রে তোল। এই আশাই আমার তোমাদের কাছ থেকে।

বুদ্ধদেবদা—দল গড়ার সার্থকতা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বা তুমি যদি কিছু ভাল ব'লে জানি, তা' লোকের কাছে বলি। যেমন শূলবেদনা সারে কিসে যদি জানি, সে-কথা বলি সকলকে তাদের ভালবাসি ব'লে, তাদের ব্যথাটা নিজের মতন বোধ করি ব'লে। ভাবি, তারা যাতে না ভোগে, না কষ্ট পায়। আর এক রকম আছে, নিজেদের স্বার্থের জন্য মানুষ বাগিয়ে তাদের ভোটে ক্ষমতার আসনে দাঁড়িয়ে তাদের সুখসুবিধা না দেখা। এ-রকম দল গড়ার সার্থকতা আছে ব'লে আমি মনে করি না। অবশ্য, তাদের মধ্যে হয়তো ভাল লোক থাকে, কিন্তু শক্তিমান নেতাদের কাছে তারা কোন পাত্তা পায় না। দলগড়া দেখেছি রামকৃষ্ণ ঠাকুরের মধ্যে। একটা দিন চ'লে যেত আর ছাদের উপর উঠে আকুলভাবে ভক্তদের ডাকতেন—কে কোথায় আছিস, আয়। চৈতন্যদেব ছিলেন মানুষের জন্য

পাগল, ঘুরে-ঘুরে বেড়াতেন মানুষের লোভে। সুজাতার হাতে বুদ্ধদেবকে পায়েস খেতে দেখে পাঁচজন ভক্ত ভেগে গেল বুদ্ধগয়া থেকে সারনাথে। তিনি খুঁজে-খুঁজে তাদের বের করলেন। মধ্যপন্থা সম্বন্ধে তাদের বোঝালেন। তারা যখন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় বুদ্ধদেবের কাছে আত্মসমর্পণ করল, তখন তাদের নিয়েই তিনি ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন করলেন। এই শুরু হ'ল যাজন ও প্রচার। কেষ্ট ঠাকুরও যা' কিছু করেছেন লোকসংগ্রহ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য। ক্রাইস্ট বলেছেন 'I shall make you fishers of men' ('আমি তোমাদের মানুষ ধরার জেলে করব')। শূলবেদনার ওষুধ যে জানে সে কি আর একজন শূলবেদনার রুগীকে ছটফট করতে দেখে চুপ ক'রে থাকতে পারে ?

আমি যেমন চল্লিশজন মানুষের কথা বলেছি, তার একটা উদ্দেশ্য আছে তো। নাহ'লে এমনি বলতে যাব কেন ? হয়তো তুমিই সে মানুষের একজন হ'তে পার। কোন্ বনে কোন্ বাঘ আছে কে জানে ? আমি ভাবি, বাংলার জঙ্গলে কি বাঘ নেই ? বাঘ কি একদমই চ'লে গেছে ? তখন মনে হয়, জবর বাঘও থাকতে পারে। খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে। এই সেদিন রামকৃষ্ণ ঠাকুর আসলেন, বিবেকানন্দ আসলেন, অরবিন্দ আসলেন, রবীন্দ্রনাথ আসলেন, সুভাষচন্দ্র, আশু মুখার্জী এঁরা সব আসলেন। বাংলায় তো দিক্‌পালের অন্ত নেই। আরও কত দিক্‌পাল হয়তো লুকিয়ে আছে। সেইসব শক্তিমান পুরুষ আবার যদি লাগে তবে ভারত হয়তো সোনার ভারত হ'য়ে যাবে, দুনিয়াকে পথ দেখাবে।

নলিনীবাবু (চ্যাটার্জী)—আমাদের প্রধান সমস্যা তো কৃষ্টিগত সমস্যা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিকই তো তাই। কৃষ্টি জাগলে আবার সবই জেগে ওঠে।

নলিনীবাবু—এখানে এতজন আছেন, আমি বললাম নৃত্য সম্বন্ধে কেউ জানতে চান তো আমার সঙ্গে আলাপ করবেন। সাহেব দুজন ছাড়া কেউ তা' করলেন না। অথচ বার-বার তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন আবার নাচ কবে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-একটা গুচ্ছের এক একটা ধরন থাকে। Physics (পদার্থবিদ্যা), Chemistry (রসায়নশাস্ত্র)-এর experiment (পরীক্ষা) দেখে কলা-বিভাগের ছাত্র হয়তো অবাক হয়, কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্রদের মতন জিজ্ঞাসু হয় না। তাই নাচ হয়তো উপভোগ করে কিন্তু ওটা জানার আগ্রহ হয়তো তাদের নেই। এমন কেউ থাকলে হয়তো পাছ ছাড়ত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—একবার দুর্ভিক্ষ হ'ল। দেখলাম গরীব লোকরা এর-ওর কাছ থেকে হাত পেতে সাহায্য নেয়, কিন্তু অনেক দুঃস্থ ভদ্রলোক মানুষের কাছে চাইতে পারে না, অথচ কষ্ট পায়। তখন রোজ স্টীমারে ভিক্ষা করে চার-

পাঁচ টাকা উঠত। তা' থেকে দুঃস্থ ভদ্রলোকদের গোপনে যেয়ে কিছু-কিছু দিয়ে আসতাম। তখন ছিল বোমার যুগ। পুলিস আড়ি পেতে শুনে আমাদের সব কথা টুকে নিত। গ্রামের একদল দুষ্টু লোক Magistrate (জেলাশাসক)-এর কাছে খবর দিল যে আমরা ভিক্ষা ক'রে সেই পয়সা দিয়ে বোমা তৈরী করি। গঙ্গাচরণবাবু ছিলেন Magistrate (জেলাশাসক)। তিনি রেগে গিয়ে একদিন আমার কাছে এসে সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ভিক্ষার পয়সা যাকে-যাকে দিতাম সব খাতায় লেখা ছিল। কাদের দিই, কেন দিই শুনে এবং হিসাবপত্র দেখে তিনি খুব খুশী হলেন। এবং আমাকে বললেন আজ তোমার কাছে এসে সব না শুনলে আমি এক অপকর্ম ক'রে ফেলতাম। তখন ভিক্ষার আশি টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। সেটা গোখেল লাইব্রেরীতে দিয়ে দিলাম। দেখ, বীজের যদি জোর থাকে এবং উপযুক্ত মাটিতে যদি পড়ে, আর তার যত্নআত্তি যেভাবে করতে হয় তা' যদি করা যায়, তাহ'লে সে বীজ গজায়ে ওঠেই। আমি নিমিত্তমাত্র। পরমপিতাই তাঁর কাজ করছেন—আমাকে ও দশজনকে দিয়ে। এই যে মানুষ দানা বেঁধে উঠছে এটা পরমপিতার ইচ্ছাতেই হচ্ছে। আর আমার বিশ্বাস, যদি এটা ঠিকভাবে চলে তাতে মানুষের মঙ্গল হবেই। আর, যাতে মানুষের মঙ্গল হয় তা' কেউ কখনও রুখতে পারে না। তবে এর মধ্যেও আগাছা জম্মাবে। নিড়েন দিয়ে সেগুলি তুলে ফেলা লাগবে যাতে আবর্জ্জনা ভাল গাছগুলিকে মেরে ফেলতে না পারে।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ২৭। ২। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে যতি-আশ্রমের বারান্দায় ব'সে আছেন। ইছাপুরের কিরণদা (ব্যানার্জী) এবং সেখানকার অনেক সৎসঙ্গী তাঁর সঙ্গে উপস্থিত আছেন। দুর্গাদাসদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), খগেনদা (তপাদার), প্রফুল্ল প্রমুখ আগে থাকতেই যতি-আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গাদাসদা—আমার মনে হয়, তোমার কাছে কিছু চাই। কিন্তু কী যে চাইব, কিছু বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতাকে চাওয়াই ভাল।

দুর্গাদাসদা—পরমপিতাকে চাইব কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কামনা যদি রাখতে হয় তবে তাঁকে পাবার কামনা রাখাই ভাল।

দুর্গাদাসদা—তাঁকে পাওয়া মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাপ্তি মানে আপ্তি। তিনি যদি আমার চরিত্রচলনে প্রতিপদক্ষেপে

স্ফুরিত হ'য়ে ওঠেন, তাঁর চরিত্র যদি আমার মধ্যে আমার মতো ক'রে সক্রিয়ভাবে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে, তবে তাকেই কয় পাওয়া।

কথাপ্রসঙ্গে কিরণদা বললেন—শ্রমিক-সমস্যা সমাধান করা মানে তো তাদের সমস্যার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে তাদের হৃদয় জয় করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হেসে মধুর ভঙ্গিমায় ডানহাতখানি নেড়ে অন্তরঙ্গভাবে বললেন—আদত ব্যাপার কি জান? প্রথম কথা, তাদের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হওয়া লাগে। ঐ যে বলছ হৃদয় জয় করার কথা, ওর মধ্যে কিছুটা ফাঁক থেকে যায়। কোনকিছু সংগঠন করার কথা বললে আমার শরীর-বিধানের কথা মনে হয়। চোখ, কান, নাক, মুখ এসবগুলি আমাদেরই অঙ্গ। কোন অঙ্গে সামান্য কিছু খাঁকতি হ'লে অন্যসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখনই তার পরিপূরণে লেগে যায় নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার গরজে। শ্রমিকদের ব্যাপারেও—তাদের অমনি ক'রে ভালবাসা লাগে, তাদের জন্য অতখানি করা লাগে,—যাতে তাদের দুঃখটা নিজের দুঃখ ব'লে মনে হয়। শ্রমিকদের স্বার্থ কিন্তু তোমার স্বার্থের সঙ্গে জড়ানো। আবার, তোমার স্বার্থও তার স্বার্থের সঙ্গে জড়ানো।

অজয়দা (গাঙ্গুলী) মণিদা (চ্যাটার্জি) সহ এসে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখ লক্ষ্মী! এমন ক'রে ঠিক ক'রে দেও যাতে আশ্রমের প্রত্যেকটা বাড়ীতে নানারকমের কুটীর-শিল্প গ'ড়ে ওঠে। উপায় ক'রে খাবার জন্য কাউকে যাতে পরমুখাপেক্ষী না হ'তে হয়, তার ব্যবস্থা ক'রে দেও। নিজেদের সব রকমের প্রয়োজন যাতে পূরণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা লাগে। আশ্রমে যদি এটা হয় তখন সেই ধরনে সর্ব্বত্র তা' চারিয়ে দেওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে সোয়া বারোটার সময় নিম্নলিখিত বাণীটি বললেন—

যদি অন্তরচর্য্যা না থাকে
শুধু কামচর্য্যায়
কোন স্ত্রী বা পুরুষ
পরস্পর পরস্পরের
স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারে না,
আর, যতক্ষণ উভয়ের সার্থকতা
একস্বার্থী না হ'য়ে উঠছে
মিলন বা বিবাহও
কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে না ততক্ষণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বাণীটা পড়তে বললেন এবং পড়ার পর তিনি উপস্থিত মায়েদের এ সম্বন্ধে উপমাচ্ছলে বুঝিয়ে বললেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শুধু নিজেরা পরস্পর স্বার্থান্বিত হ'লে হবে না। তার পিছনে উদ্দেশ্য থাকা চাই একযোগে শ্রেয় কারও পরিপূরণ। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে যখন গুরুজন, গুরু বা আদর্শের পরিপূরণে উদ্দাম হ'য়ে ওঠে তখন তাদের ভালবাসাটাও গভীর ও সার্থক হ'য়ে ওঠে। সার্থকতার কেন্দ্রই হলেন পরমপিতা এবং পরমপিতার স্পর্শ আমরা পাই ইষ্টের ভিতর-দিয়ে।

কাজলভাই এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—বাবা! টাবুর নাম তুমি রেখেছ শুনে মদনদা অবাক হ'য়ে গেছে। বলল—একটা কুকুরের নামও ঠাকুর রাখেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—সবাইকে নিয়েই আমি আমি, তুমি তুমি। অপরের সঙ্গে আমরা যখন বিহিত সম্পর্ক অস্বীকার করি, তখনই আমরা খাটো হ'য়ে যাই জীবনে।

একটু পরেই টাবুর একটু চিৎকার শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন—ও চিৎকার করে কেন? যা দেখে আয় তো!

কাজলভাই দেখে এসে বললেন—দুটো কুকুর খেলাচ্ছলে কামড়াকামড়ি করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে আশ্বস্ত হলেন।

১৮ই ফাল্গুন, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২।৩।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে যতিবৃন্দের সঙ্গে নানাবিষয়ে আলোচনা করছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—মানুষ যখন টের পায় তখন তার প্রয়োজন ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে। কিন্তু যথেষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও যারা অযথা প্রয়োজন বেশী না বাড়িয়ে অল্পের মধ্য-দিয়ে সুষ্ঠুভাবে জীবন নির্ব্বাহ করতে পারে, তাদের হাতে এমন-কিছু থাকে, যা' দিয়ে তারা পরিবেশের সেবা করতে পারে কিংবা সঞ্চিত অর্থ মূলধনরূপে গ'ড়ে তুলে তা' দিয়ে পরে এমন একটা-কিছু করতে পারে যাতে শিল্পবাণিজ্য গ'ড়ে ওঠে। আয় এবং ব্যয় দুইই যদি productive (উৎপাদনী) না হয়, তাহ'লে কিন্তু মানুষ ঠ'কে যায়।

প্রফুল্ল—উৎপাদনী ব্যয় বলতে কী বোঝা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর তুমি খাও, যদি তুমি গুরুভোজন বা অতিভোজন কর, তাহ'লে তা' তোমার কর্ম্মশক্তিবৃদ্ধির কারণ না হ'য়ে বরং তোমার শরীরকে রুগ্ণ ও অবসন্ন ক'রে তুলবে। কিন্তু তুমি যদি সহজপাচ্য স্বাদু আহার্য্য মাত্রামত গ্রহণ কর,

তা' তোমাকে জীবনীয় শক্তি যোগাবে। এবং সেই শক্তি তুমি জীবনীয় কাজে নিয়োগ ক'রে সপরিবেশ উন্নতিমুখর হবার সুযোগ পাবে। খাওয়ার পিছনে তুমি যে ব্যয়টা করলে এটা সেখানে productive (উৎপাদনী) ব্যয় হ'য়ে উঠল।

একটু বাদে অজয়দা (গাঙ্গুলী) আসলেন। তিনি আশ্রমের একজন কর্ম্মীর যাজনের ধরন-সম্বন্ধে সমালোচনা করছিলেন। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যখন মানুষের দোষ দেখ, তখন সঙ্গে-সঙ্গে তার গুণটাও দেখো। তাহ'লে তাকে সমগ্র-ভবে দেখা হবে এবং তার উপর সুবিচার করতে পারবে। একপেশে রকমে দেখা, ভাবা বা বলা আমার পছন্দ হয় না। মানুষ একটা জীবন্ত চীজ তো। তাই সে নিজে থেকে যদি না শোধরায় তবে হাতুড়ির ঘা মেরে তাকে তো একদিনে ঠিক করা যায় না। সাধারণ মানুষ ঠ'কে ঠ'কে, ঠেকে-ঠেকে তারপর শেখে। অবশ্য, তীব্র অনুরাগ যদি থাকে তবে সহজেই মানুষের পরিবর্ত্তন হ'তে পারে। কিন্তু সবার তো তেমনটা হয় না। তুমি ওর যাজনের ভুলটা দেখছ, কিন্তু যে আকুতি থেকে ও যাজন করে, তার তারিফ করবে না কেন, বল? যাজন যে করে তার পেছনে থাকে বাঁচার বুদ্ধি। ভাবে, যতবেশী লোক ইষ্টপ্রাণ হবে তত তাদেরও ভাল, নিজেদেরও ভাল। এর পিছনে অনুরাগ ও মঙ্গলবুদ্ধি দুইই থাকে।

অজয়দা—উত্তরপাড়ার দাদারা একটু ক্ষুব্ধ হয়েছেন ঐ ধরনের যাজনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমিই তাদের ঠিক ক'রে দিও……এখানে কত ধরনের কতরকমের লোক আছে। আগে নতুন লোক আসলে আমি সব কথাই গোড়ায় ব'লে দিতাম। বলতাম আশ্রমে নানারকমের লোক আছে, নানা উৎপাত করবে। কতজনে দীক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি করবে, কত মানুষ ভিক্ষা চেয়ে উৎপাত করবে। আবার চোর-চোরও আছে এখানে। এখানকার অসুবিধার কথা বাড়িয়ে বলতাম। তাতে তারা বুঝত, এবং নিজেরাই খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করত। এখন ও-রকম আর অত বলি না। গোড়ায় ঐভাবে ব'লে রাখলে তাদেরই আগ্রহ বেড়ে যায়—প্রত্যেকটা জিনিস proper light-এ (যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গীতে) নিতে এবং খারাপ যা' তা' স্বতঃ দায়িত্বে resist (প্রতিরোধ) করতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। শুক্লা ত্রয়োদশী চাঁদের কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। এখনও অল্প-স্বল্প শীত আছে। তবু আশ্রম-প্রাঙ্গণে, বিশেষত যতি-আশ্রমের কোল ঘেঁষে দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত। তাঁর আনন্দময় সান্নিধ্য ছেড়ে ঘরে ফিরতে চাইছে না মন তাদের। যতি-আশ্রমের বারান্দায় দুটি আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই

আলোর ঝলকে তাঁকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘরে ফেরার আগে ভক্তবৃন্দ সতৃষ্ণ নয়নে প্রাণভরে নিরীক্ষণ করছেন তাঁকে।

কথাপ্রসঙ্গে প্রফুল্ল শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলল—আপনি অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন যাতে ভারত বিভাগ না হয়, কিন্তু আপনি তো জানতেন ভারত বিভাগ হবে। তা' সত্ত্বেও পাবনাতে এত টাকা-পয়সা ও শক্তি ব্যয় করলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা কর না, তাই পার না। কিন্তু আমি কখনও ভাবতে প্রস্তুত নই যে তোমরা পার না। আমি ভাবি, করতে-করতে যদি পার। তাই আমি আগেই তোমাদের সম্বন্ধে না-পারাটা ভেবে নিই কেন? ঠিকমত ক'রে চলাটাই ভাল। ওর ভিতর-দিয়ে যে শক্তি ও অভিজ্ঞতা লাভ হয় সেইটাই তো মস্ত জিনিস। টাকা-পয়সা বিষয়-আশয় অবস্থা বিপর্য্যয়ে নষ্ট হ'তে পারে। কিন্তু তোমার যোগ্যতা ও চরিত্র তোমার কাছ থেকে কে কেড়ে নেবে বল! এইগুলি এবং সঙ্গে-সঙ্গে ইষ্টানুগ পারস্পরিকতা যদি থাকে, তাহ'লে যা' গেছে তার হাজারগুণ ক'রে তুলতে পারবে তোমরা।……আর আশঙ্কা ছিল ব'লেই তো এদিকে জমি-সংগ্রহের কথা অত জোর দিয়ে বলতাম। আর সে কি আজ থেকে বলছি।

শরৎদা—সৎসঙ্গীদের দেবার প্রবৃত্তি খুব। যতি-আশ্রমে আমাদের এতগুলি লোকের শুধু ভিক্ষার ওপর সুন্দরভাবে চ'লে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—সে আর বলতে! যার চোখ আছে, যে দেখতে জানে, সে দেখে মোহিত হ'য়ে যাবে।……আমি যেমন ক'রে মানুষের কাছে চাই, আমি যেমন ক'রে যা' করি, সেইটা যদি আপনারা রপ্ত ক'রে নিতে পারতেন তাহ'লে গুরুতর কাণ্ড হ'য়ে যেত। তখন যা'ই করতে বলি তাতে বলতেন—ঠাকুর এত অল্প চাও তুমি আমাদের কাছ থেকে!

এরপর উত্তরপাড়ার রামগোপালদা (চট্টোপাধ্যায়) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—রামগোপালদা আমার সোনার মানুষ, লক্ষ্মী মানুষ।

রামগোপালদা—সে আপনাদের আশীর্ব্বাদে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—আমারও রামগোপালদার গান শোনবার ইচ্ছে। রামগোপালদারও আমাকে গান শোনাবার ইচ্ছে। কিন্তু ভাবছি মনের আবহাওয়ার একটু পরিবর্ত্তন হ'লে শুনতে পারতাম সোয়াস্তি নিয়ে।

আবার বললেন—রামগোপালদাকে আমার বাবা বলা উচিত। কিন্তু আমার শ্বশুরের নাম ছিল রামগোপাল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আফ্‌লো নিমের শিকড় কোমরে বা হাতে বেঁধে রাখলে অর্শরোগের পক্ষে ভাল।

২৫শে ফাল্গুন, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ৯।৩।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে ব'সে কয়েকটি বাণী দিলেন। প্রফুল্ল বাণীগুলি পড়ার পর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য) প্রশ্ন করলেন—আমরা কী পাপ করেছিলাম যার জন্য আমাদের এত দুর্ভোগ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরুষমাণ মহাপুরুষকে গ্রহণ ক'রে হিন্দুসমাজ যে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি সে একটা মহাপাপ। আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। আমরা কেউ কারও ধার ধারি না। পরশ্রীকাতরতা আমাদের মজ্জাগত। অন্য যত সদ্‌গুণই আমাদের থাকুক না কেন, সংহতি-সন্দীপী গুণগুলি না থাকায় হিন্দুসমাজ এমনি ক'রে দিনের পর দিন মার খাচ্ছে।

কেষ্টদা—যিনি যাহা কিছু হইয়াও তাহাই থাকেন—তাঁর নাম ব্রহ্ম,—এর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন চিনির রথ, হাতি, গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদি আকারে বিভিন্ন হ'য়েও উপাদান হিসেবে চিনি বই আর কিছু নয়কো। তেমনি নানা নামরূপের খোলস ধারণ করলেও মূলে যিনি আছেন তিনি ব্রহ্ম। অবশ্য, ব্যষ্টি বৈশিষ্ট্যও অস্বীকার করবার নয়। কিন্তু অব্যয়ী প্রজ্ঞার দিক থেকে বলতে গেলে বলতে হয় এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেইকো। এটা উপলব্ধি করবার বিষয়। যে এই সত্যকে উপলব্ধি করে—সে সবার মধ্যে নিজেকে দেখে এবং নিজের মধ্যে সবাইকে দেখে। প্রেম ও সেবা তার মজ্জাগত হ'য়ে ওঠে। যাদের ভিতর এই চারিত্রিক লক্ষণ প্রকাশ না পায় অথচ ব্রহ্মজ্ঞানের দম্ভ করে, তারা কিন্তু মেকী মাল।

শরৎদা (হালদার)—খারাপ কিছু ঘটলে ভক্ত তা' কিভাবে দেখে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে সত্তাবিরোধী কোন-কিছুকে ভাল ব'লে মনে করে না। বরং সে ধরতে পারে কেন তা' কেমন ক'রে ঘটল। সব সময় তার নিয়ন্ত্রণী বুদ্ধি থাকে। তাই খারাপেরও সে শুভ নিয়ন্ত্রণ করতে ওস্তাদ হ'য়ে ওঠে। খারাপটাকে যে খারাপ ব'লে বুঝতে পারে না, খারাপকেও যে ভাল ব'লে বলে, সে কিন্তু প্রকৃত সাধু নয়। সত্যিকার তত্ত্বদৃষ্টি থাকলে কোন্‌টা কী তা' যেমন বোঝা যায়, তেমনি সব-কিছুর সাত্বত নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করতে হয় সে বুদ্ধিটাও মাথায় খেলে।

কেষ্টদা—ধরুন, একটা ট্রেন-দুর্ঘটনা হ'ল। সেখানে তো নানা জায়গার লোক একত্র হয়। তাদের সবারই কি একই পাপ থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা অপকর্ম্ম যা' করি তা হয়তো আমাদের স্মরণে থাকে না। কিন্তু তা' যে ব্যুৎপত্তি সৃষ্টি করে সেটা মাথায় থেকে আমাদের চালিত করে! বহু-জনের সমান ধাঁজের অপকর্ম্ম একটা সত্তাঘাতী common danger (অভিন্ন বিপদ) হয়তো আমন্ত্রণ করে। ঐ ভাবাপন্ন বহুজন হয়তো একদিন একটা ট্রেনে চাপল, তাদের কর্ম্মফলের অশুভ প্রভাব পরিবেশকেও ভ্রান্তির পথে পরিচালিত ক'রে একটা দুর্ঘটনা সৃষ্টি ক'রে তোলে। হয়তো রেলের লাইনম্যান ভুল ক'রে বসে। আবার অনেক সময় এর সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগেরও সংযোগ ঘটে। হয়তো তখন এমন কুয়াশা দেখা দিল যে পথ আর দেখা যায় না। বহু ব্যাপার জড়ান থাকে যা' আমরা জানি না। আমাদের দৃষ্টির পরিধিই বা কতখানি? এই দৃষ্টি স্বচ্ছ হয় যদি মানুষ সুকেন্দ্রিক চলনে চলে। তখন তার বুদ্ধি একটা সাত্বত ধাঁজে ক্রিয়া করে। ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের কথা অনেক ইষ্টপ্রাণ ভক্ত পূর্ব থেকেই বুঝতে পারে। তার হয়তো সেই গাড়ীতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু তার শুদ্ধ মনে হঠাৎ জেগে ওঠে এই সময় যাওয়াটা মঙ্গলজনক হবে না, যেয়ে কাজ নেই। তখন যাত্রা স্থগিত ক'রে সে বিপদ থেকে রেহাই পায়। এমনটা হামেশাই ঘটে থাকে।

কেষ্টদা—একজন হয়তো ভক্ত মানুষ, সে হয়তো মনে করে ভগবান মঙ্গলময়, তিনি যা করেন তাতেই মঙ্গল, তার হয়তো অসুখ করল, কিন্তু অসুখটাকে মঙ্গলজনক বিবেচনা ক'রে সে ওষুধ খেল না;—সেটা কি ঠিক হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান মঙ্গলময় সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মানুষ ইষ্টানুগ পথে যখন চলে তার ভিতর-দিয়ে মঙ্গলই আসে। তার ব্যত্যয়ে আসে অমঙ্গল। অমঙ্গলকর কিছু হ'লে তার কারণও সে নির্ণয় করতে পারে এবং তার প্রতিকারের পথও সে বের করতে পারে। এমনি ক'রে অমঙ্গলকে সে মঙ্গলে পরিণত করে। ধর্ম্ম মানুষকে জ্ঞানময় চিরচেতন ও পারঙ্গম ক'রে তোলে। সে কখনও অমঙ্গলের প্রশ্রয় দেয় না। সে ওষুধ খায় না, তা হয় না। বরং তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার জন্য যা'-যা' করণীয়, তা' সে করেই কি করে। ইষ্ট ও পরিবেশের সেবার জন্যই যে তার সুস্থ থাকা প্রয়োজন।

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ১২।৩।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

পূজনীয় বাদলদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), কিরণদা (মুখার্জ্জি), হরিদাসদা (সিংহ), প্রফুল্ল প্রমুখ তাঁর কাছে আছেন।

টাটানগর থেকে জনৈক দাদা এসেছেন। তিনি বললেন, চব্বিশ ঘণ্টা নাম করলে শরীরের মধ্যে একটা জ্বালা হয়। এর কি করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম জপ করলে অমন হয়। কারণ, নাম করলে স্নায়ুর উপর একটা চাপ পড়ে। আমারও ঐরকম হ'ত। কিন্তু নাম করতে-করতে পরে ক'মে যায়। তবে সইয়ে-সইয়ে বাড়ান ভাল। যতক্ষণ ভাল লাগে ততক্ষণ করবে, আবার একটু ফাঁক দেবে, আবার করবে। খাওয়া-দাওয়া এমন করবে, যা' কিনা পরিমিত, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর। আহার-বিহার, চালচলন, কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম, সঙ্গ-সাহচর্য্য সবকিছু যদি ইষ্টমুখী না হয় তাহ'লে নামের ফল ঠিক-ঠিক পাওয়া যায় না। নামের সঙ্গে-সঙ্গে ধ্যান চাই, আবার চাই বাস্তব কর্ম্ম। এ উজানে পাড়ি দেবার মতো। মনের ধাঁজটা ঊর্দ্ধমুখী রাখা লাগে। যখন সাধন-ভজন মানুষ ঠিকমত করে তখন তার যৌন সংস্রবে লিপ্ত হওয়া সম্বন্ধেও খুব সাবধানে থাকতে হয়। অবশ্য, পরমপিতার দিকে মন থাকলে মন নীচু দিকে নামতেই চায় না।

উক্ত দাদা—কামক্রোধ জয় করা যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলি ignore (উপেক্ষা) করা লাগে। আর, যদি খুব বেগ আসে তখন সচেতনভাবে ভালর দিকে তার মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়। যেমন, কারও উপর হয়তো খুব রাগ হল এবং তাকে কটু কথা বলার প্রবৃত্তি হ'ল। তখন অত্যন্ত হুঁশিয়ার হ'য়ে চেষ্টা ক'রে তাকে কটু কথা না ব'লে প্রিয় কথা বলতে শুরু করতে হয়। ঐভাবে করতে-করতে ক্রোধের স্থানে পরমপ্রীতির ফোয়ারা ফুঁড়ে বেরোতে থাকে। তখন হয়তো মানুষটা জল হ'য়ে যায়। যাকে তুমি হারাতে বসেছিলে সেই তোমার পরমমিত্র হ'য়ে দাঁড়ায়। এইরকম করতে থাকলে অঢেল আত্মপ্রসাদ মনকে প্লাবিত ক'রে তোলে।

কলকাতা থেকে মন্মথদা (ব্যানার্জ্জি) ও প্রফুল্লদা (মুখার্জ্জি) এসেছেন। তাঁদের দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর পরম প্রীত হ'য়ে নানাকথা বলতে লাগলেন।

মন্মথদা বললেন—অনেকে তো বলে, সৎসঙ্গ একটা ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান। সেখানে তো politics (রাজনীতি)-এর স্থান থাকা উচিত নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মকে অর্থাৎ বাঁচা-বাড়াকে পরিপূর্ণ করে যা তাই politics (রাজনীতি)। ধর্ম্মের মধ্যে politics (রাজনীতি) থাকবে না কেন? জীবনের জন্যে যা'-যা' প্রয়োজন তার সবকিছুরই স্থান আছে ধর্ম্মের মধ্যে। Politics (রাজনীতি) জীবনেরই জন্য। তাই আমাদের বলত রাজধর্ম্ম। জীবনকে যেমন খণ্ড-খণ্ড ক'রে ভাগ করা যায় না, জীবনের সব দিকটা নিয়ে জীবন, তেমনি ধর্ম্মকেও খণ্ড-খণ্ড করা যায় না, জীবনবৃদ্ধির যাবতীয় যা'-কিছু নিয়েই ধর্ম্ম। আর, ধর্ম্ম

থেকে যখন আমরা জীবনের নানা দিককে বিচ্ছিন্ন করেছি তখনই শুরু হয়েছে গোলমাল।

বিবর্ত্তন সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অব্যক্ত ব্যক্তের বিকাশকে ব্যাহত করতে চায়। নচেৎ মৃত্যু ব'লে জিনিসটা থাকত না। ব্যক্ত আবার অব্যক্তকে overcome (অতিক্রম) করতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। তার ভিতর-দিয়েই evolution (বিবর্ত্তন) এগিয়ে চলে। কোন বাধা না থাকলে এবং তা' অতিক্রম করার সঙ্কল্প না থাকলে আমাদের গতিটা জোরদার হয় না। বাধাকে যত আমরা বাধ্য করি ততই আমাদের শক্তি ও জ্ঞান দুই-ই বৃদ্ধি পায়। আর, এর ভিতর-দিয়েই আমাদের অস্তি সমৃদ্ধতর হ'য়ে চলে।

৯ই চৈত্র, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২৩।৩।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে বসে বেলা পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন :—

দৈব ভালই থাক্ আর মন্দই থাক্,
পুরুষকার তাকে যেমন
পোষণ দেবে ও নিয়ন্ত্রণ করবে
সক্রিয় আনুকূল্যে
বা প্রতিকূলতায়,
অবস্থাও তেমনতর হবে—
তা' ভালর দিকেই হোক আর মন্দর দিকেই হোক।

এই সময় মুর্শিদাবাদের কয়েকজন সৎসঙ্গী যতি-আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কর্ম্মের ফল অমোঘ, তা' কেউ এড়াতে পারে না। কর্ম্মফল সম্বন্ধে মানুষ যদি সচেতন হ'ত, তাহ'লে ধর্ম্মের পথে না চ'লে সে পারত না। আদত কথা, আমাদের চিন্তা ও চেতনা অপুষ্ট। আমরা জড়ের মতো চলি। সংস্কারই আমাদের চলনার নিয়ামক। তাই আমাদের চলাটা মঙ্গলের পথে হচ্ছে কিনা সে-সম্বন্ধে আমাদের খেয়াল থাকে না। আমরা বেপরোয়া হয়ে জীবনকে অগ্রাহ্য ক'রে চলি। কিন্তু বিধিকে বা দুঃখকষ্ট, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। তা' হুড়মুড় ক'রে এসে আমাদের ঘাড়ের উপর চাপে। এখন আমরা অপরকে দায়ী করি বা অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাই। কিন্তু নিজেকে দায়ী না করলে, নিজের দোষ না শোধরালে দুর্দ্দৈব দুর্নিবার হ'য়ে আমাদের ঘায়েল করেই কি করে।

জনৈক দাদা—আজ পূর্ব্ববঙ্গে যা' হচ্ছে সে তো আমাদেরই কর্ম্মফল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মফল তো বুঝলাম, কিন্তু আজ যা' হচ্ছে তা' আমরা চাই কিনা ? রত্নাকর একসময় দস্যু ছিল। কর্ম্মফলেই সে তেমনতর হয়েছিল। কিন্তু আপন কর্ম্ম ও সাধনার বলে পূর্ব্ব কর্ম্মফলের প্রতিকার ক'রে সে আবার একদিন বাল্মীকিও হ'য়ে উঠেছিল। এটাও বাস্তব ঘটনা। সুতরাং কোন ব্যাপারে কর্ম্মফলের দোহাই দিয়ে হাত-পা ছেড়ে ব'সে থাকলে চলবে না। কাম্য যা' তা' পেতে যে-চলনে চলা লাগে তা' চলতে হবে।

উক্ত দাদা—ভগবানের অভিপ্রায় না হ'লে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের অভিপ্রায় ততখানি হয়, তাঁর প্রতি আমরা যতখানি অনুরাগী হই। এত মানুষকে আমরা মরতে দেখি, তা' সত্ত্বেও মরাটা আমাদের ভাল লাগে না। মরাটা এড়িয়েই চলতে চাই। এতে বোঝা যায়, ভগবানের অভিপ্রায় বেঁচে থাকা। তাই বাঁচার তৃষ্ণা মানুষের কিছুতে যায় না। এটা philosophy (দর্শন) নয়—মোটা বুঝ। একটা কুকুর, শিয়াল, বানর এমনকি পিঁপড়েটারও এ বুঝ আছে। জীব অথচ জীবনপ্রীতি নেই এমন খুব কমই দেখা যায়। জীবনপ্রীতি থাকা সত্ত্বেও প্রবৃত্তির কয়েদ হয়ে আমরা অনেক সময় চলি মরণের পথে। মানুষের মতো বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে এটা একটা insulting (অপমানজনক) ব্যাপার।

সুশীলদা (বসু) para-psychology (পরামনস্তত্ত্ব) সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন—মানুষের মন কেমন ক'রে ইতর প্রাণীকে পর্য্যন্ত প্রভাবিত করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আগে ও রকম কত হ'ত। শকুন হওয়া, শিয়াল হওয়া ইত্যাদি কত কী হয়েছি এবং তাদের দেহে ঢুকে কত কী করেছি। আমি যেমন মনে করতাম ওরা ঠিক তেমনি করত। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম অমন সময় যদি মৃত্যু হয় তো গেছি। এটা খুব বড় জিনিস নয়। একটু চেষ্টা করলেই হয়, যে-কেউ পারে।

মানুষ যেমন চিন্তা করে, কাজ করে, বলে ও ব্যবহার করে মস্তিষ্কের উপর তা' তেমনতর ছাপ ফেলে-ফেলে চলে। আমাদের বৃৎপত্তিও গ'ড়ে ওঠে ঐ ছাপ অনুযায়ী। এর প্রভাবে মানুষের চলন অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক সময় বিকৃত পথ নেয়। চাই এই কর্ম্মফলের উপর জয়ী হওয়া এবং সেটা হ'তে পারে যদি আমরা ইষ্টানুরাগী হই, এবং ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার মাপ-কাঠিতে ভালমন্দ যা-কিছুকে মেপে-মেপে চলি। সদ্‌গুণও আমাদের অকল্যাণের কারণ হ'তে পারে যদি তার ইষ্টানুগ বিন্যাস না হয়। ধরুন, আপনার খুব দানপ্রবৃত্তি আছে। একজন মাতাল যদি রোজ আপনার

কাছে প্রার্থী হিসেবে আসে এবং আপনি যদি নিত্য তাকে বেপরোয়াভাবে দান ক'রে চলেন তবে তা' কিন্তু তার, আপনার ও পরিবেশের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে।

অনেক পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

যে নৈতিকতা আত্ম ও আপ্তঘাতী,
ধ্বংসের আমন্ত্রক
অথচ নিরাকরণ বা নিরোধে নিষ্ক্রিয়,
বর্দ্ধনার ব্যাহতি,—
তা' যত বড় সাধু-পোষাকেই হোক না কেন,
সর্ব্বনাশা তা'—
পাপের তা'
দুশ্চরিত্রের দুর্ম্মর্দ অভিশাপ তা'।

১০ই চৈত্র, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২৪।৩।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোলতাঁবুতে সমাসীন। পূজনীয় খেপুদা, সুশীলদা (বসু), কিশোরীদা (চৌধুরী), হাউজারম্যানদা প্রমুখ অনেকেই তাঁর কাছে ব'সে আছেন। গোধূলির সোনালী গোলাপী আভায় আশ্রম-প্রাঙ্গণ অপরূপ রূপ ধারণ করেছে। চারিদিকে গাছপালা, তারই মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দে বিচরণ করছেন। কোথাও কোথাও দুচারজনে ব'সে ইষ্টপ্রসঙ্গ আলোচনা করছেন বা সাংসারিক সুখদুঃখের কথা বলছেন। কেউ-কেউ বা প্রস্থানোদ্যত। এমন সময় কোলকাতা থেকে কয়েকজন দাদা আসলেন। ধীরে-ধীরে দেশবিভাগ সম্বন্ধে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা integrating point (সংহতি-সূত্র) ও sentimental condensation (ভাবগত সম্বদ্ধতা) নষ্ট ক'রে সর্ব্বনাশ করেছি। একই আদর্শকে অনুসরণ করার অভ্যাস থাকলে মানুষগুলি স্বভাবতঃই পরস্পরে স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে। তার ভিতর-দিয়েই গজিয়ে ওঠে সংঘশক্তি। আমরা একক যে যত জ্ঞানী-গুণী হই না কেন, পরস্পর সংঘবদ্ধ না হ'লে প্রবল প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়াতে পারি না। একটা গোঁড়ামির বেড়া থাকা ভাল। তা বাদ দিয়ে শুধু ঔদার্য্য নিয়ে চললে হয় না। তাতে spine (মেরুদণ্ড) ভেঙে যায়। আমাদের কত মেয়ে নীচু ঘরে বাইরে চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে যদি আমাদের প্রাণে না লাগে তাহ'লে বিপদের কথা। আজকাল আকছার প্রতিলোম হচ্ছে। বড়ঘরের মেয়েরা টাকার লোভে, সুখ-সুবিধার লোভে যেখানে-সেখানে বিয়ে করছে। এটা কি হ'তে পারে যদি কুলকৃষ্টি সম্বন্ধে তাদের একটা গভীর গৌরববোধ থাকে?

ছেলেমেয়েদের সেই শিক্ষাই আমরা দিই না। তাই সামান্য একটা প্রলোভনে প'ড়ে যার-তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। জাত্যভিমান ভাল না। কিন্তু আভিজাত্যবোধ ছাড়লেই সর্ব্বনাশ।

জনৈক দাদা—আমাদের সমাজে সহনশীলতার অনুশীলন খুব হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্ট ও কৃষ্টির প্রতি নিষ্ঠা বাদ দিয়ে যে toleration (সহনশীলতা) তার কোন দাম নেই। তোমরা আবার উঠে-প'ড়ে লাগ। একবার যদি কোন মন্ত্রে, কোন কৌশলে, কোন কায়দায় মানুষগুলিকে সংহত ক'রে তুলতে পার, তাহ'লে আর ভাবনা নেই। তার জন্য চাই প্রচণ্ড সম্বেগে আদর্শ-সঞ্চারণা। তোমরা যদি একবার একগাট্টা হ'য়ে দাঁড়াতে পার, তাহ'লে তোমাদের সঙ্গে কেউ পারবে না কোন বিষয়ে। ইংরেজের শাসন ও পেষণে তোমরা কিন্তু কোনদিন দমনি। তোমাদের ঘরের ছেলেরা হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছে। সে-শক্তি, সে-তেজ এখনও তোমাদের মধ্যে আছে। চাই তাকে নতুনভাবে জাগিয়ে তোলা ও সংগঠিত করা। বাঁচলে বাঁচার মতো বাঁচা ভাল। মিনমিনে, পিনপিনে হ'য়ে কোনভাবে জীবন-ধারণের কোন অর্থ হয় না। জীবন ভগবানের দান। তাঁর দেওয়া জিনিস তাঁর কাজে লাগিয়ে সার্থক ক'রে তোলা লাগে।

উক্ত দাদা—সংহত করবে কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশিষ্ট যারা তাদেরই করণীয় এ-কাজ। সি. আর. দাশ পর্য্যন্ত একটা রকম ছিল। এখন আর সে-ধরনের মানুষ দেখি না। সুভাষবাবুর কথা যা' শুনি তাও খুব ভাল লাগে। কিন্তু যখন শুনি হয়তো তিনি নেই, তখন মনটা খারাপ হ'য়ে যায়।

উক্ত দাদা—শীঘ্র কি সুদিন আসবার সম্ভাবনা আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুদিন আমরা আনলেই আসে। সুদিনও কুদিন হয়ে যায় চলবার দোষে। আজকাল এত আন্দোলন হয় কিন্তু ছেলের বাবারা তো এ আন্দোলন করে না যে, আমরা কিছুতেই পণ নিয়ে ছেলে বিক্রি করব না। ঘরে-ঘরে কত মেয়ের বাবা আজ মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না, তখন তারা অসুবিধা এড়াবার জন্য নীচু ঘরেও মেয়ে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। মেয়েরাও অনেক সময় স্বেচ্ছায় যার-তার গলায় মালা দেয়। আগে আমাদের দেশে যেমন ধর্ম্মগুণ্ডা ছিল, তেমনি আবার করা দরকার। কৃষ্টিমুখী যাজন যেমন চাই, কৃষ্টিবিরোধী চলনায় যারা চলবে তাদের বিরুদ্ধে তেমনি বজ্রকপাট সৃষ্টি করা চাই। কাউকে বেচাল চলতে দেখলেই সেখানে রুখে দাঁড়ান লাগে। তাতে লোকে সাবধান ও সংযত হয়।

১১ই চৈত্র, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ২৫। ৩। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা এগারটার পর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে সুশীলদার (বসু) সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন—সত্যিকার ইষ্টপ্রাণতার লক্ষণ হচ্ছে, সে যাই কিছু করুক, যাই কিছু ভাবুক, যাই কিছু বলুক, তা' ইষ্টার্থে বিনায়িত হয়ে উঠবেই কি উঠবে। এইভাবে জীবনের যা'-কিছু একার্থে অন্বিত হয়ে না উঠলে সত্তার মধ্যে অখণ্ডত্ব জিনিসটা প্রতিষ্ঠা পায় না। আর, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের সত্তা খণ্ডিত থাকে তত সময় আমরা দ্বন্দ্বের পারে যেয়ে দাঁড়াতে পারি না, প্রবৃত্তি আমাদের উপরে আধিপত্য করেই কি করে। আর, যত সময় প্রবৃত্তি আমাদের উপর প্রভুত্ব করে, তত সময় আমরা কিন্তু অমৃতের রাজ্যে পেঁছি না, এবং নির্ম্মল আনন্দ যা' তাকেও উপলব্ধি করতে পারি না। সত্তাপ্লাবী টান যখন ইষ্টে হয় তখন আমরা ইষ্টের লীলাস্থণ্ডিলরূপে পরিণত হই। তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র, এমনতর ভাবটা তখন বাস্তবায়িত হ'য়ে ওঠে। জীবনটা একটা ফুরফুরে দখিনা হাওয়ার মত স্বচ্ছন্দে ব'য়ে চলে।

সুশীলদা—আপনি যা' বললেন তা' তো খুব উচ্চস্তরের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা খাঁটি হ'লে যা' হয় তাই আমি বললাম। এমনি ক'রেই মানুষ নিষ্ঠায় নিনড় হয়। সে ইষ্টের থেকে তিলেকের জন্যও নড়ে না। ইষ্টের থেকে মন সামান্য একটু বিচ্যুত হলেই তার প্রাণ আইঢাই করতে থাকে। মানুষের চরিত্র যখন এমনতর হয় তখন তার সংস্পর্শে কত মানুষের জীবনে যে অজ্ঞাতসারে ভাবভক্তি সঞ্চারিত হ'য়ে যায় তার লেখাজোখা নেইকো।

কথাপ্রসঙ্গে সুশীলদা বললেন—ইষ্টভৃতির গুণের শেষ নেই। সাম্প্রতিক বরিশালের গোলমালে যজন-যাজন-ইষ্টভৃতিপরায়ণ সৎসঙ্গীরা যেভাবে রক্ষা পেয়েছে, তা' অলৌকিক ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। অনেকে এমনতর উপলব্ধি করেছে যে, দেহধারী আপনি উপস্থিত হ'য়ে তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। একজন হয়তো কাউকে খুন করতে এসেছে। আর আপনার ভ্রূকুটি দেখে সে ভয় পেয়ে স'রে গেছে—এমনতর ঘটনাও ঘটেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাবণ্যমার এক বোন কিছুদিন আগে স্বপ্ন দেখেছিল, আমি নাকি তার কাছে গিয়ে চিড়ে এবং ক্ষীর খেতে চেয়েছিলাম। সেও সব যোগাড় ক'রে আমাকে খেতে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় আমি নাকি তাকে বলেছিলাম—'তাড়াতাড়ি কর, আমার এখন বরিশাল যেতে হবে।' আমি তো কেউ না, যা' করেন পরমপিতাই করেন। মনে হয় পরমদেবতা বোধহয় বরিশালে উপস্থিত থেকে অজানিতে অদৃশ্য

হস্তে তাদের কেমন ক'রে রক্ষা করেছেন। যারা রক্ষা পায় তাদের মধ্যে কিন্তু রক্ষা পাবার মত সমাবেশ থাকে। নিষ্ঠা-সহকারে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ক'রে চলা মানে মস্তিষ্ককোষ ও স্নায়ুবিধানের মধ্যে সত্তা-সংরক্ষণী লওয়াজিমা মজুত ক'রে চলা। বিপদ-আপদের মুহূর্তে এটা বেশী ক'রে উপলব্ধি করা যায়। সেই সঞ্চিত সম্পদ থাকে ব'লেই ঐ সময় তার অভিব্যক্তি দেখা যায়।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হয়ে আনন্দে কথাবার্ত্তা বলছেন।

খুলনার ধনঞ্জয়দা (পাল) জিজ্ঞাসা করলেন—পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দু হিসাবে আমাদের এখন করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর সে-কথার উত্তর দেবার আগে প্রফুল্ল বলল—যেসব খবর শুনি তাতে তো মনে হয়, যারা ঠিকমত যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করে তাদের কোথাও ভয় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনি তো তাই যে, তাদের অনেকে অদ্ভুতভাবে বেঁচে যায়। কিন্তু পরমপিতাকে ঐভাবে খাটালে পরে মুশকিল হ'তে পারে। ভগবানকে অমন ক'রে পরীক্ষা করতে গেলে পরিণামে তুমিও পরীক্ষার মধ্যে পড়তে পার। বাইবেলে আছে, 'Do not tempt Lord. thy God, (তোমার প্রভু ভগবানকে পরীক্ষা করতে যেও না।)

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

সেখানে নদীয়া জেলার জনৈক মুসলমানভাই এসে নানা বিষয়ে জানতে চাইলেন।

তার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রসুল যা' ব'লে গেছেন তার সঙ্গে হিন্দুশাস্ত্রের কোন গরমিল নেই। একই কথা বিভিন্ন ভাষায় বলা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের graduate (স্নাতক)-দের মধ্যেও যেমন কোন তফাত নেই, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রাণ মানুষদের মধ্যে তেমন কোন ফারাক নেই। সবাই একেরই পূজারী। তাই পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি যাতে হয়—তাই কর লক্ষ্মী। খেটেপিটে যদি শান্তি আনতে পার তবে ইসলামের সেবা কিছুটা করা হয়। তোমার মতো সাধু প্রকৃতির মানুষরাই এটা করতে পারে। যদি পার তাই কর। তাতে রসুল খুশী হবেন। খোদা-তালার আশীর্ব্বাদভাজন হবে তুমি। জানবে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ঈশ্বরেরই সত্তা বিদ্যমান। তাই প্রাণভরে তাদের সেবা করবে। ভক্তির সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে তাদের আপন ক'রে নেবে। বিপন্ন হিন্দু যারা আসছে এদেশে, তাদের বান্ধব যদি হ'য়ে উঠতে পার—আশ্রয় ও সেবা-সাহায্য দিয়ে, তাহ'লে সেটা রসুলেরই সেবা ব'লে পরিগণিত হবে। পাকিস্তানে মায়েদের উপর যে অত্যাচার

করেছে, তা কিন্তু অত্যন্ত জঘন্য। কোন স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা নষ্ট করা মানে নিজের গর্ভধারিণীকেই অপমান করা। মানুষ অত্যন্ত পশুস্তরে নেমে না গেলে এমনতর কাজ করতে পারে না। যারা এ-সব করেছে—তাদের মা-বোনের উপর কেউ যদি অত্যাচার করে তাহ'লে তাদের কেমন লাগে, তা' তারা ভেবে দেখে না। হজরত রসুলকে মানব না, তাঁর দোহাই দিয়ে অপকর্ম্ম করব। এর মধ্যে ধর্ম্মের নামগন্ধও নেইকো। আছে মোনাফেকী।

মুসলমান ভাইটি বিনীতভাবে বললেন—আপনার এ উপদেশ আমি মেনে চলতে চেষ্টা করব।

১২ই চৈত্র, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ২৬। ৩। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

কোলকাতা থেকে কতিপয় ভদ্রলোক এসে বললেন—আমরা সৎসঙ্গ সম্বন্ধে জানতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদা (হালদার) ও ননীদা (চক্রবর্ত্তী)-কে তাদের সাথে যতি-আশ্রমের বাইরে গিয়ে কথা বলতে বললেন। যা'হো'ক, আলোচনা তর্কে পরিণত হল।

খানিকটা বাদে শরৎদা এবং ননীদা উভয়ে ফিরে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাদের কথাবার্ত্তায় ভদ্রলোকরা খুশী হয়েছেন তো ?

উভয়েই তখন বাস্তব বৃত্তান্ত বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তর্কের মধ্যে না ভিড়ে আপনাদের এমন ব্যবহার করা উচিত ছিল যাতে ভদ্রলোকরা খুশী হন। তর্কের ভিতর-দিয়ে মানুষকে বোঝান যায় না। Friendly conversation (বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্ত্তা)-এর ভিতর দিয়ে মানুষের conviction (প্রত্যয়) এনে দিতে হয়। তর্কে লিপ্ত হলেই মানুষের ego (অহং) still (শক্ত) হ'য়ে যায়। বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনায় মানুষের অহং কিছুটা নরম থাকে, এবং তখন খোলামেলাভাবে আলাপ করার সুবিধা হয়।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—কেউ যদি যুদ্ধং দেহি ভাব নিয়ে কথা বলতে আসে সেখানে বন্ধুসুলভভাবে আলোচনা করা যায় কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যেমন করি। হয়তো তার একটা কথার উত্তরে তুমি বললে—তা তো আপনি ভাবতেই পারেন, আপনি তো জানেন না—শুনেছেন ভালমন্দ কতরকম। অবশ্য, মানুষের ধারণা হয় তার ভাব ও বোধ-অনুযায়ী। তারপর

ও-কথা বাদ দিয়ে হয়তো অন্য কথা পাড়লে আর তার মধ্যে-দিয়েই ফাঁকে-ফাঁকে নানা কথার মধ্য-দিয়ে তার knot (গেরো)-টা নিরসন ক'রে দিতে লাগলে। সক্রেটিসের মতো কথাবার্ত্তা বলতে হয়। তুমি যা' বলতে চাও, goad (চালনা) ক'রে তার মুখ দিয়েই তা' আদায় ক'রে নিতে হয়। কিংবা তার কথার অযৌক্তিকতা তাকে দিয়েই স্বীকার করিয়ে নেওয়া লাগে। আর, এ্যাণ্টনির ঐ কৌশলটা খুব ভাল। যেমন সে ব্রুটাসকে প্রশংসা করতে-করতে সিজারের হত্যাকারীদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত ক'রে দিল এবং জুলিয়াস সিজারের ত্রুটি কিছুটা স্বীকার ক'রেও তার মহৎ গুণগুলির কথা প্রাঞ্জলভাবে ব'লে সমবেত জনতাকে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধেই ক্ষেপিয়ে তুলল।

শরৎদা—অবতার-পুরুষের প্রকৃষ্ট পরিচয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি হন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। পূর্ব্বতন অবতার-পুরুষদের প্রতি তাঁর থাকে অকাট্য অনুরাগ। এবং তাঁদের তিনি প্রতিষ্ঠা ক'রে চলেন। উৎসর্জনাথনতা তাঁর চরিত্রগত লক্ষণ। তাঁরা অনন্ত জ্ঞান ও গুণের ভাণ্ডার হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কোন হীনম্মন্য অহঙ্কার থাকে না। দ্বন্দ্বপ্রবণ মনোবৃত্তি তাঁদের ভিতর দেখা যায় না, যদিও তাঁরা অন্যায়ের সঙ্গে কখনও আপোষরফা করেন না। প্রত্যেককে বড় ক'রে তুলেই তাঁরা আনন্দ পান। কাউকে খাটো করবার মনোভাব তাঁদের দেখাই যায় না। তাঁরা প্রত্যেকের মধ্যেই ভগবৎ-চেতনা জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট থাকেন। তাঁদের সংস্পর্শে মানুষের আত্মিক চেতনা স্বতঃই উদ্বোধিত হ'য়ে ওঠে। তাঁরা নিজেরা solved complex (সমাহিত প্রবৃত্তি)-র মানুষ ব'লে যে-কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে তার সমাধান কিভাবে হ'তে পারে তাই দেখান তাঁরা। প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষরা যেখানে জটিলতা ও বিভেদের সৃষ্টি করে সেখানে তাঁরা জটিলতাকে সরল করেন এবং ভেদবিভেদের স্থানে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

রমন মহর্ষির সম্বন্ধে সুশীলদা (বসু) বললেন—তিনি গুরুর কথা বলেন না। তিনি বলেন—Think intently who am I and everything will evolve (মনোযোগ-সহকারে চিন্তা কর আমি কে এবং সব কিছুই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে।)

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, উপযুক্ত গুরু না থাকলে meaningful concentric adjustment (সার্থক সুকেন্দ্রিক বিন্যাস) হয় না। সেইজন্য গুরুর ওপর অত জোর দিই। নিজে-নিজে ভাবতে ভাবতে অনেকে প্রবৃত্তির খাদে প'ড়ে বিভ্রান্ত হ'তে পারে। ঐ পথে বোধ ও জ্ঞানটা দানা বেঁধে ওঠে না। গুরু যিনি হবেন তাঁর সব প্রবৃত্তিই সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। নইলে তাঁকে ভালবেসে ও অনুসরণ ক'রে পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—প্রীতি-প্রত্যাশা জিনিসটা আমার যায় না। এ বোধহয় মানুষের থেকেই যায়। আমি কেমন প্রীতিভিক্ষুক হ'য়ে থাকি। Active sympathetic love-touch (সক্রিয় সহানুভূতিপূর্ণ প্রীতিস্পর্শ) পেলে খুব ভাল লাগে। আপনাদেরও যদি মানুষ ভালবাসে, তাও আমার খুব ভাল লাগে। আমার মনে হয় আমাকেই যেন ভালবাসছে তারা। আমি এটা খুব উপভোগ করি। আপনাদের সুখ-সুবিধা, উন্নতি হ'লে, আপনাদের সমাদর ও প্রতিষ্ঠা হ'লে নিজেকে বড় সুখী মনে হয়। আমিই যেন বর্তে যাই। আবার, আপনাদের কষ্ট দেখলে মনে হয়, আমিই যেন বেঘোরে প'ড়ে গেছি।

১৫ই চৈত্র, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ২৯।৩।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ উপস্থিত আছেন। এমন সময় মজঃফরপুরের একজন মুনসেফ আসলেন।

তাঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের কৃষ্টিতে গোঁড়া হয়ে যতখানি উদার হ'তে পারি, তা' ভাল। কিন্তু কৃষ্টিতে শ্লথ হ'য়ে যদি উদার হ'তে যাই, তবে তা' ধ্বংসের দূত হ'য়ে উঠবে আমাদের। আত্মিক শক্তিকে প্রবুদ্ধ রাখতে গেলে যেমন শরীরকেও সঞ্জীবিত ও সুস্থ রাখতে হয়, আমাদের শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখতে হলেও তেমনি কৃষ্টির কাঠামোটা ঠিক রাখা লাগে। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহটা স্থগিত হওয়ায় আমাদের সমাজের আত্মীকরণ ক্ষমতাটা ক'মে গেছে। আগে বাইরের যারা এসেছিল তারা অনুলোমক্রমিক বিবাহের প্রভাবে সমাজের অঙ্গীভূত হ'য়ে গেছে। তাছাড়া, পরিপূরণী আদর্শকে গ্রহণ ক'রে, অনার্য্য যারা এসেছিল তারা শুচীকৃত হয়ে সমাজদেহে স্থান লাভ করেছে। আজকাল উল্টো হচ্ছে। আমাদের কত মেয়েরা অন্যের খোরাক হচ্ছে। আবার, ছেলেরা নিজেদের ধর্ম্ম-কৃষ্টি ভুলে অন্যদিকে ঝুঁকছে। পৃথিবীতে এমন কোন prophet (প্রেরিতপুরুষ) আসেননি যিনি বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, ধর্ম্মসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও সংহিতায় নিহিত সত্যকে অতিক্রম ক'রে নূতন কিছু বলেছেন। এই আওতার মধ্যে প'ড়ে যায় সকলের বাণী। কিন্তু আমাদের ঘরে কী আছে, সেদিকে আমাদের নজর নেই। সেইদিকে যাতে মানুষের নজর যায় তাই করুন আপনারা সবাই মিলে। তা' না হ'লে কিন্তু বিজাতীয়ভাবে ছেয়ে যাবে সারা দেশ। সে-প্লাবন কিছুতেই রোধ করা যাবে না। তখন নিজেদের বৈশিষ্ট্য ব'লে কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর, এ-সব চারাতে গেলে নিজেদের জীবনে ও আচরণে সেগুলি প্রতিফলিত ক'রে তুলতে হবে। নইলে উপরসা কথার দাম হবে না।

নবাগত ভদ্রলোক বললেন—আমরা উপায় করি, খাই-দাই, কিন্তু দেশের ও জাতির প্রকৃত কল্যাণ সম্বন্ধে বিশেষ একটা চিন্তা করি না। আপনার এইসব ভাবধারা যাতে লোকের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তা' করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' করবেন আপনারা।

এরপর ভদ্রলোক প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

১৬ই চৈত্র, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ৩০। ৩। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে ব'সে অশ্বত্থগাছের দিকে চেয়ে দু'টি পাখির খেলা দেখছিলেন আনমনে। পরে শরৎদা (হালদার) অধ্যাত্মচেতনার মানে জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অধ্যাত্মচেতনা মানে জৈবী-সংস্থিতিকে অধিকার ক'রে যে আত্মিক চেতনা ক্রিয়া করে—তাই। দেহ ছাড়া আত্মা থাকতে পারে, কিন্তু আত্মা যখন দেহান্বিত হয় তখনই আত্মিক চেতনার ক্রিয়াশীলতা আমরা দেখতে পাই। ধরেন, এমনি বাষ্প হয়তো বায়ুমণ্ডলে কত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার শক্তি ভাল ক'রে বুঝতে পারেন না। কিন্তু সেই বাষ্প যখন ইঞ্জিনরূপ বিশেষ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে বিহিতভাবে চালনা করা হয়, তখন তার শক্তি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। সে নিজে তো চলেই এবং আরও কত কিছুকে অনায়াসে চালিয়ে নিয়ে যায়। অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন মানুষ যারা, তারা নিজেরা তো ধর্ম্ম, ইষ্টকৃষ্টির পথে চলেই, অন্যকেও সেই পথে চলতে প্রেরণা যোগায়। যারা ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাপরায়ণ জীবনযাপন করে, তারা পরিবেশের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হয়ই এবং ধর্ম্মদানই হয় তাদের প্রধান কাজ। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান, তাদের হয় স্বভাবগত প্রকৃতি।

বেলা গোটা দশেকের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্রশয্যায় ব'সে ভক্তদের সঙ্গে হাসিমুখে কথাবার্ত্তা বলছেন।

পূজনীয়া ছোটমা, রাঙামা, সরোজিনীমা, ননীমা, দুলালীমা, হেমপ্রভামা, রাণীমা, মঙ্গলামা, সুমতিমা, উমাশঙ্করদা (চরণ), প্রফুল্ল প্রমুখ অনেকেই সেখানে উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে সরোজিনীমা জিজ্ঞাসা করলেন—উপনয়নের সময় কর্ণবেধ হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্টের ভিতর-দিয়ে যা' আমরা না পাই তার মর্য্যাদা আমরা বুঝি না, তাই এই কর্ণবেধের ব্যবস্থা। সব জিনিসেরই মূল্য দেওয়া লাগে। আমরা যে কৃষ্টি-অনুগামী চলনে চলবার জন্য ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকারে প্রস্তুত, সেটা

বোঝা যায় যখন আমরা এইসব কষ্টকে দ্বিজত্বলাভের পূর্ব্বে হাসিমুখে বরণ ক'রে নিই।

কাসুন (কাসুন্দি) কোটা সম্বন্ধে কথা উঠল।

প্রফুল্ল বলল—আমাদের গ্রামঘরে কাসুন কোটাটা নানা অনুষ্ঠান-সহকারে সম্পন্ন হ'তে দেখেছি। গ্রাম্য জীবনে সবসময় যেন উৎসব লেগেই থাকত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের সমাজটা এমনভাবে বিন্যস্ত ছিল যে স্বতঃই উৎসরণশীল হ'য়ে থাকত। বেকুবরা বোঝে না-সোঝে না, আজকাল সব নষ্ট ক'রে দিচ্ছে।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

ঈশ্বরকে দ্বয়ী ভাবতে যেয়ো না,
দ্বয়ী প্রবৃত্তি আগ্রহকে দ্বিধাসঙ্কুল ক'রে
বহুধা-বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে,
নিশ্চয়াত্মিকা যা' তাকেও
সন্দেহসঙ্কুল ক'রে তোলে,
কোন-কিছুকে একত্র সার্থক হতে দেয় না,
একাগ্রকেন্দ্রিকতাকে বিশ্লিষ্ট ও বিপর্য্যস্ত ক'রে
সমন্বয়ী সার্থকতাকে অবদলিত ক'রে তোলে—
বিশ্বের প্রতিবৈশিষ্ট্যে রূপায়িত
বিভিন্ন সংস্থিতির অন্তর্নিহিত
একতন্ত্রী অব্যয়ী প্রজ্ঞায়
উপনীত হ'তে দেয় না।

এই লেখাটি দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—একৈক ইষ্টনিষ্ঠাই ঈশ্বরলাভের পথ। যারা বহুনৈষ্ঠিক, কিংবা নিষ্ঠা যাদের দ্বিধা বা বহুধাবিভক্ত, তাদের জীবন অসঙ্গতিবহুল হ'তে বাধ্য। তারা কেমন যেন পাগলাটে ধরনের হ'য়ে ওঠে। তার চাইতে একজন মাতৃভক্ত সন্তান বা সতীনারীর মধ্যে অনেক বেশি সঙ্গতি দেখা যায়। শান্তি, সন্তোষ ও সার্থকতা তাদের সাথিয়া হ'য়ে থাকে। তারা কখনও অহমিকার তাড়নায় মানুষকে বিব্রত, বিপর্য্যস্ত ও ভীতিগ্রস্ত ক'রে তোলে না। বরং হতাশপ্রাণ মানুষ তাদের কাছে গিয়ে শান্তি, সান্ত্বনা ও উদ্দীপনা লাভ করে। মানুষ উপায় করতে দক্ষ হয় ব'লে, তারা দৈন্যপীড়িত হয় কমই। ফল কথা, একনিষ্ঠ শ্রেয়-অনুরাগে মানুষ সপরিবেশ জীবনটা উপভোগ করতে পারে।

১৮ই চৈত্র, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ১। ৪। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

ইতিমধ্যে কোলকাতা থেকে মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী)-র সঙ্গে কয়েকজন এসেছেন। মন্মথদা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাইদের খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো ?

মন্মথদা—সুশীলদা ও রানীমা যা' করেন তা' ব'লে শেষ করা যায় না।

নবাগত দাদারা—সত্যিই খুব ভাল লাগছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নখে একটু লাগতেই তিনি প্যারীদাকে ডাকতে বললেন। প্যারীদা তাড়াতাড়ি এসে নখটা ভাল ক'রে কেটে সমান ক'রে দিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হিন্দুদের যতই দুরবস্থা হোক না কেন, আমার মনে হয় এদের back bone (মেরুদণ্ড) এখনও নষ্ট হয়নি। ভাল-ভাল ঘরে বিয়ে-থাওয়া ও চালচলন মোটামুটি ঠিক আছে। যদিও কালের প্রভাবে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে থাকতে পারে। কৃষ্টিগত ভাবধারা ক্রমাগত পরিবেশন ক'রে এদের প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা লাগে। ধর্ম্ম মানে কৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের অনুসরণ, যা' কিনা আমাদের সত্তাকে ধ'রে রাখে। আচরণ বাদ দিয়ে ধর্ম্ম হয় না। ইষ্ট হলেন ধর্ম্মমূর্ত্তি। তাঁর উপর প্রচণ্ড নেশা চাই, নিষ্ঠা চাই। ও ব্যাপারে কিছুটা গোঁড়ামি থাকা ভাল। গোঁড়ামিটাই আমাদের ধ'রে রাখে। এটা যেন আমাদের গায়ের চামড়া। চামড়া না থাকলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি খসে পড়ত। আত্মরক্ষার জন্য কিছুটা গোঁড়ামি লাগেই। আত্মিক দিক দিয়ে উদার হওয়ায় ক্ষতি নেই। কিন্তু কাঠামো শিথিল হ'লে মুশকিল। আমরা নিষ্ঠার বাঁধন ভেঙে দিয়ে যেদিকে যতখানি ঝুঁকব, তা' আমাদের ততখানি ক্ষতির কারণ হবে। গ্রহগুলি যেমন সূর্য্যের টানে বিধৃত হ'য়ে স্ব-স্ব কক্ষপথে থেকে ঘোরে আমাদের জীবনও তেমনি সুস্থিত থেকে প্রগতিপন্ন হ'য়ে চলতে পারে যদি কিনা তা ইষ্টে বিধৃত থাকে।

সুশীলদা (বসু)—আমরা বহিরাগতদের আত্মীকৃত করতে পারছি না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সর্ব্বনাশা ব্যাপার হয়েছে, কলিতে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ব'লে রঘুনন্দন যে পাতি দিয়েছেন তাই। এখনও হিন্দুসমাজের মধ্যে কুতুব খাঁ পটী, পীরালি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কথার প্রচলন আছে। রাজপুতদের মধ্যে অনুলোমের প্রচলন দেখা যায়। রঘুনন্দন কিসের উপর দাঁড়িয়ে বিধান দিয়েছেন জানি না, কিন্তু মনুসংহিতায় এর কোন সমর্থন দেখা যায় না। তাই আমার মনে হয়, রঘুনন্দন হয়তো তৎকালীন রাজশক্তির দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে ভয়ে এই বিধান দিতে বাধ্য

হয়েছিলেন। একটা কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, সংহতি ছাড়া কিছুই হবার নয়। ছোট-ছোট দলে টুকরো-টুকরো হ'য়ে থাকলে আমরা কিছুই করতে পারব না।

মম্মথদা—আমাদের নিরোধ করতে হবে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃষ্টির অন্তরায় যা', মানব-কল্যাণের অন্তরায় যা', ঐক্য ও সংহতির অন্তরায় যা', তাই আমাদের নিরোধ করতে হবে। সে হিন্দু, মুসলমান যে-কেউই হোক না কেন। ব্যাধির বিরুদ্ধে আমাদের ঝগড়া, অসৎ কর্ম্মে লিপ্ত যারা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ। মুসলমানদের মধ্যে খাঁটি যারা, তাদের আমি আপন-জন ব'লেই মনে করি। আবার, হিন্দু হ'য়েও যদি কেউ সত্তাবিরোধী চলনে চলে, সে যে নিজের ও সমাজের শত্রু, এ-কথা বলতে আমি বাধ্য। মানুষকে আমাদের ঐক্যবন্ধ করতে হবে বাঁচাবাড়ার ভিত্তিভুমির উপর দাঁড়িয়ে। যে যে-সম্প্রদায়ভুক্তই হোক না কেন, বাঁচাবাড়ার পথে চলে যারা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ যারা, যারা অন্যের বাঁচা-বাড়ার পথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না, তারাই আমাদের বান্ধব। ফলকথা, যারা ঈশ্বরের পথে চলে, তারা আমাদের আত্মীয়। আর, যারা শয়তানের পথে চলে, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেইকো। সারা দুনিয়ার সৎ শক্তিকে সঙ্ঘবন্ধ করাই আমাদের কাজ।

আমাদের করণীয় সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সবটার ভিতর common factor (উপাদান-সামান্য) কী তা' আমাদের বের করতে হবে। আর, সেটা হল বাঁচা-বাড়া, ধর্ম্ম, কৃষ্টি। সেই জাল গুটাতে গেলে আমরা সবকিছুই হাতে পাব। মুসলমান-বিদ্বেষ থাকলে কাজ হবে না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মাথাতোলা দিলে আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব। বাঁচাবাড়ার জন্য চাই সপরিবেশ integrated (সংহত) হওয়া। আর, এই পরিবেশের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যেই থাকুক না কেন, সবার সঙ্গে আমার সম্প্রীতির সম্পর্ক থাকা চাই। শুধু মানুষ কেন, গরু, কুকুর, ছাগল, ভেড়া, পোকামাকড়, ধান, পান, এককথায় বিশ্ব-পরিবেশকে সুস্থ-স্বস্থ না রাখতে পারলে আমরা বাঁচাবাড়ার পথে এগিয়ে যেতে পারব না। এই সবকিছু নিয়ে একটা benign integrated adjustment (কল্যাণকর সুসংহত বিন্যাস)-এর সৃষ্টি ক'রে তোলাটাই ধর্ম্ম। আবার, আমরা যদি অসতের বিরুদ্ধে না দাঁড়াই তাহ'লে অসৎ কিন্তু আমাদের খেয়ে ফেলবে। তাই, অসৎবিরোধী পরাক্রম ও প্রচেষ্টা সম্বন্ধে উদাসীন হ'লে চলবে না।

সুশীলদা রসুলের সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রেরিতদের মধ্যে বিভেদ নেই। ঈশ্বরও বহু নয়, ধর্ম্মও বহু নয়। সত্তাসম্বর্ধনা ও মানবধর্ম্মের বিরোধী কোন কথা কোন অবতার মহাপুরুষ বলেননি। ঐ-সব কথা যারা বলে তারা জীবনের পূজারী নয়, মৃত্যুর পূজারী। এককথায়, শয়তানের সাকরেদ তারা।

জনৈক দাদা—সংহতি হবে কি দিয়ে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম, আদর্শ ও কৃষ্টিকে কেন্দ্র ক'রেই integrated (সংহত) হ'তে হবে। ধর্ম্ম, আদর্শ ও কৃষ্টি স্বভাবতই সবার স্বার্থে স্বার্থান্বিত। তাই তার উপর দাঁড়ালে কারও সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। আর, infinite progress (অনন্ত অভ্যুদয়)-এর পথও এতে খোলা। Grace সাহেব সৎসঙ্গের বিষয় শুনে বলেছিলেন—এই জিনিসটা যদি সবদেশে চারিয়ে যায়, স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক দেশই স্বাধীনতা ও উন্নতির পথে চলবে। মানুষের বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতি একযোগে হবে। আর, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিসঙ্গতিও সহজে এসে যাবে। কারণ, সৎসঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে conversion-এর (ধর্ম্মান্তরিত করণের) কোন পরিকল্পনা নেই।

উক্ত দাদা—পাশবিক বৃত্তিকে মানুষ ঘৃণা করে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন প্রবৃত্তি যদি আমাদের সত্তাসম্বর্দ্ধনার অন্তরায় হয় তখনই তা' দূষণীয়। কিন্তু ষড়রিপুর প্রত্যেকটারই প্রয়োজন আছে। চাই সেগুলির কল্যাণকর ব্যবহার। আমরা যদি প্রবৃত্তিগুলিকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করি তাহ'লে subman-এ (অপমানবে) পরিণত হব। আবার, যদি প্রবৃত্তির দাস হই, তাহ'লে পশু হয়ে দাঁড়াব। চাই সবকিছুর ইষ্টানুগ ও ধর্ম্মসম্মত বিনিয়োগ। তাকেই বলে সংযম।

উক্ত দাদা—বাঁচাবাড়ার চরম কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা বাঁচাটাকে উন্নীত করতে চাই বিবর্ধনে এবং সপরিবেশ বাঁচাবাড়ার পথে চ'লে ইষ্ট বা ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠতে চাই। এইটেকে অন্য কথায় বলা যায় ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরলাভ হ'ল বাঁচাবাড়ার সার কথা। ঈশ্বর হলেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। সৎ মানে অস্তিত্ব, চিৎ মানে চেতনা, আনন্দ মানে বৃদ্ধি। আমরা মূলতঃ সচ্চিদানন্দ। তাই, পরিবেশকে নিয়ে সর্ব্বতোভাবে সচ্চিদানন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে চলাই বাঁচাবাড়ার লক্ষ্য।

উক্ত দাদা—কেউ যদি শোষণ ক'রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয় এবং আমি যদি তা' চুরি ক'রে নিই তাহ'লে তাতে কি কোন দোষ হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি মনে করছ প্রয়োজনের অতিরিক্ত, কিন্তু যার ঐশ্বর্য্য সে তা' মনে করে কিনা—তা' বুঝতে হবে তো। কারও স্বস্তি ও আনন্দের ব্যাঘাত ক'রে নেওয়া কি অন্যায় নয়? তোমার চুরি সমর্থন করা যায় যদি তা' এমন মঙ্গল বহন ক'রে আনতে পারে যা' সবার পক্ষে উপভোগ্য। হনুমান রাবণের মৃত্যুবাণ চুরি করেছিল, শিবাজী সুরাট লুণ্ঠন করেছিল। এর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল জীবনবল্লভের লোক-কল্যাণকর ইচ্ছার রূপায়ণ। তাই এইসব কাজ পাপ ব'লে গণ্য হয় না। স্বার্থ অভিভূত হ'য়ে এমন কিছু করলে, তা' অবশ্যই অন্যায়।

শরৎদা—আমি যদি চাই-ই তবে সেবা দিয়ে মানুষকে খুশী করেও তো নিতে পারি।

উক্ত দাদা—ওটা তো দাস-মনোবৃত্তি। অপরের কাছে হাত পাততে যাব কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার এতখানি inferiority (হীনম্মন্যতা) যে আমার কাছে হাত পাততে পার না। আমাকে না হয় একটু আনন্দই দিলে, আমাকে খুশি ক'রে নিতে তোমার আপত্তি কিসের? আমার মত লাখ আমি পরিবেষ্টিত হ'য়ে তাদের উপর দাঁড়িয়ে আছ তুমি, অথচ এদের কারও কাছে হাত পাততে পারবে না তুমি—তা' কেন? আমি বলি, আমরা যদি ইষ্ট ও কৃষ্টিশাসিত সমাজব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারি, নিজের মতো ক'রে পরের স্বার্থসাধনে যত্নবান হই, তাহ'লে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা, সেবা ও আদানপ্রদানের ভিতর-দিয়ে এমন শক্তির অধিকারী হ'তে পারি, যে শাসন-সংস্থার সাহায্য বাদ দিয়েও যে-কোন বড় কাজ করা আমাদের পক্ষে সহজেই সম্ভব হ'তে পারে। তুমি আছ, তাই আমার বুক ভরা। তুমি আমার সম্পদ, আমি তোমার সম্পদ—পরস্পর এটা ভাবতে পারব না কেন? তোমার কাছে আমার চাইতে লজ্জা কি? আবার, আমার কাছেও বা তোমার চাইতে লজ্জা কি? আমি চাই যে মানুষ টাকার উপর নির্ভরশীল না হ'য়ে মানুষের উপর নির্ভরশীল হোক। মানুষ মানুষের প্রধান সম্পদে পরিণত হোক এবং মানবিক সম্পর্ক সক্রিয় প্রীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। সমাজ স্বর্গ হয়ে ফুটে উঠুক।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী) শ্রীশ্রীঠাকুরের পা টিপে দিচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—আমি পা-টা মেলে দিয়েছি। ওকে কিন্তু বলিনি আমার পা টিপে দেও। নিজের মতো ক'রে বুঝে দিচ্ছে। এতে কত সুখ। একজন চাকর রেখে যদি তাকে ব'লে এই করাতাম, তাহ'লে তার মধ্যে এই সুখ মিলত? আমি তোমাকে ভালবাসি, নিজের জন্যে তোমার দায়ে ভাবি, করি; তুমি আমাকে ভালবাস, আমার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে ভাব, বল, কর—পরস্পরের এই প্রীতি ও সেবা কি জীবনকে আনন্দপ্রতুল ক'রে তোলে না? এমন হ'লে নিজের

জন্য ভাবাই লাগে না। নিজের কথা ভাবতে গেলেই মানুষ কিন্তু দুর্ব্বল ও অসুখী হ'য়ে পড়ে। ভগবান আমাদের দুনিয়ায় এনেছেন যাতে আমরা তাঁকে এবং তাঁর দুনিয়ার সব কিছুকে প্রাণ ভ'রে ভালবেসে ও সেবা ক'রে ধন্য হই।

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

এই পারস্পরিকতা যদি সমাজে আসে তাহ'লে Communism (সাম্যবাদ)-এর বাবা হ'য়ে যায়। অথচ তার মধ্যে কোন জবরদস্তি থাকে না। প্রত্যেকেই স্বাধীন, প্রত্যেকেই উন্মুক্ত।

উক্ত দাদা—আপনি বলছেন, স্বাধীনতার কথা, ধর্ম্মে তো পদে-পদে বিধি-নিষেধ ও বাধা। ধর্ম্ম করা মানেই পরাধীন হওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মপথে বাধা হ'ল মরণের পথে যাবার। বাঁচাবাড়ার দিকে এগিয়ে যাবার তো কোনও বাধা নেই। সেইটাকে জোরদার করবার জন্যই যা'-কিছু। ভেবে দেখ তো এটা তোমার স্বার্থবিরোধী কিছু কিনা। কেউ যদি আত্মহত্যার চেষ্টা ক'রে অকৃতকার্য্য হ'য়ে ধরা পড়ে, তাহ'লে তার আইনতঃ শাস্তি প্রাপ্য হয়। এটাকে তুমি কি অসঙ্গত ব'লে মনে কর? তাই ভেবে দেখলেই সব বোঝা যায়।

উক্ত দাদা—ভগবান রাবণ ও দুর্য্যোধনকে আরও বাঁচতে দিলেন না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি কতখানি এদের সহ্য করেছেন, তার সীমা সংখ্যা নেইকো। প্রত্যেকেরই বাঁচার অধিকার আছে, কিন্তু অপরকে ও ধর্ম্মকৃষ্টিকে বিপর্য্যস্ত করার অধিকার কারও নেই। অধর্ম্মের অভ্যুত্থান এবং ধর্ম্মের গ্লানি হলে জীবের প্রতি করুণাবশে ভগবান আবির্ভূত হন এবং লোকমঙ্গলের জন্য যা' করার তা' করেন। রাবণ, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্য্যোধন ইত্যাদি তাদের নিজেদের অপকর্ম্মের দরুন বিধিবশেই নিহত হয়েছে। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥

(আমার দ্বারা ইহারা পূর্বেই নিহত হইয়াছে। হে সব্যসাচী তুমি নিমিত্তমাত্র হও।)

উক্ত দাদা—শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব-কিছুই তাঁর মধ্যে নিহিত এবং তিনিই সব। কাউকে এভাবে ভাবতে আমার ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা Universal I (বিশ্ব আমি)। অবশ্য individual I (ব্যষ্টি আমি) বাদ দিয়ে Universal I (বিশ্ব আমি) নয়। যিনি Universal

-এর (বিশ্ব আমির) প্রতীক তিনিও একজন ব্যক্তি। তিনি তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি উপর-থেকে-আসা মানুষ। তাঁকে ভালবেসে আমরাও আমাদের সচ্চিদানন্দময় স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারি। আমরা যদি বিবর্ত্তনের পথে এগুতে চাই, তাহ'লে সুবিবর্ত্তিত একটি জীবন্ত কেন্দ্রে অনুরাগনিবন্ধ হওয়া চাই। অন্য সব কথা বাদ দিয়ে এইজন্যও পুরুষোত্তমের প্রয়োজন। এটা আমরা জীবন থেকে বাদ দিতে পারি না। কারণ, আমাদের বিকাশের জন্য এটা অপরিহার্য্য প্রয়োজন। আমরা চুরি করি, লোক মারি, ডাকাতি করি আর যাই কিছু করি—তা' করি বাঁচাবাড়ার জন্য। যদিও প্রবৃত্তির বশে আমরা অনেক সময় ভুলটাকে ঠিক মনে করি এবং ঠিকটাকে ভুল মনে করি।

উক্ত দাদা—আপনি যে-সব নীতির কথা বলছেন, সে-সব আগে চলত, এ-যুগে চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচতে গেলে বাঁচার বিধি মানতে হয়। এমনও মানুষ আছে, খায়-দায়, চলে, বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়, ভালবাসা পেলে খুশি হয়, কেউ যদি তাকে হিংসা করে বা ঘৃণা করে, তা' তার ভাল লাগে না। সব যুগের মানুষেরই চাহিদা কিন্তু মূলত এক। যদিও তার রকমফের আছে, স্থান-কাল-পাত্র-অনুযায়ী। আগের যুগে মানুষের রক্ত লাল ছিল, এখনও কি তা' নেই ?

উক্ত দাদা—তা' আছে, কিন্তু আর কোন মিল নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনও যে রক্ত লাল আছে এইটেই আশার কথা। বিজ্ঞানকে, চিরন্তন বিধিকে বাদ দিয়ে সত্য বা সত্তা নেইকো। এইটাই মূল কথা। হনুমান রামচন্দ্রের কাছে এসেছিল ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা পরিপূরণের জন্য। পরে সে রামচন্দ্রকেই ভালবেসে ফেলল। নিজস্ব কামনা-বাসনা তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। সেই হনুমান রামচন্দ্রকে ভালবেসে কী কাণ্ডটাই না করল।

প্রত্যেকটা মানুষের একটা বেষ্টনী থাকে। একজন নিজে যত বড় হোক না কেন তার বেষ্টনী যদি শক্ত না হয়, তাহ'লে সে কিছু ক'রে উঠতে পারে না। মহাত্মাজীর বেষ্টনী শক্ত ছিল না। তাহ'লে স্বাধীন ভারতে তাঁর ঐভাবে জীবন যেত না। যীশুখৃষ্টের বেষ্টনী ছিল অত্যন্ত নড়বড়ে। জুডাস তো তিরিশ টাকার জন্য তাঁকে ধরিয়ে দিল। আর অন্য সবাই প্রাণের ভয়ে তখনকার মতো পালিয়ে গেল। রসুলের বেষ্টনী শক্ত ছিল ব'লে তাঁর Mission (উদ্দেশ্য) successful (কৃতকার্য্য) হ'তে পেরেছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক সময় কথাবার্ত্তা বলার পর এখন তামাক খাচ্ছেন এবং অল্পস্বল্প ঘরোয়া কথা বলছেন।

তিনি একটা কুকুরকে দেখিয়ে বললেন—এ কুকুরটা আমাকে খুব ভালবাসে। এদিকে-ওদিকে ঘুরেফিরে আমার কাছে চ'লে আসে।

একটু পরে হাসতে হাসতে বললেন—আমার কেমন রকম ঠিক থাকে না। প্রথমে আপনি বলে শুরু করেছি। কোন্ সময় যে তুমি বলতে লেগেছি তার খেয়াল নেই।

এরপর সবাই তখকার মত উঠলেন।

বিকালে উক্ত দাদারা যতি-আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে বসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তিনটি জিনিস আমাদের বিশেষভাবে করণীয়। প্রথম হ'ল যজন অর্থাৎ নাম-ধ্যান, পূজাপাঠ, আত্মবিচার-আত্মবিশ্লেষণ ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে নিজের মনোজগৎকে ইষ্টের ছন্দানুবর্ত্তী ক'রে তোলা। দ্বিতীয়টি হ'ল যাজন। অর্থাৎ পরিবেশকে ইষ্টের ভাবে ভাবিত ক'রে তাঁতে যুক্ত ক'রে তোলা। পরিবেশকে বাদ দিয়ে আমরা কেউ একলা বাঁচতে পারি না। তাই, পরিবেশকে গ'ড়ে তোলার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চাই-ই। যাজন তাই আমাদের নিত্য করণীয়। আমাদের প্রত্যেককেই Fisher of man (মানুষ ধরার জেলে) হওয়া লাগবে। আর, চাই ইষ্টের ভরণ ও পোষণ। এর ভিতর-দিয়ে তাঁর উপর টান গজায় এবং সেই টান আমাদের জীবনের নিয়ামক হ'য়ে ওঠে। এর কোনটা বাদ দিলে চলবে না।

জনৈক দাদা রামকৃষ্ণদেবের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণদেবকে যদি আমরা আমাদের জীবনে জীবন্ত ক'রে তুলতে না পারি তাহ'লে শুধু মৌখিক শ্রদ্ধা দেখানর ভিতর-দিয়ে আমরা কিন্তু বিশেষ লাভবান হব না। রামকৃষ্ণদেবকে অনুসরণ করতে গেলেও তাঁর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি ক'রে চলা লাগবে।

উক্ত দাদা—দীক্ষার কী প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু করতে গেলে কিছু অনুষ্ঠান দরকার হয়। যেমন, লিখতে গেলে খাতা চাই, কালি চাই, কলম চাই, এ-সবের ব্যবস্থা না ক'রে লিখতে পারি না। এও সে-রকম। অনুষ্ঠান ignore (উপেক্ষা) করা ঠিক না, আবার অনুষ্ঠানের বাহুল্যও ভাল না। যেমন বলে "অকর্ম্মা নাপিতের ধামাভরা ক্ষুর।" অনুষ্ঠানের বাহুল্য মানে উদ্দেশ্য ভুল হ'য়ে গেল, প্রাণহীন আচার পেয়ে বসল। যেমন, কোন-কোন মেয়েছেলে আছে, যারা স্বামীর সেবাযত্ন ক'রে না অথচ সাবিত্রীব্রত করে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সমাজ যাতে দুর্ব্বল হয় এমন কিছু করা ঠিক নয়। একবার বনগাঁয় কোন সম্প্রদায়ের লোক ছ'শ হিন্দু-মেয়ে নিয়ে চলে গেল। সেইসব মেয়েদের মধ্যে অনেকেই ঘরে ফিরে আসতে উন্মুখ হল। বামুনপণ্ডিতরা

বিধান দিলেন যে, তাদের ঘরে নেওয়া চলে না। তাদের মধ্যে কয়েকজন সৎসঙ্গী ছিল, তারা আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—কী করব? আমি তাদের বললাম মেয়েদের ঘরে স্থান দিতে। তারা তাই করল। তাদের দেখাদেখি অন্যেরাও তাদের ঘরে ফিরিয়ে নিল। অন্য সম্প্রদায় যখন দেখল যে এইভাবে তো হিন্দু মেয়েদের জাত নেওয়া যায় না, তখন তারা ধীরে-ধীরে নিবৃত্ত হ'ল।

দরিদ্রনারায়ণ-সেবা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তখন আমার অশোকের (বড় নাতি) মতো বয়স। সেইসময় থেকেই আমি ভাবতাম দরিদ্রনারায়ণ কেন বলব? নারায়ণ, যিনি আমার প্রিয়-পরম, তাঁকে আমি দরিদ্র থাকতে দেব কেন? প্রত্যেকে যাতে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হ'য়ে ওঠে, তাই তো আমার করণীয়। সে সেবা প্রকৃত সেবা নয় যাতে মানুষের দারিদ্র্য না ঘোচে। প্রত্যেকে যাতে আত্মাশক্তির সন্ধান পেয়ে জীবনে জয়যুক্ত হ'য়ে ওঠে তা' করাই সেবার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আমার খুব ইচ্ছা ক'রে যে মানুষ নিজের কর্ম্মশক্তি জাগিয়ে মা-বাবাকে, গুরুজনকে ও গুরুকে দেয়। এইজন্য আমি মাতৃভৃতি, পিতৃভৃতি, ইষ্টভৃতি করার কথা বলি। সেবার মেদিনীপুরে বন্যা হল। আমাদের কর্ম্মীরা সেখানে গিয়ে সাময়িক সাহায্য দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অনেককে দীক্ষা দিয়ে যজন-যাজন-ইষ্টভৃতিপরায়ণ ক'রে তুলল। কিছুদিন পরে দেখা গেল, তাদের আর সাহায্য করা প্রয়োজন হয় না, বরং তারাই অন্যকে সাহায্য করে। মানুষকে যোগ্য ক'রে তুলতে পারলে সাধারণ মানুষকে দিয়ে যে কত কাজ হ'তে পারে তার ইয়ত্তা নেইকো। মানুষের ভিতরে ঢোকা লাগে তার ভালবাসার দুয়োর দিয়ে। ভালবাসা সক্রিয় হওয়া চাই। প্রিয়কে দেওয়া চাই, তার জন্য করা চাই। এইরকম করতে করতে মানুষের ভিতরের শক্তি উথলে ওঠে।

উক্ত দাদা—আপনি বর্ণাশ্রমের কথা বলেন, কিন্তু ও-সব সেকেলে জিনিস কি এখন চলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ণ জিনিসটা উপর থেকে চাপান কোন জিনিস নয়। এটা প্রত্যেকের জৈবী-সংস্থিতির উপর নির্ভর করে। তাই এটা নিত্য বিদ্যমান। গাছের মধ্যে, কুকুরের মধ্যে, মানুষের মধ্যে, গরুর মধ্যে সর্ব্বত্রই এটা আছে। বৈশিষ্ট্য নেই এমন কিছুই নেই। আমের মধ্যেই কত রকমারি আছে। ন্যাংড়া, ফজ্‌লি, হিমসাগর, গোলাপ খাস, তোতাপুরী,—কত কী! তাই প্রত্যেকের nurture (পোষণ) দিতে হয় তার মতো ক'রে। যার যা' প্রয়োজন তাকে যদি তা' যোগান দেওয়া না যায় তাহ'লে কিন্তু সে বাড়তে পারে না। কুমোরের ছেলেকে শিক্ষা

দিতে গেলে তাকে তার স্বকর্ম্ম থেকে চ্যুত করা ভাল না। তাকে শিক্ষা দিতে হবে এমনভাবে যাতে তার সহজাত সংস্কার বিকশিত ও সার্থক হয়ে ওঠে।

উক্ত দাদা—এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীকে যে ঘৃণা করে, এটা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা বর্ণাশ্রমের ব্যাপার নয়। এটা বর্ণাশ্রমের বিকৃতি। কালক্রমে মন্দ যা' ঢুকেছে তা' দূর করা লাগবে এবং ভাল যা' ছেড়েছি তা' যুগের উপযোগী ক'রে নতুনভাবে প্রবর্ত্তন করা লাগবে। চাই re-adjustment for betterment (উন্নতির জন্য পুনর্বিন্যাস)।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সাড়াপ্রবণতা এবং সুধী কর্ম্মতৎপরতা যার ভিতর যত বেশী সে তত বড়। এই সাড়াপ্রবণতা বাড়াবার জন্য চাই দীক্ষা ও তার অনুশীলন। তোমাদের মধ্যে এমন সন্ধিৎসাসুন্দর, খরমধুর দৃষ্টি ও সেবা-প্রাণতা জাগা চাই যাতে মানুষ তোমাদের শ্রদ্ধা ক'রে নিজেকে ধন্য মনে ক'রে। বেড়ে চলাই আমাদের লক্ষ্য। আর এই বাড়ার তপের জন্যই চাই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচারের অনুশীলন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে তামাক খেতে-খেতে বললেন—কথা তো অনেক হ'ল। এখন আমাকে চল্লিশ জন মানুষ জোগাড় ক'রে দাও। কত মানুষের জীবন তো এমনিই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। আমাকে খুশী করার জন্য, আমার ইচ্ছা পূরণের জন্য চল্লিশ জন মানুষ না হয় তাদের জীবন নষ্ট ক'রেই দিল। তারা লোক-মঙ্গলের ব্রত নিয়ে আসুক। তারা কিছু চাইবে না, কিছু পাবে না, তাদের দেব দুঃখ, দেব কষ্ট। তবু তারা আমার মুখ চেয়ে আমি যা' বলি তা' করবে।

১৯শে চৈত্র, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ২।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে দক্ষিণাস্য হয়ে শুভ্র শয্যায় বসেছেন। পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

দূরে একটা পাখি ডাকছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—এটা কোন পাখি?

কেউই ঠিকমত বলতে পারলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে বললেন—স্থানীয় লোকের কাছে শুনে জেনে নেবেন। আপনাদের অনুসন্ধিৎসা কম। তাই মাথা খোলে না। ঈশ্বর-সন্ধিৎসা আছে, অথচ বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা নেই, এটা ঠিক নয়। ঈশ্বরই যা-কিছু

হয়েছেন। তাই জগৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান থাকলে ঈশ্বরবোধও পরিপুষ্ট হয়। সবকিছু একেরই রকমারি প্রকাশ।

শরৎদা—নানাদিকে মন দিতে গেলে মন তো বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব-কিছু যখন একের জন্য হয়, তখন নানা আর নানা থাকে না। যা-কিছুই একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে ওঠে। যার মন যত ক্রিয়াশীল সে তত সচেতন। চিরচেতনকে পেতে গেলে চেতনার সুকেন্দ্রিক-বিস্তার ও গভীরতা একান্তই প্রয়োজন। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে সজাগ ক'রে তুলতে হবে। সাধারণ ইন্দ্রিয়গুলির সুষ্ঠু অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে ধীরে-ধীরে অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভ হতে পারে।

উমাদা (চরণ) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আর ছেড়ো না।

উমাদা উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমতো পুনরায় তা' গ্রহণ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সম্বন্ধে বলছিলেন।

উমাদা—মহাত্মাজীর একটি প্রবন্ধ প'ড়ে উপবীত ছেড়েছিলাম। তিনি তাতে লিখেছিলেন—Mental purity (মানসিক পবিত্রতা) থাকলেই হল। বাইরের অনুষ্ঠানের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Mental purity (মানসিক পবিত্রতা) মানে psychophysical purity (মানস-শরীর পবিত্রতা) Physical। (দেহগত) অনুষ্ঠান যদি না কর, mentally pure (মানসিকভাবে পবিত্র) থাকতে পার না। ঐ অনুষ্ঠানই তোমার মানসিক পবিত্রতা সাধনের সহায়ক হয়। প্রত্যেক যা'-কিছুরই একটা বিহিত অবলম্বন থাকে। এই মাধ্যমটা যদি উড়িয়ে দাও তবে তাকে আশ্রয় ক'রে যা' দাঁড়ায় তাও টেকে না। অনুষ্ঠান মানে অনুস্থান। চোখটা হল অনুস্থান, এটা হল সেই adjustment (বিন্যাস) যার ভিতর-দিয়ে দেখার শক্তিটা ক্রিয়াশীল হয়। ছোট দুটো চোখ যদি না থাকে, তবে এতবড় জগৎটা আমাদের কাছে অদৃষ্ট ও অস্পৃশ্য থেকে যায়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আদত কথা হল ভালবাসা। ভালবাসার ভিতর একটা magnetism (চুম্বকত্ব) আছে। তুমি যদি ইষ্টকে ভালবাস এবং ইষ্টপ্রীত্যর্থে বিশ্বসংসারের সব-কিছুকে ভালবাস এবং সবার ভাল করতে চেষ্টা কর, তবে তোমার ভিতর এমন একটা আকর্ষণী শক্তি জেগে উঠবে যে অপরেও তোমাকে ভাল না বেসে পারবে না। একসময় কত পাখি আমার গায়ে এসে বসত। তবে একটা কথা, ভগবান তোমাকে কতখানি ভালবাসেন, তা' খতিয়ে দেখতে যেও না। তাতে তোমার কোন লাভ নেই। প্রত্যাশাশূন্য হ'য়ে তুমি তাঁকে যত ভালবাসবে ততই তোমার

মধ্যে ভালবাসার উৎকর্ষ হবে। তা' ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে। প্রেষ্ঠের প্রতি সত্যিকার টান থাকলে তিনি যদি একজনকে অনাদরও করেন, তখন সে তা'র কারণ খুঁজে-পেতে বের ক'রে নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে চেষ্টা করে। নচেৎ হয়তো অভিমানের দরুন নিজের দোষটা দেখতে পায় না, এবং আত্মসংশোধনও হয় না। ইষ্টকে ভালবাসা মানে নিজের সম্বন্ধে নিষ্প্রশ্ন হ'য়ে ইষ্টের প্রীতিস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্যে নিজেকে উজাড় করে দেওয়া।

২০শে চৈত্র, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ৩।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে একটি বাণী দিলেন।

তারপর শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরিদাসদা (সিংহ), প্রফুল্ল প্রমুখকে ভজন সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। কিভাবে ভজন করলে দ্রুত শব্দজ্যোতির উপলব্ধি হয় সে-সম্বন্ধে কতকগুলি সঙ্কেত দিলেন।

শরৎদা—অনেক সময় তো অগ্রগতি বোঝাই যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবু লেগে থাকতে হয়, যাতে পিছিয়ে পড়তে না হয়। সাধন-জগতে ক্রমাগতি খুব একটা বড় কথা। যেনতেনপ্রকারেণ মনটা ইষ্টে লাগিয়ে রাখতে হয়। আমরা যা'ই করি, তা' যেন তাঁর জন্যেই করি। তিনিই গন্তব্য, সে কথা সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগ্রত থাকা চাই। নাম এমন ক'রে অভ্যাস করা লাগে যাতে তিলেকের তরেও আমাদের না ছাড়ে। নামে যদি রুচি হয়, নেশা জাগে, তাহ'লেই কাম ফরসা। উর্দ্ধটান যখন সত্তাটাকে টানে তখন প্রবৃত্তির টান আমাদের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কারণ, সাত্বত টানে চলতে থাকলে তাতে অনেক বেশী সুখ পাওয়া যায়। মানুষ প্রবৃত্তির দিকে ঝোঁকে সুখের লালসায়। কিন্তু যখন সাত্বত আনন্দ পায়, তখন প্রবৃত্তি-সুখ নিতান্তই বিস্বাদ লাগে।

জনৈক দাদা বললেন—আমি যাজন করতে চেষ্টা করি, কিন্তু মানুষ সে কথায় কান দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার উপর শ্রদ্ধা যত বাড়বে, মানুষ ততই তোমার কথায় কান দেবে এবং সে-কথা বুঝতে চেষ্টা করবে। শ্রদ্ধা বাড়ে আবার চরিত্র দেখে। শ্রদ্ধার্হ চরিত্র হওয়া চাই। তোমার ঠাকুর যে তোমার অন্তরে আছেন সেটা এতখানি ফুটন্ত হওয়া চাই যাতে মানুষের অন্তরে তা' তেমনতর সাড়া জাগায়। তোমার জীবনে যদি তোমার ইষ্ট জীবন্ত হ'য়ে ওঠেন তাহ'লে তুমি কথা না বললেও তোমার হাবভাব, চাউনি-চলন দেখে মানুষ তা' অনুভব করবেই কি করবে। এই ইষ্টানুরঞ্জিত ব্যক্তিত্বই যাজনের প্রথম ও প্রধান উপাদান।

প্রফুল্ল—আপনার যেমন তীব্র সহানুভূতি তাতে কারও বাড়ীতে চুরি হ'লে গৃহস্থের জন্য আপনার যেমন লাগবে, আবার চোরকে যদি কঠোর শাস্তি দেয়, ঐ চোরের জন্যও তো আপনার তেমন লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি চাই ঐ চোরকে ভালবেসে তার চৌর্য্য-প্রবৃত্তিটাকে চুরি ক'রে নিতে। আমার ভালবাসায় কিছু হবে না, যদি সে আমাকে ভাল না বাসে।

প্রফুল্ল—আপনি চান মানুষের যোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে। কিন্তু যোগ্যতা-সঙ্কোচনী অনুকম্পা আপনি তো হামেশাই প্রদর্শন ক'রে থাকেন। এতে কি অন্যের ক্ষতির কারণ সৃষ্টি হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, নগেন মাস্টারের কথা, তার করার ক্ষমতা ছিল না, অথচ প্রয়োজন যথেষ্ট ছিল। ছেলেটাও বিশেষ কিছু করত না। সেইজন্য আমার কাছে বার-বার আসত। কাশীও মাঝে-মাঝে ঐ জন্য তাকে বলত, তাতে সে ব্যথা পেত। আমি তখন কাশীকে বললাম, নগেনদা তো তোদের মাস্টার, ওকে এই বয়সে আর উত্যক্ত না ক'রে যখন যেমন চায় যতদূর পারিস দিস্, যাতে সে মনে ব্যথা না পায়। আর একদিন ভাল ক'রে খাইয়ে খুশী ক'রে দিস। কাশীও তাই করেছিল। আজ নগেন মাস্টার নেই, ধর, ঐটুকু না করা হলে আমার ক্ষোভ ও আপসোসের সীমা থাকত না। তাই যেখানে দেখি—না দেখলে বা না দিলে মানুষের চলা বা বাঁচা বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ে, সেখানে না দেখে পারি না।

আমার ইচ্ছা ছিল শিক্ষার এমন একটা climate (আবহাওয়া) সৃষ্টি করবার, যাতে প্রত্যেকেই হাতে-কলমে কিছু ক'রে দাঁড়াতে পারে। ভেবেছিলাম আজকাল শুধু হাতে খেটে পারবে না, তাই কুটিরশিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি তৈরী করার পরিকল্পনা করেছিলাম। এইসবের জন্য কত কী যোগাড় করেছিলাম—এটা আনতাম, ওটা আনতাম। রকমটা দাঁড় করাতে পারলে সেই আবহাওয়ার মধ্যে প'ড়ে অনেকেই profitably active (লাভজনকভাবে সক্রিয়) হ'য়ে দাঁড়াতে পারত। কারণ, সবারই তো মাথা খাটিয়ে কিছু করার বুদ্ধি ও সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু নানা বিপর্য্যয়ের দরুন সে আবহাওয়াটা সৃষ্টি করতে পারলাম না। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন মানুষ। মানুষ না হ'লে আমার পরিকল্পনাগুলি শূন্যে হাহাকার ক'রে বেড়াবে। তবু প্রফুল্ল যে এগুলি লিখে রাখছে এটা ভাল। আমার বিশ্বাস, একদিন না একদিন মানুষ আসবেই এবং পরমপিতার ইচ্ছা materialised (বাস্তবায়িত) হবেই। কথাগুলি লেখা থাকছে, পরে যারা আসবে, তারা জানতে পারবে—কী আমি চাই।

শরৎদা—যত নীতিই থাক, ভগবান আবার সব নীতির উর্দ্ধে, এটা তো ঠিক! তাঁকে তো আর নীতির কাঠামোয় বেঁধে ফেলা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বটে।

শরৎদা—আমরা যতই জেনে থাকি, আদতে জানিনি বেশী কিছু। অজানা রয়েছে বিশাল। আর থাকবেও চিরকাল। সব জানা যাবেই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অজানা যতই থাক, মানুষের জৈবী-সংস্থিতি, জীবন-সত্তা এমন আছে যে, সে ইচ্ছুক হ'লে সবই জানতে পারে। কারণ, জীবনসত্তার উপাদানই হল অব্যয়ী প্রজ্ঞা। এই possibility (সম্ভাবনা) হ'ল পরমপিতার পরম আশীর্ব্বাদ। তবে মানুষের জানার ইতি নেই। আরও আছেই। আর তা' আছে বলেই মানুষ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে।

২৪শে চৈত্র, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ৭।৪।১৯৫০)

আজ গুড-ফ্রাইডে। ছুটি থাকার দরুন কলকাতা থেকে কতিপয় দাদা এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে আনন্দে কথাবার্ত্তা বলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ উল্লসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—কিরে, আইছিস!

ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী) একগাল হেসে ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধীরেন কেষ্টদাকে জোটায়ে দিল, কিন্তু নিজে আর থাকল না। চাকরির মোহ ছাড়তে পারে না। তবু আসে যায়, এটাও অনেক ভাল।

ধীরেনদা—ভাবি যদি চাকরি ছেড়ে আসি, হয়তো আপনার উপর একটা বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বোঝা বওয়ার বুদ্ধি যাদের মাথায় থাকে, তারা কখনও কারোর বোঝা হয় না। পরমপিতার দয়ায় তাদের কাজ বহু লোককে যোগান দিয়ে চলে। তাই তাদের অভাব হয় না। কেষ্টদার চলে কি করে? কেষ্টদার বাড়ীতে তো দীয়তাং ভুজ্যতাং লেগেই আছে। ইষ্ট যাদের কাছে মুখ্য হয়, পেটের কথা যারা ভাবে না, পরিবার-পরিজনসহ তাদের পেটের ভাত, পরনের কাপড় আর প্রয়োজন যা-কিছু আপসে জুটে যায়। মানুষের ভরসাই কম। বিশ্বাসই মানুষের বুকে বল যোগায়। এই বল না থাকলে বেপরোয়া হ'য়ে তাঁর কাজে ঝাঁপ দিতে পারে না।

কেষ্টদা প্রশ্ন করলেন—কখন বোঝা যাবে যে একজন লোকের ভাগবত-জীবন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে? কখন সে আর পিছু হটবে না ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

তোমার ইষ্ট, আচার্য্য বা সদ্‌গুরুর প্রতি
যখনই এমনতর অনুরাগ সৃষ্টি হবে—
যে অনুরাগ তাঁর অবজ্ঞা,
অবহেলা, আঘাত বা সংঘাতেও
অচ্যুত, অবাধ্য ও অনিবার্য্য হ'য়ে তোমাকে
তাঁ'তে একান্ত প্রীতিপ্রসন্ন ক'রে তুলবে
স্বতঃ আত্মপর্য্যবেক্ষণে,
আত্মনিয়ন্ত্রণ-সমঞ্জসা সার্থক সমাবেশে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে—
তখন থেকেই তুমি তাঁ'তে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠেছ,
তাঁর জীবন
তাঁর চাহিদার সমস্ত বোধ নিয়ে
তোমার চরিত্রে প্রাঞ্জল হ'য়ে উঠতে
আরম্ভ ক'রেছে,
তোমার প্রবৃত্তির কোন-কিছু চাহিদা
তাঁকে চাওয়ার অন্তরায় হ'য়ে
কোনক্রমেই যখন দাঁড়াতে পারছে না—
প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রণে সার্থক সংহত হ'তে
তখন থেকেই শুরু করেছে,
তাঁর প্রতি তিলমাত্র বিরূপ বা
বিদ্বেষভাবের কারণও
যখন তাঁতে আরো অনুরাগ-উদ্দীপী
ক'রে তুলেছে—
একটা সাংঘাতমথিত প্রীতি-প্রেরণার
উদ্দীপনায় স্বতঃ নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে—
তখন থেকেই তোমার আধ্যাত্মিক জীবন

জন্মগ্রহণ করেছে,
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কর্ম্মফল,
নিয়তির দুরপনেয় ডাইনী আকর্ষণ
সবগুলিই
ব্যর্থ হ'তে আরম্ভ করেছে,
ভাগবত জন্ম তোমার আরম্ভ হ'লো
ওখান থেকেই,
তুমি তাঁকে লাভ ক'রতে পারবে,
স্বভীঃ উদ্‌গাতা হ'য়ে তোমার জীবনে
সামগীতির সম্মোহন সুরে
দিগন্তের বিজয়বার্ত্তা
বহন করতে শুরু ক'রেছে।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে পূতশুভ্র শয্যায় এসে বসলেন।

এখন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী), যতীনদা (দাস), নরেনদা (মিত্র), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), শিবকালীদা (সাহা), পশুপতিদা (দত্ত) প্রমুখ উপস্থিত।

লেখা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কালিদাস, ভবভূতি, ভাস, ভারবি, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি খুব ভাল ক'রে চর্ব্বিত চর্ব্বণ ক'রে পড়তে হয়। আর ওদিকে শেক্সপীয়ার, মিল্টন প্রমুখের লেখাও খুব ভাল ক'রে পড়তে হয়। এসব মজ্জায় মিশিয়ে নিতে হয়। আর কলম ধরতে হয় উদার উদাত্ত মহান সুরে, যে লেখা প'ড়ে মানুষের অন্তরের ভগবান লহমায় জেগে ওঠেন। কালিদাস প্রমুখ এমন সুন্দর conception (ধারণা), আর এমন সহজ লীলায়িত ভঙ্গিতে তা' প্রকাশ করেছেন যে, ঐ-সব সাহিত্যের প্রভাবে ভারতে নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাট-বিরাট চরিত্র গ'ড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য, শুধু সাহিত্য দিয়েই হয় না, জন্ম-কর্ম্ম-বিবাহ-ধর্ম্ম ও কৃষ্টির যাবতীয় দিকই লাগে। আমি কেবল ভাবি, আবার কি সেদিন আসবে, আবার কি সেই মোহন সুরে আমাদের জীবনের বাঁশী বাজবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

সুশীলদা (বসু), বৈদ্যনাথদা (শীল) এবং যতিবৃন্দ উপস্থিত।

বৈদ্যনাথদা—আমি যে থিসিস লিখছি তা' এখনই দেব, না একবছর পরে দেব? এখন দিলেও কোন অসুবিধা হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Flawless (ত্রুটিহীন) যতটা করতে পার ততই ভাল। ওতে তোমার ক্ষমতা বেড়ে যাবে। Flawlessly (নির্ভুলভাবে) কাজ করার habit (অভ্যাস) হবে। আর, ঐভাবে অভ্যাস করতে-করতে মস্তিষ্ককোষেরও পুনর্বিন্যাস হবে। এতখানি না হ'লে হয় না। নিজেকে তৈরী করাটাই বড় কাজ।

বৈদ্যনাথদা—একখানা ভাল বই লিখতে পারলে অন্ততঃ কিছু টাকা হত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকা-পয়সার কথা ভাবিস্ না। ওতে লেখার জোর ক'মে যাবে। পরিবেশন যদি ভাল হয়, তাতে যদি লোকে আনন্দ-উদ্দীপনা পায়, জীবনের খোরাক পায়, তবে মানুষ আপনিই পছন্দ করবে। তার ভিতর-দিয়ে টাকা-পয়সা আপনিই আসবে। টাকা তোর সেবা করবে। টাকা-টাকা করলে বড় কিছু করতে পারবি না।

২৫শে চৈত্র, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ৮।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসেছেন। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে সামনের দিকে পদযুগল প্রসারিত ক'রে দিয়েছেন।

কাছে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), কিরণদা (মুখার্জ্জী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), খগেনদা (তপাদার), ধীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), হরিদাসদা (সিংহ) প্রমুখ।

পূর্ব্বতন মহাপুরুষদের সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পূর্ব্বতনদের প্রতি আপনাদের যে অনুরাগ, সেটা কিন্তু খুব আন্তরিক। রামকৃষ্ণদেবের কথাই ধরুন, তাঁর সম্বন্ধে আপনারা যতটা আলোচনা-চর্চ্চা করেন এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য আপনারা যতটা বোঝেন তা' কিন্তু অন্যত্র খুঁজে পাবেন না। রসুল সম্বন্ধে আপনারা ঢের জানেন, ঢের পড়েন। আমার ইচ্ছা, প্রত্যেকটি মহাপুরুষ সম্বন্ধেই যেন এখানে অনুশীলন চলে। প্রত্যেককে যথাযথ-ভাবে জানা, বোঝা এবং সেইভাবে তাঁকে তুলে ধরা আপনাদের কর্ত্তব্য। একজন মহাপুরুষকে বুঝতে গেলে তাঁর স্থান, কাল, পরিবেশ ভাল ক'রে বোঝা চাই। প্রত্যেক মহাপুরুষই তাঁর যুগের থেকে অনেকখানি এগিয়ে থাকেন। সেইজন্য সমসাময়িক লোকেরা সবাই তাঁকে ভাল ক'রে বুঝতে পারে না। তাই মহাপুরুষদের জীবৎকালে অনেক ভক্তজনের সমাবেশ যেমন হয়, তেমনি বিরোধীদের একটা দলও দেখা যায়। তারা নানা বাধার সৃষ্টি করে। এইভাবে বাধা দেয় যারা, তারাও কিন্তু পরোক্ষে মহাপুরুষদের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। কারণ, বিরুদ্ধতাই আন্দোলনের মধ্যে একটা গতিবেগ সঞ্চারিত করে। আমি আন্দোলন না ব'লে বলি উন্দোলন।

মহাপুরুষদের আবির্ভাবে একটা উর্দ্ধমুখী দোলন সৃষ্টি হয় সমাজে। তাঁর ভাবধারা ও জীবন যেমন উর্দ্ধমুখী, অনুরাগীদের চরিত্রে যদি তাঁর ছাপ না পড়ে, তাহ'লে কিন্তু জনগণের মধ্যে তা' সঞ্চারিত হয় কমই।

এরপর কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

(হে অর্জুন, অন্তর্যামী নারায়ণ সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় মায়াদ্বারা চালিত করিতেছেন।) এ কথাটার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়া মানেই পরিমাপন। আমাদের জৈব-সংস্থিতির ভিতর-দিয়েই জীবন-সম্বেগ স্ফুরিত হয়। এই কাঠামো যার যেমন তার ভিতর-দিয়ে ঈশ্বরীর শক্তির বিকাশ তেমনতরই হ'তে পারে। একটা গাছের মধ্যে তা' গাছের মতো ক'রে, একটা গরুর মধ্যে তা' গরুর মতো ক'রে, একটা মানুষের মধ্যে তা' তার মতো ক'রে। সব মানুষ সমান নয়। যার জৈবী-সংস্থিতির সমাবেশ যেমনতর, তার ভিতর-দিয়ে সেই শক্তি তেমনভাবেই ক্রিয়া করে। তবে প্রত্যেকের সম্ভাব্যতাই কিন্তু বিরাট। মানুষের ভিতর যে সম্ভাব্যতা লুকিয়ে থাকে, সাধনার সাহায্যে সে তাকে বিকশিত করতে পারে। সেইটেই মানবজীবনের বিশেষ মাহাত্ম্য। কিন্তু জৈবী-সংস্থিতি ভাল না হ'লে মানুষের বড় কাজ করা কঠিন ব্যাপার। তাই ব'লে এই কথা আপনারা মনে করবেন না, কেউ শূদ্র হ'লে সে বড় হ'তে পারবে না। সদ্‌বংশজাত শূদ্রের সম্ভাব্যতা প্রভূত। আবার, বিপ্রপরিবারে যদি বিয়ে-থাওয়ার গোলমাল হয়, সেখানে জন্মও কিন্তু অসুবিধার কারণ হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে সানন্দে বসে আছেন। তিনি একখানি হাতলওয়ালা ইজিচেয়ারে বসেছেন।

আজ কৃষ্ণা ষষ্ঠী। যদিও চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, তবু বড়াল-বাংলোর চারিদিকে আলো জ্বলছে ব'লে জায়গাটি আলোয় ঝলমল করছে।

কেশবদা (রায়) এবং তাঁর কতিপয় সঙ্গী উপস্থিত আছেন।

তাঁদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন—বহু গুণ আমাদের অর্জ্জন করতে হবে। কিন্তু তার মধ্যে প্রধান কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম চাই সংহত সুকেন্দ্রিকতা এবং ঘনীভূত ভাবসম্বেগ। তার জন্য চাই আদর্শ অর্থাৎ গুরু। আমার সমস্ত সত্তা ও ইন্দ্রিয়কে তাঁর অনুগত ক'রে তোলা লাগবে। নিজেকে যেমন এইভাবে গ'ড়ে তোলা লাগবে, পরিবেশের ভেতরও আবার এই ভাব সঞ্চারিত করতে হবে। তার ভিতর দিয়েই আমাদের ও পরিবেশের

ভিতর এলোমেলো ভাব ও রকম যেগুলি আছে, সেগুলি integrated (সংহত) হ'য়ে উঠবে। আর, এই ইষ্টানুকুল ঐক্য যত আসবে, ততই বড় কাজ করবার উপযোগী শক্তি গজাবে। প্রবৃত্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা না ক'রে যা'-কিছুই করতে যাও, প্রবৃত্তির দুর্ধর্ষ রাহাজানির ফলে তোমাদের সব শক্তি খোয়া যাবে এবং বিশেষ কিছু ক'রে উঠতে পারবে না, বা গেঁথে তুলতে পারবে না।

উক্ত দাদা—অনেক কাজে তো বাবা-মা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলা লাগবে, তাঁদের আশীর্ব্বাদ তো পাওয়া যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমে যদি সম্মতি নাও পাও, কিন্তু কোন ভাল কাজ যদি তুমি successfully (কৃতকার্য্যতার সঙ্গে) করতে থাক, তবে তোমার সেই কৃতী চলনই তাঁদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসবে। সবচেয়ে বড় জিনিস ইষ্ট। তাঁকে দিয়ে বাপ-মা সবাই fulfilled (পরিপূরিত) হ'তে পারেন। অন্য কারও প্রতি আমাদের টান সার্থক হ'য়ে ওঠে না যতসময় তা' ইষ্টে সার্থকতা লাভ না করে।

উক্ত দাদা—অনেকে লোকের জন্য কিছু করে না। শুধু খোল-করতাল নিয়ে হরিনাম ক'রে বেড়ায়। এতে কাজের কাজ কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খোল-করতাল নিয়ে হরিনাম করে তার মানে ক, খ পড়ে, BLA ব্লে, BLA ব্লে করে। এমনি করতে-করতে কতজনে আবার তৈরী হ'য়ে যায় গুরু-নিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে। কীর্ত্তন করা মানে গানের ভিতর-দিয়ে ভগবানের নাম করা ও তা' লোকের মধ্যে ছড়ান। গৌরাঙ্গদেব বিশেষ ক'রে এটা প্রবর্ত্তন করেছিলেন। এর ভিতর-দিয়ে একটা বোধ গজায়, করার আবেগ আসে। সেই আবেগ-অনুযায়ী কল্যাণকর কর্ম্ম করা লাগে। এর ভিতর-দিয়ে ভাল-ভাল মানুষ বেরিয়ে পড়ে। সবাই একভাবে চলে না, করে না। যার যেমন সংস্কার সে তেমন করে। অন্যের করাটা, চলাটা যদি আমাদের পছন্দ নাও হয় তাহ'লেও সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, সৎ কোন-কিছু যারা করে, তাদের সম্বন্ধে কখনও বিরূপ সমালোচনা করতে নেই। বরং উৎসাহ দিতে হয়।

কেশবদা—কর্ত্তব্যই তো বেশী সময় করা দরকার। সবসময় সাধন-ভজন ক'রে লাভ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম করা ও কাজ করা এ সবটাই সাধনার অঙ্গ। কাজটা সাধনার বাইরের ব্যাপার নয়। আর, নামটা সবসময় করা লাগে। নাম করতে-করতে আমরা টের পাই আমরা নিজেরা কী। আমরাও নাম এবং যা'-কিছু সবই নাম। নামীর প্রতি অনুরাগ নিয়ে নাম করতে-করতে ও তাঁর প্রীতিমূলক কর্ম্ম করতে-

করতে আমাদের একটা উপলব্ধি জাগে। এই উপলব্ধি বা অনুভূতি ছাড়া ধর্ম্ম কথার কোন মানে হয় না।

কেশবদা—ছেলেপেলেদের মধ্যে তো পবিত্রতা জিনিসটা বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পবিত্রতা বলতে আমি বুঝি unadulterated attachment বা adherence (অবিমিশ্র অনুরাগ বা টান)। সেইটে থাকলে মানুষ নানা আকর্ষণে আকৃষ্ট না হ'য়ে একমাত্র ইষ্টকে fulfil (পূরণ) করতে নিজের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে। এতে মানুষের চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়। সাধারণতঃ প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষ বৃত্তিরঙ্গিল হ'য়ে তম্ভাবে ভাবিত হয়। এটা হ'ল চিত্তবৃত্তির ক্রিয়া। কিন্তু যে অটুট ইষ্টনিষ্ঠ, সে ঐভাবে ভাবিত ও ধাবিত হয় কমই। তার আত্মশক্তির অপব্যয় নিরুদ্ধ হ'য়ে যায়। সে একাগ্রচিত্ত হয় এবং সেই একমুখী শক্তির দ্বারা অসাধারণ সাফল্য লাভ করতে পারে। যখনই তুমি আত্মস্বার্থপ্রতিষ্ঠা বিসর্জ্জন দিয়ে সর্ব্বতোভাবে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হবে, তখনই তোমাকে দেখে লোকের তাক লেগে যাবে। এবং মানুষ তখন তোমার কথা শুনবে। মানুষ তেমনতর হ'লে তার ভিতর একটা দিব্য ভাব জাগে। সে যখন কথা বলে তখন অপরের মনে হয়, যেন কোন দেবতার বাণী শুনছি।

কেশবদা—মহাত্মাজী প্রাকৃতিক চিকিৎসার খুব বিশ্বাসী ছিলেন। সব ক্ষেত্রে কি প্রাকৃতিক চিকিৎসা সফল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাকৃতিক চিকিৎসাও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। কার্য্য-কারণ জেনে যেখানে যা' করণীয় তা' যদি আমরা করতে পারি তাহ'লে তো উপযুক্ত ফল ফলতেই পারে। তবে সব রোগ প্রাকৃতিক চিকিৎসায় সারে কিনা আমি জানি না।

নিবিষ্টভাবে নাম ক'রে আকন্দগাছ ছুঁয়ে দেখেছি, গাছটা ঝাঁকি দিয়ে ওঠে। একবার বারাদিতে হরিপদদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। একটা মরার মতো তেলা-পোকার দিকে চেয়ে নাম করতে-করতে তেলাপোকা বেঁচে উঠে হেঁটে চলে গেল। একবার দেখলাম একটা গুবরে পোকা মরে গেছে এবং তার শরীরের অনেকখানি পিঁপড়েতে খেয়ে ফেলেছে। তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে নাম করতে-করতে নড়ে উঠল, যতক্ষণ নাম করি নড়তে থাকে। নাম ছেড়ে দিলে আর নড়ে না। তার মানে ওর ভিতরে সেই সমাবেশ ছিল না যা' থাকলে নাম ছেড়ে দিলেও ওর পক্ষে চলা সম্ভব হয়। নামের শক্তি অমোঘ। তোমরা ক'রে দেখতে পার।

একবার কুষ্টিয়ার হরিশবাবুর বাড়ীতে কীর্ত্তন করছিলাম। একটা পক্ষাঘাতের রোগীকে এনে সেখানে রেখে গেল। গোঁসাই না কেষ্ট দাস কে যেন তাকে ধমক দিয়ে বলল—শুয়ে আছিস কেন ওঠ কীর্ত্তন কর্। যে বলেছিল, সে ছিল ভাবে

তরপুর। রোগীটিরও বিশ্বাস ছিল। তাই ধড়ফড় ক'রে উঠে কীর্ত্তন করতে লেগে গেল। Vital flow (জীবনী শক্তি)-এর upheaval (উদ্বেলন) হ'য়ে curative force (আরোগ্যকারী শক্তি) বেড়ে যায়, তার ফলে এইসব ব্যাপার ঘটে। এসব যা' দেখেছি, করেছি, তা' এত তরতাজা ব্যাপার যে এর মধ্যে বিন্দুমাত্র আজগুবি কিছু নেই। তোমরা কর, চারাও।

অনৈক দাদা—মাঝে-মাঝে আত্মহত্যার প্রবণতা আসে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধূমকেতু দেখেছিস? ওরা আগন্তুক সব আবির্ভাব। তেমনি এমন সব প্রবৃত্তি আছে যা' আদৌ সত্তাপোষণী গোষ্ঠীর নয়কো। সেগুলি কখনও-কখনও নানাভাবে উৎপাত করে। কিন্তু মানুষ concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লে এগুলি এসেও বিশেষ কিছু ঝামেলা করতে পারে না। আমি কই, নামটাম কর—কাম কর। মানুষগুলিকে বাঁচায়ে তোল। তোমাদের মরার কথা ভাববার ফুরসত কোথায়?

উক্ত দাদা—বাড়ী গেলেই মন কেমন গম্ভীর ও বিষণ্ণ হ'য়ে যায়। কিন্তু রাস্তায় বেরোলেই মন স্ফূর্তিযুক্ত হয়—এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়তো বাড়ীর পরিবেশে তোমার innate spirit (অন্তর্নিহিত প্রকৃতি) যা' আছে তা' fulfilled (পরিপূরিত) হয় না। তা' হয়তো কয়—বেরো, এ তোর ঘর নয়। রাস্তাই তোর ঘর। রাস্তার লোককে আপন ক'রে নে।

২৬শে চৈত্র, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ৯।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), বৈদ্যনাথদা (শীল), অরুণ (জোয়ারদার) প্রমুখ সেখানে উপস্থিত।

বসন্তে পুরনো পাতাগুলি ঝ'রে গিয়ে গাছে-গাছে নূতন পাতা গজিয়েছে। সেইদিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শক্তি জিনিসটি অমর। তা' নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় না। শীতের সময় মনে হয়, কতকগুলি গাছ যেন ম্রিয়মাণ। তারপরে একসময় পাতাগুলি ঝ'রে যায়। মনে হয় গাছটি বুঝি মৃত। কিন্তু আবার নূতন ক'রে পাতা গজায়। আমি একে বলি পরিবর্ত্তনশীল সৎ। জগৎ নেই এ-কথাটা বলা ভুল। তবে জগতের অস্তিত্ব নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে বিদ্যমান থাকে। কোন সময় হয়তো মনে হয় তা' নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিন্তু তা' বীজাকারে থাকে। কল্পে-কল্পে নতুন সৃষ্টি জেগে ওঠে। রামকৃষ্ণদেব যে বুড়ির হাঁড়ির কথা বলেছেন, কতকিছু বীজ সে হাঁড়ির মধ্যে থাকে। তাই প্রকৃতপক্ষে এর বিনাশ

নেই। পরিবর্ত্তনশীল যা' তাকে আমরা পরিবর্ত্তনশীল বলি—অপরিবর্ত্তনীয় ও নিত্য যা' তার পরিপ্রেক্ষিতে। আমরা যখনই নিজেদের জীবন সম্বন্ধে ভাবি, কখনও ভাবতে পারি না যে, আমরা কখনও ছিলাম না, বা কখনও থাকব না। এইরকম বোধ হয়, কারণ আমাদের সত্তা দাঁড়িয়ে থাকে অবিনশ্বর আত্মাকে অবলম্বন ক'রে। মানুষ একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারে তার ভিত্তিটা কী। চিন্তা করতে গেলেই বাবা-মা থেকে শুরু ক'রে ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্ম পর্য্যন্ত বোধে এসে যায়।

কেষ্টদা—আপনি যে-কথা বলছেন, সে বোধ তো খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা একটু উৎসমুখী, পিতৃমাতৃভক্ত, তাদের মধ্যেই চিন্তাশীলতা জিনিসটা জেগে ওঠে এবং তারা সহজেই অনেক কিছু বোধ করতে পারে। যারা প্রবৃত্তি-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় তাদের বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক বিচারক্ষমতা থাকে না বললেই চলে। তাই তারা প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তি ব'লেই চিনতে পারে না। আর, প্রবৃত্তির সঙ্গে একীভূত হ'য়ে থাকলে সূক্ষ্ম ও সার্থক চিন্তা করার সামর্থ্য থাকে না।

এরপর সুপ্রজনন সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রত্যেকের একটা জৈবী-সংস্থিতি আছে। বিবাহের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ পরস্পরের জৈবী-সংস্থিতি, রক্ত ও প্রকৃতির পরিপূরক ও পরিপোষক না হ'য়ে যদি প্রতিরোধক হয় সেখানে সন্তানের শরীর, মন, আয়ু সবই ক্ষুণ্ন হয়। এমনকি সন্তানের জীবন মাতৃগর্ভে থাকতেই নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে।

কেষ্টদা—অনেক পুরুষ ছেলে তো স্ত্রীকে তোয়াজ ক'রে সংসারের শান্তি বজায় রাখে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ত্রীর কাছে yield (নতিস্বীকার) ক'রে যেখানে দাম্পত্য-সংহতি বজায় রাখা হয়, সেখানে বাইরে থেকে খুব মিল আছে বলে মনে হ'লেও স্ত্রীর স্বামীর প্রতি গভীর অনুরাগ আছে—তা' বলা চলে না। এমনতর স্থলে সন্তান ভাল হ'তে পারে কমই। ভাল মানে আমি বলতে চাই শ্রেয়নিষ্ঠ। স্ত্রীর চরিত্র ও মানসিকতা সন্তানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ই। মায়ের যার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকে, সন্তানের মধ্যে ঐ তার ছাপ ফুটে ওঠে। সৎসঙ্গের অনেক ছেলেপেলের মধ্যে আমার কিছু-কিছু রকম দেখা যায়, যা' হয়তো তাদের পরিবারের মধ্যে পাওয়া যায় না। পিতামাতা বিশেষতঃ মায়েরা শ্রেয়ভক্তি-পরায়ণ হ'লে জাতি ধীরে-ধীরে অজ্ঞাতসারে উন্নত হ'য়ে চলে। আর একটা কথা—আমার মনে হয়, অনুলোম অসবর্ণ বিয়ের বেলায়ও সগোত্র বিয়ে না হওয়া ভাল।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের ভিতর ভালবাসা ও ভাললাগার প্রবৃত্তি যত বাড়ে, তত তার কর্ম্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে ঘৃণা ও অপছন্দ যখন কারও মধ্যে উত্তাল হ'য়ে ওঠে তখন হয় সে স্থবির হ'য়ে পড়ে, তার কর্ম্মক্ষমতা লোপ পেতে থাকে, নচেৎ তার কর্ম্মপ্রবণতা হয় destructive (ধ্বংসাত্মক)। এই সবের মূলে কিন্তু থাকে জন্মসূত্রে মানুষ যে-ভাব নিয়ে আসে তা' এবং তার সঙ্গে পরিবেশের সঙ্গে-ঘাত-প্রতিঘাতে যে মনোভাব প্রবল হ'য়ে ওঠে সেইটে। সাধারণতঃ দোষ-দর্শন, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও অপরের দুর্ব্যবহার আমাদের মনটাকে খিচ্‌ড়ে দেয়। যারা নাম-ধ্যান করে না, তারা ঐ-সব বিসদৃশ-ভাবের মোড় ফেরাতে পারে কম। তাই, জীবনটাকে একটা নরক ক'রে ফেলে। নাম-ধ্যান নিত্য যারা করে, তাদের ভিতর কালে-কালে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের বুদ্ধি কিছু-কিছু গজিয়ে ওঠে, এবং তারা সপরিবেশ কিছুটা শান্তিতে থাকতে পারে। হীনম্মন্য অহং, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা মানুষের সব শান্তি কেড়ে নেয়। সে নিজে অশান্ত ব'লে পরিবেশের সঙ্গেও সুস্থ ব্যবহার করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন।

তখন ননীদা (চক্রবর্ত্তী) এবং মায়েরা সেখানে ছিলেন। মেদিনীপুরের এক নবদীক্ষিত দাদা এসে বললেন—আমি কী করব? কোন পথ পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের জীবনের প্রধান জিনিস হল ইষ্টানুরাগ বাড়ান। আমরা যা' কিছু করি তাকেই ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত করার বুদ্ধি থাকলে তার ভিতর-দিয়েই সব পথ বেরিয়ে যায়। এমনি ক'রে মানুষের যোগ্যতা বাড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট।

প্রবোধদা (মিত্র)-র সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ হ'লে পৃথিবীর সমস্ত আর্য্যদের ঐক্যবদ্ধ ক'রে তুলতে কিছু লাগত না। তিরিশ জন মানুষ হ'লে সারা পৃথিবীর পক্ষে যথেষ্ট। আমি বলেছি চল্লিশ জনের কথা। দশজন আমার কাছে থেকে নানাভাবে যোগান দেবে এবং চিঠি, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে কর্ম্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের চেতিয়ে তুলবে। একটা বিরাট literature (সাহিত্য) সৃষ্টি করা লাগে। আমার বইগুলি নানা ভাষায় অনুবাদ করা লাগে। নানা বিষয়ের উপর ছোট-ছোট pamphlet (পুস্তিকা) লেখা লাগে। নাটক, নভেল, থিয়েটার, যাত্রা, সিনেমা, খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা ইত্যাদির মধ্যে-দিয়ে মানুষের কাছে ঢাক পেটানো লাগে। প্রচারে-প্রচারে মানুষের ভাবভূমি বদলে

ফেলতে হয়। আড়ে-হাতে লাগলে সমস্ত জগৎকে one state (একরাষ্ট্র), one family (এক পরিবার) ক'রে তোলা অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়।

সুশীলদা—আপনি যে শুধু আর্য্যদের কথা বলছেন, আর্য্য ছাড়াও তো অনেক জাতি পৃথিবীতে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে কোন জাতিই থাক, যারা ভগবৎপন্থী, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের পূজারী এবং পরিবেশকে বাঁচিয়ে বাঁচার পক্ষপাতী, যারা কারও বৈশিষ্ট্য নষ্ট না ক'রে তার পরিপোষণ করতে চায়। যারা সুধী সহযোগিতায় বিশ্বাসী, যারা ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করতে চায় না এবং যাদের সব কিছুকে একাকার করার বুদ্ধি নেই, তাদেরই আমি আর্য্যপন্থী ব'লে মনে করি। আর্য্যপথ মানে সমীচীন শ্রেষ্ঠ পথ। এই আর্য্যপথ অনুসরণ করতে গেলে, যে যেমনই হোক না কেন, তার নিজত্ব বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করা লাগে না। তাই যে-কোন জাতির অন্তর্গত হোক না কেন, সে নিজত্ব বজায় রেখে এই পথে চলতে পারে।

২৭শে চৈত্র, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ১০।৪।১৯৫০)

বেলা গোটা নয়েকের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোয় তাঁর ঘরে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার), শরৎদা (হালদার) প্রমুখ উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যার মন সুকেন্দ্রিক, তার সমস্ত মানসিক ভাব, চিন্তা-চলন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আবেগ, এককথায় তার দুনিয়ার সব কিছু ঐ ভালবাসার কেন্দ্র দ্বারা সুসংবদ্ধ হ'য়ে ওঠে। তাই, তার অভিজ্ঞতার জগতের উপাদানগুলি সংহত হয়। সে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি পরস্পরবিরোধী ভাব ও বোধের রাজ্যে বিচরণ করে না। এর মধ্যে-দিয়ে তার একটা ব্যুৎপত্তি গজায়। প্রত্যেক যা'-কিছু সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বোধ থেকেও সবটা মিলিয়ে একটা সুসঙ্গত বোধ গজিয়ে ওঠে। বিরক্তি, অভাব, অনুরাগ, আগ্রহ, নিগ্রহ সবটার মধ্যে ঐ কেন্দ্র জাগ্রত থাকেন। তাঁকে নিয়ে সবকিছু adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। তার ভিতর-দিয়ে আসে প্রজ্ঞা। নচেৎ যত বড় পণ্ডিত হোক, একায়িত সমাবেশ আর হয় না। তারা হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। তার কারণ, তারা নানা টানের ও প্রয়োজনের দ্বন্দ্বের মধ্যে প'ড়ে দোলায়মান-মতি হয়ে থাকে। এক-এক সময় এক-এক সম্বেগ ও আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। তাই সুকেন্দ্রিক না হ'লে মানুষকে জীবনে ক্রমাগতই নাস্তানাবুদ হ'তে হয়।

পঞ্চাননদা—আপনি তো বিশ্লেষণ ক'রে বললেন। কিন্তু সুকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে যে মানুষ প্রজ্ঞার অধিকারী হয়, সেটা তো সহজভাবেই হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুস্থ life urge (জীবন সম্বেগ) বলতে আমি বুঝি শ্রদ্ধা-উচ্ছ্বসিত সুকেন্দ্রিক সক্রিয় অনুরাগ। ঐটেই হ'ল সার্থকতার চাবিকাঠি।

পঞ্চাননদা—বুদ্ধি ক'রে তো এই অনুরাগ আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুদ্ধি ক'রে আসে না, কিন্তু অনুরাগ থাকলে মানুষ যেমন ভাবে, বলে, করে, আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে সেইভাবে মক্স করতে-করতে আবার প্লাবনের মতো অনুরাগ এসে হাজির হয়। অনুরাগ আস্‌লে বুদ্ধি, ফন্দী-ফিকির তেমনি ক'রে জেগে ওঠে। পিম্পুলিয়া হরিদাসের কথা শুনেছি, সে চোখে পিপুলের গুঁড়ো দিয়ে কাঁদত যাতে তার অন্তরে সাচ্চা অনুরাগ জাগে। আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে এইভাবে অভিনয় করতে-করতে তার ভিতর ভাব-ভক্তি গর্জ্জে উঠল। তখন তার জীবনের বিচ্ছিন্ন যা-কিছু একান্বিত হ'য়ে গেল ভাব-ভক্তিকে অবলম্বন ক'রে।

পঞ্চাননদা—অনেক সময় বয়স্ক অমনোযোগী ছেলেকে জোর থাপ্পড় দিলে তারপর থেকে তাদের পড়াশুনার প্রতি টান এসে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হ'তে পারে যদি আপনার উপর টান থাকে। মোট পর, বৈধী পথে চলা ভাল। সেইজন্য আমি বলি যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি পালনের কথা। অনুরাগ যার সত্তাকে স্পর্শ করে তার যত দোষগুণই থাক্, সে কিন্তু তার ভালবাসার জনকে ভুলতে পারে না। তখন tussle (সংগ্রাম) হ'য়ে-হ'য়ে একটা সাম্যভাব আসে। তা' দেখেই হয়তো মানুষ মুগ্ধ হ'য়ে যায়। তার ভিতর প্রবৃত্তির আধিপত্য থাকলেও সে-প্রবৃত্তির প্রকাশভঙ্গি বদলে যায়। সে একেবারে প্রবৃত্তির কবলে গিয়ে পড়ে কম। প্রবৃত্তি-বেহাতি হ'তে-হ'তে সে নিজেকে সামলে নেয়। আপনি যেমন আমার কাছে মার খেয়েও লোকের কাছে এমন ক'রে ব'লে বেড়াতেন যে মানুষ আপনার ঐ elated, adjusted mood (উদ্দীপ্ত, নিয়ন্ত্রিত ভাব) দেখে অবাক হ'য়ে যেত। আপনার টান ছিল ব'লে আপনি মার খেয়ে আমার কাছ থেকে ছিটকে যাননি। বরং আমাকে আঁকড়ে ধরেছেন আকুলভাবে। কারণ, আপনার ধারণা সর্ব্বাবস্থায় আমিই আপনার একমাত্র সম্বল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। কেষ্টদা, সুশীলদা, পঞ্চাননদা, শরৎদা, প্যারীদা (নন্দী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), বৈদ্যনাথদা (শীল) প্রমুখ তাঁর কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সহজ অনুরাগটা অতি স্বাভাবিক জিনিস। আমাদের জন্মের মূলে আছে libido (সুরত)। ভক্তিপথে আছে ঐ সুরতেরই সহজলীলা। তাই, এর মধ্যে কসরত নেই। টান আছে কিনা তা' বোঝা যায় বিপরীত ব্যবহার হাসিমুখে সহ্য করতে পারে কিনা তাই দেখে। গুরু বা গুরুজনের শাসন যারা মাথা পেতে নিতে পারে না, তাতে যারা ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে, বুঝতে হবে তাদের টানটা পোষাকী। বস্তুতঃ তারা ভালবাসে নিজেদের হীনম্মন্য অহংকে এবং তারই পরিপোষণ চায় অন্যের কাছ থেকে।

কথায়-কথায় কেষ্টদা বললেন—পঞ্চবর্হি'র উপর দাঁড়ালে একটা বিরাট ঐক্যের ভিত্তি তৈরী হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। পঞ্চাননদাকে দিয়ে পঞ্চবর্হি' ও সপ্তার্চ্চি'র একটা বাংলা ছড়া ক'রে নিলে হয়। ছড়াটার ছন্দ এমন করা লাগে যাতে তা কোরাস গাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগআপ্লুত কণ্ঠে বললেন—রামকৃষ্ণঠাকুরের মতো অমন আর দেখা যায় না, হয়নি, হবে নাকো।

শরৎদা শাণ্ডিল্য ও নারদের ভক্তিসূত্র থেকে প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাগুলি আছে একেবারে মাপা। অনুভব না থাকলে এইভাবে সূত্রাকারে কথাগুলি বলা যায় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যদি তাঁর উপর টান থাকে, তিনি ব্যথা পান এমন-কিছু আমরা করতে পারি না। টান থাকলে আমাদের অন্তরেন্দ্রিয়, বহিরিন্দ্রিয়, অভ্যাস-ব্যবহার, বাক্য, চালচলন আপনা থেকেই সুশাসিত হয়। মনে হয় যেখানে যাই করি, তিনি সবটা দেখছেন, জানছেন, টের পাচ্ছেন। এমনকি একটা কুচিন্তা আসলেও মনে চিন্তা হয়, আমি যদি কুচিন্তার প্রশ্রয় দিই তাহ'লে তাঁকে অমান্য করা হবে। আর, টান থাকলে তাঁর উপর কখনও অভিমান আসতে পারে না। অভিমান মানে তাঁর থেকেও নিজের ওজন বাড়িয়ে তোলা। গুরুর গুরুত্ব-বোধ যদি আমার কাছে লঘু হ'য়ে যায়, তার মানে আমি চাচ্ছি যে তিনি আমাকে তোয়াজ করুন। আমি যেন তাঁর থেকেও বড়। এটা একটা সর্ব্বনাশা মনোভাব। তাই বলে, নরক কী মূল অভিমান।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে বিছানায় উপবিষ্ট। ভক্তবৃন্দ কাছে আছেন।

কয়েকজন বিহারী ভদ্রলোক এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বসলেন।

তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—এ সংস্থার উদ্দেশ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের সবারই উদ্দেশ্য ধর্ম্ম। ধর্ম্ম মানে সত্তাসম্বর্ধনা—যাতে সবাইকে নিয়ে বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি, ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে পারি তাই করা। যেনাত্মানস্তথান্যেষাং জীবনং বর্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ। (যার দ্বারা নিজের ও অপরের জীবনবর্ধন বিধৃত হয় তাই ধর্ম্ম।)

উক্ত ভদ্রলোক—বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোককে সন্ত বলে পরিচয় দেয়, এর মধ্যে কে প্রকৃত সন্ত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কে কী আমি জানি না। আমি যা' জেনেছি তাই বলি। যারা উপকৃত হয় ব'লে মনে করে, তারা সে-কথা শোনে। যেখান থেকেই হোক, কল্যাণের পথে অগ্রসর হ'তে পারলেই হ'ল। সদ্‌গুরু কাউকে তৈরী করা যায় না। পরম-পিতার দয়ায় যার মধ্যে ফুটে ওঠে—আপনিই ওঠে। সদ্‌গুরু দুইরকম। একদল তপশ্চর্য্যা দ্বারা বস্তু লাভ করেন। আর এক-রকম হচ্ছে তিনি যখন উপর থেকে জীবকল্যাণের জন্য অবতরণ করেন বা আবির্ভূত হন। আমি কোন সদ্‌গুরুর সঙ্গ করিনি। পুঁথি-টুঁথিও পড়িনি। মার কাছ থেকে হুজুর মহারাজের বাণী নিয়ে সাধন করেছি যতটুকু পারি। তাতে যা' পেয়েছি তা' বলি। তাতে যদি কারও উপকার হয়—হোক। আর যদি না হয়, তাতে আমার বলার কিছু নেই। তবে যা' আমি প্রত্যক্ষভাবে না জেনেছি তা' আমি কখনও বলি না। পরমপিতা দয়া ক'রে আমার কাছে এমন একটা বস্তু উদ্ঘাটিত করেছেন যা' দিয়ে সব কিছুই explained (ব্যাখ্যাত) হ'তে পারে।

উক্ত ভদ্রলোক—এ নাম আস্‌ল কোথা থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ নামকে বলা যায় ধ্বন্যাত্মক নাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা'-কিছু কম্পন থেকে সৃষ্ট। এই নামের মধ্যে আছে কম্পনের mechanism (মরকোচ)। তাই, এটা সব যা-কিছুকেই fulfil (পরিপূরণ) করে।

উক্ত ভদ্রলোক—নাম তো শরীর-মনের পার! সে তো আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধ্যাত্মিক যা' তার থেকেই সৃষ্ট হয় শরীর-মন। আধ্যাত্মিকতার উপরই দাঁড়িয়ে আছে দুনিয়ার যা'-কিছু। মনের নানা স্তর আছে। যেমন পিণ্ডী মন, ব্রহ্মাণ্ডী মন, নির্ম্মল চৈতন্যরাজ্যের মন। পিণ্ডী মন সঙ্কীর্ণ জগতে বাস করে। ব্রহ্মাণ্ডী মন সবার স্বার্থে স্বার্থান্বিত হয়। তার থাকে universal interest (সর্ব্বতোমুখী আগ্রহ)। এর মধ্যেও কামনা-বাসনা থাকে। সে-কামনা অপরের কল্যাণ সাধনের কামনা। নির্ম্মল চৈতন্যরাজ্যে যে মন বিরাজ করে তা' নামনামীময় হ'য়ে থাকে। তার নিজস্ব কোন কামনা-বাসনা বা ইচ্ছা থাকে না। পরমপিতা

তাকে যখন যেভাবে চালান তখন সে সেইভাবে চলে। সে মন প'ড়ে থাকে ইষ্টানত হ'য়ে।

উক্ত ভদ্রলোক—সাধকরা কীর্ত্তন করেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনকে কেন্দ্রীভূত করবার জন্য মানুষ কখনও কীর্ত্তন করে, কখনও ধ্যান, ভজন করে, কখনও বাণী পাঠ করে। কখনও যাজন করে। কখনও বাস্তব কর্ম্মে লিপ্ত হয়। নিজেকে তৈরী করবার জন্যই সব-কিছু। দয়ালদেশের রাস্তা তনুমনের ভিতর-দিয়েই। তার ভিতর-দিয়ে রাস্তা না পেলে সেখানে যাবার উপায় নেই। শরীর-মনকে তাই শুদ্ধ করা লাগে, যাতে নামনামীকে নিরন্তর ধারণ, বহন ও প্রকাশ করতে পারে।

এরপর ভদ্রলোকেরা খুশি মনে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ফাঁক পেলে আবার আসবেন।

২৯শে চৈত্র, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ১২।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। এখন চৈত্র মাসের শেষ। একটু বেলা হ'তেই মাঝে-মাঝে উথাল-পাথাল হাওয়া দেয় এবং ধুলো উড়তে থাকে। আজও কতকটা সেইরকম আবহাওয়া। সেটা লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা বাইরের আবহাওয়া টের পাই, কিন্তু মানুষের মনের আবহাওয়া যে কত বিচিত্র তা' ব'লে শেষ করা যায় না। এটা আবার এক-একজনের এক-এক রকম। কোন একটা মানুষ যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন তার মনের অবস্থা ও আবহাওয়াটা পরমপিতা আমাকে দেখিয়ে দেন। প্রত্যেকের অবস্থা ও রকমই ব'লে দেয় কাকে কখন কী বলতে হবে, কার সঙ্গে কখন কী ব্যবহার করতে হবে। সাধারণতঃ আমরা নিজেদের জগতে আবদ্ধ থাকি। অন্যের মনের দিকে চাইবার অবকাশ ও ক্ষমতা দুয়েরই অভাব আমাদের। কারণ, আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের মনকে গ্রাস ক'রে থাকে এবং অপরের প্রতি আমাদের ভালবাসা অর্থাৎ তার ভালতে বাস করার প্রবণতা আমাদের খুব কম। ছেলেমেয়েদেরও আমরা প্রকৃত ভালবাসি না। তাদের দিয়ে আমরা নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করতে চাই এবং তাদের করণীয় ব'লে উপর থেকে আমাদের মনোমত ভাব চাপিয়ে দিই। তাদের প্রকৃতি ও প্রবণতা অনুধাবন ক'রে প্রত্যেককে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পরিচালিত করি কমই।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), সুরেনদা (বিশ্বাস), বৈদ্যনাথদা (শীল), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), বীরেনদা (পাণ্ডা) প্রমুখ কাছে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা থেকে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কথা উঠল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ পেলে এক-একটা টোলকে কেন্দ্র ক'রে গ্রামে-গ্রামে ঘরোয়াভাবে University (বিশ্ববিদ্যালয়) করতাম। শিক্ষা দিতে গেলে দেখাতে হবে—শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে জীবন ও জগৎ চলনার সম্পর্ক কী। সেটা না দেখাতে পারলে শিক্ষার সাথে সত্তার যোগসূত্র রচিত হয় না। তাছাড়া, ছেলেদের শেখানো দরকার কেমন ক'রে নানা তথ্যের ভিতর থেকে common factor (উপাদান-সামান্য) deduce (বের) করতে হয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য যে দেখতে পায় না তার প্রকৃত শিক্ষাই হয় না।

কেষ্টদা—আপনি টোলের কথা বললেন। টোল তো আজকাল অত্যন্ত নিষ্প্রাণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পণ্ডিত যদি জ্ঞানতপস্বী হন, তাহ'লে তা' হবার কথা নয়। শুধু পড়াশুনা নিয়ে যারা থাকে, বাস্তব কাজকর্ম্মের সাথে যাদের যোগ নেইকো এবং জগৎটাকে যারা নিজের মস্তিষ্ক দিয়ে হজম করতে চেষ্টা করে না, যাদের মধ্যে উদ্ভাবনী প্রতিভা নেই, স্থান-কাল পাত্রের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী যারা চলতে জানে না, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও অনুসন্ধিৎসা যাদের তীব্র ও তরতরে নয়, তেমনতর মানুষ দিয়ে কিন্তু আমি যা' চাই তা হবে না।

কিছু সময় পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন।

সেখানে কেশবদা (রায়) ও তাঁর সঙ্গীদের শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনেক শ্রমণ সংগ্রহ করা লাগে। শ্রমণদের সেবা-তৎপরতা এমন হওয়া চাই যাতে তারা সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। তারা ভোরে উঠে নামধ্যান ক'রে জাগরণী গেয়ে সকলকে জাগিয়ে নামধ্যানে বসিয়ে দেবে। যে যাই হো'ক প্রত্যেকে যজনশীল হবে এটা আমি চাই। মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও জৈন যারা তারাও স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যা'-যা' করণীয় করবে। শ্রমণরা সারাদিন বাস্তব কাজের ভিতর-দিয়ে মানুষগুলিকে যোগ্য ক'রে তুলবে। তারা প্রত্যেক এলাকার বেকার, রুগ্ন, দরিদ্র, দুষ্টচরিত্র, বিশ্বাসঘাতক, কৃষ্টিবিরোধী প্রভৃতির list (তালিকা) ক'রে তাদের পেছনে লেগে থেকে তাদের adjust (নিয়ন্ত্রিত) করবে। তারা প্রয়োজনমতো মানুষকে কুটিরশিল্পের যন্ত্র ও কাঁচামাল ইত্যাদি সরবরাহ ক'রে তাদের দিয়ে নানারকম শিল্প গ'ড়ে তুলবে এবং জিনিসপত্র বাজারে বিক্রীর ব্যবস্থা করবে। মানুষগুলিকে এমনভাবে স্বাবলম্বী ক'রে তোলা লাগে যাতে তাদের পরের চাকরি না করা লাগে। ধীরে ধীরে সরকারের কাজ অনেকাংশে তোমাদের উপর বর্ত্তাবে। কোন গোলমাল হ'লে মানুষ স্বভাবতই ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু, যাজক ও শ্রমণদের কাছে আসবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এরাই পরিচালনা করবে। মোট পর, এইসব

লোকসেবকদের এমনতর যোগ্যতা থাকা দরকার যাতে তাদের বিভিন্ন দল মিলে সমাজের প্রয়োজনীয় সবরকম সেবা দিতে পারে। এদের সঙ্গে থাকবে আবার কৃষ্টিপ্রহরী—যাদের কাজ হবে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। আমার যখন যেমন মনে আসে বলছি। তোমরা গুছিয়ে সুসংবদ্ধভাবে করবে। আমার ইচ্ছা, একটা মানুষও যাতে কষ্ট না পায়। আমরা থাকতে যদি মানুষ কষ্ট পায়, তাহ'লে সেটা বড়ই পরিতাপের কথা।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি আশ্রমে উপবিষ্ট। কেষ্টদা, পঞ্চাননদা, সুশীলদা, শরৎদা প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যান্য কথার মধ্যে হঠাৎ বললেন—আপনাদের একটা দোষ আছে—খামাকা এক-একটা প্রবৃত্তির গর্ত্তের মধ্যে প'ড়ে যান। একজনের একটা কথায় চ'টে গিয়ে হয়তো মনে করলেন—শালা গাঁজাই খাব। আর বাস্তবে হয়তো তাই করলেন। আমি অবশ্য দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছি। ফলকথা, প্রবৃত্তির রোখ যখন চাপে, তখন যদি তার কাছে আত্মসমর্পণ করা যায় তাহ'লে কিন্তু অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। Continuity break করে (ক্রমাগতি ভেঙে যায়)। এতে ক'রে নিষ্ঠায় ফাটল ধরে। আমি একজনকে খুব চোমরাচ্ছি, বলছি—অমুক জবর মানুষ, তাতে সে মোটামুটি ঠিক থাকছে। তাতে বোঝা যাবে না যে তার নিষ্ঠা আছে। অবজ্ঞা, অনাদর, তাচ্ছিল্যেও যদি একজন না টলে, তবেই বোঝা যায় যে সত্যিকার টান আছে। সেইজন্য আগের গুরুরা অনেকে শিষ্যদের সঙ্গে খুব কঠোর আচরণ করতেন। ঐসবের ভিতর-দিয়ে যারা যায়, তারাই পাকাপোক্ত হয়।

আত্মস্বার্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি আসলেই মানুষ ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে insincere (কপট) হ'য়ে ওঠে। যদিও তারা sincere (অকপট) নয়, তবুও তাদের ধারণা যে তারা অসাধারণ অনুরাগী। আবার, ইষ্টকর্ম্ম করতে গিয়ে তারা নিজেদের খেয়ালমতো সেই সব কাজ বেছে নেয় যাতে কামিনী-কাঞ্চন, মানযশ ইত্যাদি হবে। তারা ভিতরে একরকম এবং বাইরে আর একরকম। ফলকথা, তাদের চরিত্রে রঙ ধরে না। মতলববাজ তারা অন্তরে।

শুনেছি, শিব ছদ্মবেশে পার্ব্বতীর কাছে এসে যখন শিবনিন্দা করতেন তখন পার্ব্বতী তার প্রত্যেকটি কথার মোক্ষম জবাব দিয়ে দিতেন এবং পরে বলতেন—মহতের নিন্দা যে করে ও যে শোনে উভয়েই পাপী। আপনি নিজেও পাপে লিপ্ত হবেন না এবং আমাকেও পাপে লিপ্ত করবেন না। আপনার কথা শোনার মতো

সময় আমার নেই। আপনি যার নিন্দা করছেন আমি সর্ব্বদা তাঁর পূজা করি। আমার পূজায় ব্যাঘাত ঘটাবেন না দয়া ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। বেশ গরম পড়েছে। তাই কালিদাসীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পাখা দিয়ে হাওয়া করছেন। সরোজিনীমা তামাক-জল ইত্যাদি দিচ্ছেন।

আগামীকাল থেকে ৪৮তম ঋত্বিক্ অধিবেশন শুরু। আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের বহু দাদা উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সমবেত দাদাদের বললেন—মাঝে পূর্ব্ববঙ্গে যে-সব কাণ্ড ঘটে গেছে তাতে নূতন ক'রে বহু লোক উদ্বাস্তু হ'য়ে পড়েছে। আমাদের যার যতটুকু ক্ষমতা আছে তাই দিয়েই যেন আমরা উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির চেষ্টা করি। প্রত্যেকের বাড়ীর আনাচে-কানাচে আশেপাশে যেখানে সুযোগ পাই ওদের বসিয়ে কাজকর্ম্মের সুযোগ জুটিয়ে দেওয়া লাগবে। সাধ্যমত এ-বিষয়ে যেন আমরা ত্রুটি না করি। শুধু তোমরা এটা করলে হবে না। দেশে গিয়ে আশপাশের সবার মধ্যেও হাউড় তুলে তাদের দিয়েও এই কাজ করাতে হবে।

জনৈক দাদা—এখন চারিদিকেই তো সঙ্কট, উপায় কী, করব কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Initiation (দীক্ষা) বাড়িয়ে দেও। দাঁড়াও। সংহত হও। সব ism (বাদ) দিয়ে নিজেদের যে সর্ব্বসমস্যা-সমাধানী ism (বাদ) আছে, তাই ধ'রে চল। আসামের হিন্দু, বিহারের হিন্দু, বাংলার হিন্দু, শিখ হিন্দু, বৌদ্ধ হিন্দু, জৈন হিন্দু ইত্যাদির মধ্যে আলাদা করলে চলবে না। আমি শিখ, বৌদ্ধ, জৈনদের হিন্দু বলছি এইজন্য যে এরা কেউ আর্য্যসমাজের বাইরে নয়কো। এরা সবাই আমাদের বান্ধব। মুসলমান-খ্রীষ্টানের সঙ্গেও আমাদের কোন বিরোধ নেই। আমরা সবাই পরমাত্মীয়। আমরা যেন পরস্পর পরস্পরের সহায়-সম্পদ হ'য়ে উঠি। বাস্তবে—সেবায়, সহযোগিতায়, সক্রিয় আলিঙ্গনে। এমনিভাবে চললেই আবার দাঁড়াতে পারব। আমরা করিনি। চলিনি ঠিকপথে। করলে এই disaster (বিপর্য্যয়)-ই হ'তে পারত না।

যোগেনদা (হালদার) একটি বিভেদমূলক কথা বলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে বিরুদ্ধ তাকেও কইতে নেই বিরুদ্ধ। বিরুদ্ধ কইলে ভাবে—আমার তো কান কাটা হয়ে গেছে, এখন আর ভাবনা কি? আমি একহাত নিয়ে ছাড়ব। বরং তার সম্বন্ধে বলতে হয়—ও কিন্তু আমাকে খুব দেখে, খুব করে আমার জন্য। মানুষ যাতে আপন হয় এমনিভাবে চলাবলাই বুদ্ধিমানের কাজ। হীনম্মন্যতাবশে যারা মানুষকে

ক্রমাগত হারায় ও পর ক'রে দেয় তারা হল সেই ধরনের পাগল, যারা নিজের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারে।

প্রফুল্ল—যারা ইষ্টকৃষ্টির বিরোধী চলনে চলে তাদের সঙ্গে তো আপোষ করা চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি নিজের কথাই ধর না কেন, যখন তুমি প্রবৃত্তিবশে অন্যায় কিছু কর, তখন কি তুমি আত্মহত্যা করতে বস, না নিজেকে শোধরাতে চেষ্টা কর? নিজেকে আমরা যেমন স'য়ে-ব'য়ে চলি, অপরকেও যদি তেমন সইতে বইতে না পারি, তাহ'লে কিন্তু সংহতি জিনিসটা সুদূরপরাহত।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে ভোগের পর গোল তাঁবুতে বসে আছেন।

রাত পৌনে এগারটার সময় একজন বিহারী ভদ্রলোক এসে প্রণাম ক'রে জানতে চাইলেন—দাম্পত্য জীবনে অশান্তির কারণ কী? এবং তার সমাধানই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিয়ে ঠিকমতো না হ'লে তার থেকে অনেক সময় দাম্পত্যজীবনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তবে পুরুষের উচিত শ্রদ্ধার্হ চলনে চলা। আর স্ত্রীর ছোটখাট দোষত্রুটি ignore (উপেক্ষা) করতে হয়। স্বামীর চলন যদি এমন হয় যে দশজনে তাকে শ্রদ্ধা করে তখন স্ত্রী তা' দেখেও অনেক সময় অনুগত হয়। তবে এই ধরনের পরিবর্ত্তন হ'তে একটু সময় নেয়। আবার, খারাপের মধ্যে ভাল যতটুকু দেখা যায় তার জন্য স্ত্রীকে প্রশংসা করতে হয় এবং সেটা ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্র।

শরৎদা—পুরুষেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের সাধনা প্রয়োজন। যেমন করেছিলেন শিবাজী রামদাসকে ধ'রে। নচেৎ স্ত্রী তার কাছ থেকে বিহিত শিক্ষালাভ করে না।

উক্ত ভদ্রলোক—আমরা তো সংসারী মানুষ, আমরা কি সে-সব পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংসারী লোকের তো আরও বেশী ক'রে সাধনশীল হওয়া প্রয়োজন। কারণ, সংসারীদের নানা problem (সমস্যা) solve (সমাধান) করা লাগে। নিজের ভিতরে যদি সেই জ্ঞান ও শক্তি না থাকে, তাহ'লে সে ঐ সব দায়িত্ব বহন করবে কীভাবে?

৩০শে চৈত্র, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১৩।৪।১৯৫০)

আজ থেকে ঋত্বিক্-অধিবেশন শুরু হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। যতিবৃন্দ, মন্মথদা (দে), অনিলদা (গাঙ্গুলী), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), সুধীরদা (বিশ্বাস), কিরণদা (মুখার্জী), সুধীরদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ যতি-আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে উপস্থিত।

যতি-আশ্রমের ঘেরার বাইরে অনেকে দাঁড়িয়ে পরম আগ্রহে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করছেন। রোদ উঠে গেছে। তবু অনেকের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সতৃষ্ণ নয়নে শ্রীশ্রীঠাকুরের পানে তাকিয়ে আছেন।

সুধীরদা (গাঙ্গুলী) পূর্ব্ববঙ্গের নানা অত্যাচারের কাহিনী বললেন এবং সেই প্রসঙ্গে বললেন—আমি শত-শত যজন-যাজন-ইষ্টভৃতিপরায়ণ সৎসঙ্গীদের কাছে শুনেছি তারা আপনার দয়ায় কেমন অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার একটা অশেষ দয়া যে সৎসঙ্গীদের খবর যত পাচ্ছি—কারও জীবন বড় যায়নি। আমার মনে হয়, এর থেকে আর দয়াল কাকে ক'ব যিনি এমন ক'রে এতগুলি মানুষকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, এমনতর বোধ-বিবেচনা, বুদ্ধি যুগিয়ে দিয়ে।

বরিশালের জনৈক দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূর্ব্বেই তাঁর অলৌকিকভাবে রক্ষা পাওয়ার কাহিনী শুনিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা সবাইকে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

যতি-আশ্রমের সামনে একদল যুবক জাপানী যুযুৎসু দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তা' দেখে খুব খুশি হলেন। পরে বললেন—এ জিনিসগুলি খুব ভাল। স্কুল-কলেজগুলিতে শেখানো লাগে। গ্রামে-গ্রামেও চারিয়ে দিতে হয়। শুধু একজনই জানলে হয় না, সাধারণের যদি জানা থাকে, তাহ'লেই সুবিধে হয়। কিছু মেয়েরা শিখে নিয়ে অন্যান্য মেয়েদের যদি শেখায় তাহ'লে দুষ্টু লোকে তাদের ক্ষতি করতে পারে না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল।

হরেনদা (ব্যানার্জী), দুলালদা (নাথ), নিশিদা (সোম), বৈদ্যনাথদা (শীল), কেশবদা (রায়) প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসেছেন।

বৈদ্যনাথদা—অনেকে শোনে কিন্তু ধরে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আমাদের কথা এতখানি জীবন্ত নয়, যা' মানুষের মর্ম্মমূলে ঢেউ তোলে।

বৈদ্যনাথদা—এতো তো বলি, তবু লোকের মাথায় যেন ঢোকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঘাযতীনের কথা শুনেছ তো? তিনি দু'মিনিটের মধ্যে মানুষকে বন্ধু ক'রে ফেলতেন। তাঁর ভিতর একটা magnetic charm (চুম্বকীয় আকর্ষণ) ছিল। মানুষ যত আদর্শে সক্রিয়ভাবে তন্ময় হয় ততই অমনতর হয়। আমার ইচ্ছে করে তোমরা ডেমস্থিনিস, বার্ক, সুরেন ব্যানার্জী, বিপিন পাল ইত্যাদির মতো

বক্তৃতা দিতে শেখ। তাদের বক্তৃতার ভিতর-দিয়ে এমন আগুনের ভলকা বেরুতো যে মানুষ পতঙ্গের মতো প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে ছুটে যেত। ভিতরে উদ্দীপনা না থাকলে বাইরে তা' কিন্তু সঞ্চারিত হয় কমই। তবে সাময়িক উচ্ছ্বাস সৃষ্টি খুব একটা বড় কথা নয়। স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করা লাগে। যারা সুনিষ্ঠ তাদের কথায় স্থায়ী প্রভাব হয়। তোমরা সেইভাবে তৈরী হও, যাতে মানুষ তোমাদের কাছে প্রাণ পায়, ত্রাণ পায়।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর আপসোসের সুরে বললেন—আমার মনে হয়, আমাদের উপায় থাকতেও পারলাম না প্রয়োগের অভাবে।

বৈদ্যনাথদা—অনেকে কোন তর্ক করে না। যাজন করলে মন দিয়ে শোনে, কিন্তু দীক্ষা নেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেন স্ট্রেপ্টোমাইসিন resistant (অকার্য্যকারী) হয়, ও অনেকটা সেইরকম। ধর্ম্ম-কথা শুনতে ভালবাসে, কিন্তু ধরা-করার ধার ধারে না। ওদের পিছনে সময় নষ্ট না ক'রে যাদের আগ্রহ আছে তাদের পিছনে খাটা ভাল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত প্রফুল্ল একটা বাণী প'ড়ে শুনাল।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমাদের কথা এত মিষ্টি, উদ্দীপনাময় ও প্রাণকাড়া হওয়া চাই যা' শুনে মানুষের মনে একটা পবিত্র নেশা ধ'রে যায়। কথা মনে-মনে মক্স করতে হয়। কোন্ কথা কেমনভাবে ক'ব তা' মনে-মনে এঁচে নিতে হয়। নিরন্তর তপস্যা চাই। এই ছাড়া অন্য কোন চিন্তা থাকবে না, চাহিদা থাকবে না। তখন পরমপিতা ভিতর থেকে রাশ ঠেলে দেন। কোথা থেকে যে কথা জোগায় তা' ঠাওর পাওয়া যায় না। নিজের কথায় নিজেই অবাক হ'য়ে যেতে হয়। মনে হয়, কে অমন ক'রে কথাটা কওয়াল? তখন ভাবে, পরমপিতাই সব করছেন। যে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র তোমাদের সামনে প'ড়ে আছে, তাতে দশ হাজার অনন্যমনা কর্ম্মী এই কাজে লেগে পড়লেও তাও যথেষ্ট নয়। এইসব কর্ম্মীকে পরিচালনা করার জন্য নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী চাই-ই। শুধু এদেশে নয়, সারা জগতে কাজ করা লাগবে। এদিকে কাজ করলাম, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি জায়গা প'ড়ে থাকল, ও-সব জায়গার মানুষকে ঠিক করা হল না, তাতে কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সমস্ত মানবসমাজকে টেনে তুলতে হবে। ইউরোপ-আমেরিকার বড়-বড় লোকদের মাথাটা এইভাবে ঘুরিয়ে দিতে হবে। সে কাজ করতে পারে তেমনতর মানুষ এখনই সংগ্রহ করা লাগে। কলকাতায় যদি কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী ও পাঁচ হাজার শ্রমণ লাগোয়াভাবে কাজ করে তাহ'লে সারা পৃথিবীতে কাজ শুরু করার ক্ষেত্র রচনা হয়।

নিশিদা—ঠিক কিভাবে বলা লাগে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sentiment (ভাবানুকম্পিতা) উসকিয়ে দিয়ে মানুষকে আগুন ক'রে তুলতে হয়। দেশ ও দুনিয়ার পরিস্থিতি ছবির মতো ক'রে এঁকে দেখাতে হয়। তারপর কওয়া লাগে—এই অবস্থা, কী করতে চাও বল ? কেমনভাবে বাঁচবে ? বাঁচাবে মানুষকে ?—ভাল ক'রে ভেবে দেখ। তোমার কাছ থেকেই জবাব চাই। তুমি কী করতে বল ?

বৈদ্যনাথদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—হিন্দু যুবকরা সাধারণতঃ গোঁড়ামি জিনিসটা পছন্দ করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোঁড়ামি যদি না থাকে তবে আত্মরক্ষা কঠিন হয়। শরীরে যদি চামড়ার আবরণ না থাকে তাহ'লে শরীরে পোকা পড়ে, তা' পচে যায়। আমরাও আজ তাই যাচ্ছি। আমি বলি, তুমি উদার হও, কিন্তু কৃষ্টিতে গোঁড়া থেকো। নইলে সত্তাই থাকবে না। সুকেন্দ্রিক হবার কথা আজকাল মনোবিজ্ঞানেও বলে। সুকেন্দ্রিকতা ও নিষ্ঠা চাই-ই। এর জন্য একজন মানুষ লাগে। শুধু একটা ভাব বা ধারণায় মানুষ সুকেন্দ্রিক হ'তে পারে না।

১লা বৈশাখ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১৪।৪।১৯৫০)

সহস্র-সহস্র ভক্তের সমাবেশ হয়েছে আশ্রম প্রাঙ্গণে। নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে সবাই সমবেত হয়েছেন তাঁদের প্রিয়পরম শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন ক'রে, প্রণাম ক'রে, অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে, তাঁর শ্রীমুখের বাণী শুনে ধন্য হবার উদগ্র আগ্রহে। প্রথমে বিনতি-প্রার্থনাদি সম্পন্ন হল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে তাঁর অপরূপ ভঙ্গীতে বললেন—

আমার একান্ত প্রার্থনা—তোমরা সুখে, স্বস্তির সহিত সুস্থ দেহে সুদীর্ঘ জীবন লাভ কর। আমি দেখতে চাই—তোমরা সুখে আছ, সুস্থ আছ, সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে তাঁর পথে চলেছ, অচ্যুত আগ্রহে।

তোমরা ঈশ্বরকে দ্বন্দ্বী ভাবতে যেও না। নিজের প্রাণের মতো অন্যের প্রাণকে দেখো, ভালবেসো। কাউকে কখনও অত্যাচার ক'রো না, বরং যারা অত্যাচারিত হয়, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সুখী, স্বস্থ, সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল। যারা দুঃস্থ, বিপন্ন, নিরাশ্রয় তাদের ভরসা ও আশ্রয় হ'রে ওঠ, তাদের স্বস্তি দাও, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তোল। অন্যের অনিচ্ছায় তার এক কণাও নিতে যেও না। বরং তোমাদের সেবা-সাহায্যে প্রত্যেককে উচ্ছল ক'রে তোল, আর প্রীতির সঙ্গে যদি কেউ দেয় এবং তুমি গ্রহণ না করলে ক্ষুন্ন হয়, সেক্ষেত্রে তা' নিও।

ব্যভিচার করতে যেও না, ব্যভিচার মানুষকে ভগবান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। নিজের প্রাণের মতো ক'রে পরিবেশকে ভালবেসো। অন্যের সুষ্ঠুত্ব যাতে বজায় থাকে তার এতটুকু ত্রুটি ক'রো না। জেনো, অন্যের ভাল করাটাই তোমাদের স্বার্থ।

তোমরা ঈশ্বরের পথে তপপ্রাণ হ'য়ে চল—ইষ্টে অচ্যুত এবং সুনিষ্ঠ হ'য়ে। তোমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ যেন এমন হয়—যা' তাঁর পথে এগিয়ে নিয়ে যায় সপারিপার্শ্বিক তোমাদিগকে। প্রতিপ্রত্যেককে তা' যেন সুখে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে।—তারা যেন জীবনে, যশে, জয়ে উদীয়মান হ'য়ে চলে। তোমরা যদি সুখে থাক, ভাল থাক, অভ্যুদয়ী হও, তাহ'লেই আমি সুখী হব, ভাল থাকব। আর, তোমরা যদি বিকেন্দ্রিক চলনে চ'লে কষ্ট পাও, দুঃখে পড়, তাতে আমি প্রাণে বড় ব্যথা পাব।

আবার বলছি—তোমরা সুখে থাক, রোগ-বালাই, আপদ-বিপদ-মুক্ত হও, সুদীর্ঘজীবী হও এবং অন্য সবাই যাতে সুখে থাকে, সুস্থ থাকে, সুদীর্ঘজীবী হয়—তাই কর।

যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি প্রত্যেকেরই করণীয়। তোমরা সকাল-সন্ধ্যা আহ্নিকে বসবে নিয়মিতভাবে এবং তাঁকে রোজ কিছু-না-কিছু নিবেদন করবেই—এটা মানুষকে সুস্থ, সংহত ও পবিত্র ক'রে তোলে।

আমাদের প্রত্যেকেরই করণীয় যাতে লোকজন কষ্ট না পায়, প্রাণ না হারায় এবং মানুষের হিংসাভাজন হ'য়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে না হয় কাউকেও।

কৃষ্টিবান্ধবের কথা তোমাদের বলেছি—যার ভিতর-দিয়ে আমাদের কৃষ্টি-তাৎপর্য্য সর্ব্বত্র সঞ্চারিত ক'রে আমরা সমৃদ্ধ হ'তে পারি, সুস্থ হ'তে পারি, সন্দীপ্ত হ'য়ে শক্তির পথে চলতে পারি।

রানাঘাটে যে কলোনী হবার কথা সেটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার ব্যবস্থা করা ভাল। ওটা হলে একটা বাসস্থান হয় এবং সকলের ব্যবস্থা করা যায়—একটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র জীবন নিয়ে।

দীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। যত বেশী লোককে ব্যাপকভাবে দীক্ষায় অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে পারব, সংহতি-সহযোগিতা তত বেড়ে যাবে এবং পরস্পরের সাহায্যে আমরা উন্নতও হ'তে পারব ততখানি। দীক্ষাই হল সেই ভিত্তি যার উপর দাঁড়িয়ে নিজেরা বাঁচতে পারব, বাড়তে পারব এবং বাঁচাতে পারব, বাড়িয়ে তুলতে পারব সকলকে, সর্বদিক দিয়ে।

যা' বললাম, তা' সবার পক্ষেই করণীয়। তাছাড়া মায়েদেরও কর্ত্তব্য আছে। তাদের উপর দাঁড়িয়েই দুনিয়াটা চলছে, তারাই ধ'রে রেখেছে সকলকে। তারা

যদি সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের সকলকে সুস্থ, উদ্দীপ্ত ও সম্বর্ধনমুখর ক'রে তোলার শিক্ষায় সুশিক্ষিত হ'য়ে তদনুপাতিক বিহিত চলনায় না চলে, সকলেই কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু, দুর্ব্বল হ'য়ে উঠবে।

লোকসেবার জন্য স্বস্তিবাহিনী দরকার। যারা আত্মত্যাগ ক'রে মানুষের মঙ্গলের জন্য আত্মনিয়োগ করবে। তাদের কাজ হবে স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, নিরাপত্তা। এদের সেবার উপর দাঁড়িয়ে জনগণ সুখ, সোয়াস্তি ও সর্ব্বতোমুখী ঋদ্ধির সন্ধান পাবে।

আমার এই আবেদন তোমাদের কাছে—পরমপিতায় আত্মনিবেদন ক'রে এগিয়ে চল সবাই তাঁর পথে। তাঁতে প্রণত থেকে, তাঁর জয়গান গেয়ে, আনন্দ পেয়ে, আনন্দ দিয়ে, ধন্য হ'য়ে ধন্য করতে পার যাতে সকলকে তার এতটুকু ত্রুটি ক'রো না।

২রা বৈশাখ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং। ১৫। ৪। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। প্রসন্ন প্রশান্ত মনে ব'সে করুণা-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যতি-আশ্রমের বেড়ার বাইরে দাডায়মান দাদা ও মায়েদের দেখছেন। মাঝে-মাঝে হাসছেন এবং তা' দেখে সকলেই পুলকিত হ'য়ে উঠছেন। যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের কাউকে-কাউকে ডাকছেন এবং বিশেষ-বিশেষ কথা ব'লে দিচ্ছেন। দাদাদের মধ্যে যাদের প্রয়োজন এক-এক ক'রে তাঁরাও যতি-আশ্রমে এসে নিজেদের সমস্যা নিবেদন ক'রে সমাধান নিয়ে যাচ্ছেন।

করুণাদা (মুখার্জী) এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দীক্ষিতের সংখ্যা দেদার বাড়িয়ে তোল।

করুণাদা—আপনি যা' চান সে তুলনায় আমাদের সংখ্যা তো খুব কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে ঝাঁকি মেরে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে বললেন—কম থাকবা কেন? কম থাকলে আর নিস্তার নেই। (দক্ষিণ হস্তখানি প্রসারিত ক'রে বললেন)—যজন, যাজন ও দীক্ষার উৎসব লাগিয়ে দাও। এমন হবে যেন—

'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।'

প্রাণ দেওয়া বলতে আমি বুঝি প্রাণ ঢেলে এই কাজ করা।

করুণাদা—আশীর্ব্বাদ করুন যেন পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর আহ্লাদ-অধীর আবেগে বললেন—আশীর্ব্বাদ কেন, আমার সহায়, সম্পদ, বল, বীর্য্য সবই তোরা। ভগবানের কাছে সবসময়ই প্রার্থনা করি—তোমরা

কৃতী হও, কৃতার্থ হও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ে। তোমরা কেউ কম নও। তাই কম নিয়ে সন্তুষ্ট থেকো না। সারা দুনিয়ায় পরমপিতার আসন বিছিয়ে ফেল।

জগজ্জ্যোতিদা (সেন) বললেন—আমাদের এখন সংগঠিতভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে সদ্য আগত উদ্বাস্তুদের সেবা করা প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা তা' করছে তারা করুক। তোমরা প্রত্যেকের কাছে ঘোরা-ফেরা কর, তাদের খোঁজখবর নাও। আশা, ভরসা ও উদ্দীপনা দাও। এইদিককার লোকজনের সাহায্যে ওদের কাজে-কর্ম্মে লাগিয়ে যাতে দাঁড় করিয়ে দিতে পার তাই কর।

জগজ্জ্যোতিদা—ভালভাবে relief (সাহায্য) দিলে তাতে জনসাধারণও সৎসঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা চাই মানুষের অন্তঃকরণে চিরতরে এমন একটা ছাপ ফেলাতে, যাতে তা' কোনদিন মুছে না যায়, এবং তা' মানুষের মগজে গাঁথা থেকে তাদিগকে মাঙ্গলিক অভিগমনে নিরন্তর ক'রে তোলে। লোকের মুখে যেন শুনতে পাই জগজ্জ্যোতিদা, হীরালালদা আমাদের জীবনের পথ দেখিয়ে বাঁচিয়ে দিল। তোমরা যদি আগ্রহ-আতুর হয়ে ওদের বুকে তুলে নাও, খুদ-কুঁড়ো যা' জোটে তাই দিয়ে বিপন্নদের পালন কর, পোষণ কর, প্রবুদ্ধ কর, তাহ'লেই বড় জিনিস হয়। সবচেয়ে বড় জিনিস যা কিনা integrating leaven, crystalising leaven (সংহতি-সন্দীপী দম্বল, দানা বাঁধার সূত্র) তা' হ'ল ঐ দীক্ষা।

জগজ্জ্যোতিদা—আজ মানুষের খুবই দুরবস্থা। তাদের পক্ষে প্রাণে বাঁচাই দায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা প্রাণীকেও মরতে দিও না। তোমাদের আয়ত্তে যতদূর আছে, করার ত্রুটি করো না। যমের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কর তোমরা। "মারি অরি পারি যে কৌশলে"।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—উদ্বাস্তুদের উচিত জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের দয়া আকর্ষণ করতে চেষ্টা করা। এদের সব যেয়ে থাকতে পারে: কিন্তু চরিত্র যদি থাকে, ক'রে দাঁড়াবার বুদ্ধি থাকে, সেবাপ্রাণতা যদি থাকে, তাহ'লে কোন ভাবনা নেই। অবশ্য স্বাস্থ্য ঠিক রাখা লাগে। কিন্তু মহৎ সম্বেগ যাদের অন্তরকে উদ্বেলিত ক'রে তোলে, তাদের জীবনীশক্তিও সব অবস্থার ভিতর উদ্বর্দ্ধনমুখর হ'য়ে চলে। এদের ভাল ক'রে ব'লে দেবে যাতে এদের ব্যবহার সহৃদয় ও চিত্তাকর্ষক হয় তাহ'লে অন্যেও স্বতঃই তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে। সরকারের দিকে, তাকিয়ে থাকলে তাদের যোগ্যতা কিন্তু ক'মে যাবে। সৎসঙ্গীদের

প্রত্যেককে ব'লে দেবে যাতে তারা ইষ্টভৃতির কোন ব্যত্যয় না করে। আর অন্যদের বলবে, তারা যেন শ্রেয়জনকে রোজ কিছু-না-কিছু দেয়ই। কারও মধ্যে দেওয়ার ধাম্ধা যদি ঢুকিয়ে দিতে পার, তাহ'লে তার জন্য তোমার আর চিন্তার কোন কারণ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা সাড়ে এগারটার সময় বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে বিভূতিদা (মিশ্র)-কে ঋত্বিকের পাঞ্জা দেবার সময় ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—সত্যিকার ঋত্বিক হওয়া চাই—কথায়, চলনে, চরিত্রে, আচারে, ব্যবহারে। আমাদের ঋত্বিকের সম্বন্ধে এমন সশ্রদ্ধ ধারণা ছিল যে একজন ঋত্বিক গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চ'লে গেলে মানুষ সেই রাস্তার ধূলি মাথায় তুলে নিয়ে কৃতার্থ বোধ করত। তোমাদের দেখে মানুষের মধ্যে আবার যেন সেইরকম শ্রদ্ধার উদ্বোধন হয়। দেশের সব কালো যেন আলো হ'য়ে ফুটে ওঠে তোমাদের প্রভাবে।

যামিনীদা (রায়চৌধুরী)—আপনি যেমনটা চান তেমনটা হচ্ছে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা চাস যে কাজটা আপসে আপ হয়ে যাক। তুইই যে হওয়ানোর জন্য দায়ী, সেইভাবে নিজে দাঁড়াস না ব'লে পারিস না। প্রায় সবারই ঐ ভাব। আমরা ভগবানকে দায়ী করতে চাই। নিজেরা করার দায়িত্ব নিতে চাই না। আমাদের ভাবখানা এইরকম, বাপ যখন জন্ম দিয়েছে সে বরাবর খেতে দেবে না কেন? বাবাকে বহন করার দায়িত্ব যে আমাদের, সাবালক হওয়া সত্ত্বেও সেটা আমাদের মাথায় ঢোকে না। তাই শক্তি গজায় না।

অল্প সময় চুপ ক'রে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যেমন ক'রে তোমাদের কইছি তাতে তোমাদের চোখের ঠুলি এতদিনে খুলে যাওয়া উচিত ছিল। ঠুলি বন্ধ থাকে—এমনতর অবকাশ আমি রাখিনি। আমার সাধ্যে যতদূর কুলায়—rationally explain (যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা) ক'রে বলেছি। সব জেনেবুঝেও যদি না করি তাহ'লে উপায় কী?

যামিনীদা—অনেক সময় অভাবের মধ্যে প'ড়ে যাই। ট্রামের পয়সাটা কিভাবে জুটবে ভেবে পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে তোমরা দেও কেন? আমি কি চাই? তোমাদের দিয়ে ভাল লাগে তাই দেও। আমি বলি—তোমাদেরও তেমন হবে না কেন? লোকে দিয়ে বর্ত্তে যাবে না কেন? ট্রামের পয়সার কথা ভাব, কিন্তু ট্রাম-কোম্পানীর লোক নিজের গাঁটের পয়সা খরচা ক'রে তোমাকে ট্রামে চড়িয়ে ধন্য হবে না কেন? তোমার মধ্যে সেই জেল্লা ফুটলে দেখবে মানুষ তোমাকে দেবার জন্য পাগল হয়ে উঠবে। ভাবে এতখানি ভরপুর থাকতে হয় যাতে অভাব-বোধ মনকে স্পর্শ করতে

না পারে। ঐভাবে যারা মাতোয়ারা হ'য়ে থাকে এবং মাতোয়ারা ক'রে তোলে মানুষকে, তাদের কখনও অভাব হয় না। কলকাতায় পড়ার সময় কুলিদের ওষুধপত্র দিতাম। কিছু চাইতাম না। তারা খুশি হ'য়ে কিছু দিলে নিতাম। আর, মাঝে-মাঝে ওদের প্রয়োজন বুঝে জামা, কাপড়, গেঞ্জি ইত্যাদি কিনে দিতাম। তখন ওরা যে আমার জন্য কী করত আর না করত ব'লে বোঝাতে পারব না। অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি থাকলে সে মানুষ মানুষের রাজা হবেই। আর, মানুষের রাজা যে, সে যে সম্পদশালী তা' অতি নিশ্চয়।

সুশীলাদি (হালদার)—আপনার সঙ্গে কি মানুষের তুলনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর রাগতভাবে বললেন—তার মানে, কথা শুনে-বুঝেও করবা না সেই বুদ্ধি। তাই আমাকে ঠাকুর বা ভগবান একটা কিছু ব'লে ফাঁকি দেবার ও একটা কায়দা। নিজেদের দুর্ব্বলতা সমর্থন ক'রো না। তোমাদের মধ্যেও পরমপিতা কম ক'রে কিছু দেননি। অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে শক্তি জাগাও। নইলে আমাকে ঠাকুর বলা আমার কাছে insulting (অবমাননাকর) লাগে। আমাকে ঠাকুর বলা তখনই সার্থক হবে যখনই তোমাদের ভিতরের ঠাকুরকে জাগিয়ে তুলবে।

যামিনীদা—এখন মানুষের বাঁচাই তো দায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি বল? আশ্চর্য্য এই যে অনেক হোমরা-চোমরাদের বাঁচা আজ বিপন্ন হলেও তোমাদের বাঁচা কিন্তু আজও বিপন্ন হয়নি। তোমরা আজও লাটসাহেবের মত চলছ। এটা পরমপিতার দয়া আর তোমরা সামান্য যা' করেছ তার ফল। ঠিকমত করলে তো কথাই ছিল না।

৩রা বৈশাখ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ১৬।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

একজন বহিরাগত ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার শিষ্যরা বলেন, আপনি সবার সব সমস্যার সমাধান দিতে পারেন। সে-কথা কি ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো আমি বলতে পারি না। যারা বলে তারা জানে। তবে আমি যা' বুঝি তা' বলি এবং যা' আমি বলি তা' আমি নিজ অভিজ্ঞতা ও অনুভবের উপর দাঁড়িয়েই বলি।

উক্ত ভদ্রলোক—অর্থনৈতিক সমস্যা তো আজ একটা প্রধান সমস্যা। অর্থ না হ'লে তো চলে না। তার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থ ছাড়া চলার উপায় নেই। কিন্তু অর্থ নির্ভর করে কিসের উপর? আমি তো বুঝি, যেখানে সুগঠিত সেবাপ্রাণ চরিত্র ও বিহিত করা আছে,

অর্থ সেখানেই হাজির হয় হাসিমুখে। অর্থের পিছনে ছুটলে অর্থ পাওয়া যায় না। অর্থ আসে প্রয়োজনপূরণ ও সেবার পিছু পিছু। আমি বুঝি, স্বভাবগুণে অভাব নষ্ট, এটা কিন্তু খাঁটি স্পষ্ট। আমরা শ্রমকাতর। উপচয়ী অর্জ্জী নই, আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য নেই, নিজেদের adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে চলতে পারি না। তাই আমরা স্বাধীনভাবে কিছু ক'রে দাঁড়াতে পারি না। আর, আমাদের শিক্ষাটাই এমন যে আমরা আয় করার কথা ভাবতে গিয়েই চাকরীর কথা ভাবি। চাকর চাকরই। সে যত উঁচু মেকদারের চাকর হোক না কেন। স্বাধীন উপার্জ্জন-বুদ্ধির দিকে যতদিন আমাদের নজর না যাবে ততদিন আমাদের দৈন্য ঘুচবে না। অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের মূলে থাকে চারিত্রিক দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য দূরীকরণে মনোযোগী হ'লে আর্থিক দারিদ্র্য আপনা থেকেই দূর হবে।

উক্ত ভদ্রলোক—আমাদের এমনতর জায়গায় দীক্ষা নেওয়া উচিত যেখানকার নির্দ্দেশ অক্লেশে পালন করতে পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের চাহিদাটা সবসময় শুদ্ধ নয়। আমরা চাই আমাদের মনোমতভাবে ধর্ম্মাচরণ করতে। অর্থাৎ নিজের মনকে গুরু মেনে চলাই আমাদের ইচ্ছা। তাতে মনের থেকে ত্রাণ হবে কি ক'রে? মনের বন্ধতার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে হবে। তাই দীক্ষা নিতে গেলে নিতে হবে এমন জায়গায় যিনি বন্ধনের ঊর্দ্ধে অর্থাৎ মুক্ত মানুষ। তিনি যা' নির্দ্দেশ দেন তা' পালন করা কঠিন হ'লেও জোর ক'রে তাই করতে হবে। নইলে আমাদের ব্যাধি ও বন্ধনের নিরাকরণ হবে না। আমরা যখন সাঁতার শিখি, তখন জলে নেমেই তা' শিখতে হবে। ডাঙায় সাঁতার শেখা যাবে না। সাঁতার শিখতে গেলে দুই-এক ঢোক জলও খাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অবশ্য, কারও বা হয়তো জল খাওয়া নাও লাগতে পারে, সে স্বতন্ত্র কথা। তাই, ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ ক'রে তপঃপ্রাণ হ'য়ে চলতে হবে। ভুল হ'লে সংশোধন করা লাগবে। হয়তো আবার ভুল হবে। তখন আবার সংশোধন করা লাগবে—তাঁর নির্দ্দেশমত। গুরু যদি বেত্তা না হন, আচরণসিদ্ধ আচার্য্য না হন, তাহ'লে তিনি কিন্তু আমাদের ঠিকমত guide (পরিচালনা) করতে পারেন না। গুরুর একটা complex (প্রবৃত্তি)-ও যদি unadjusted থাকে তবে তার দ্বারা তার যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান ও গুণ রঙ্গিন হ'য়ে ওঠে। তাই তিনি যা-কিছু বলেন, তার মধ্যে নিরঞ্জন সত্যের আলো উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে কমই।

উক্ত ভদ্রলোক—অনেকে বলেন, প্রত্যেকের একটা কুলগত বৈশিষ্ট্য আছে। তাই কুলগুরুর নাম নেওয়াই ঠিক। এখানকার দীক্ষার কি সেইরকম ব্যবস্থা আছে যাতে প্রত্যেকের কুলগত বৈশিষ্ট্যের পূরণ হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে যে-মন্ত্র পাওয়া যাবে, তাতে যার যে-ভাব, যার যে-বৈশিষ্ট্য তাই পরিপূরিত হবে। সেইজন্য একে কয় সৎমন্ত্র। কেউ যদি অন্যত্র দীক্ষা নিয়েও থাকে তাহ'লেও তার এই মন্ত্র গ্রহণ করা ভাল। আগে সেইটা ক'রে তারপর এইটা করলে পুরশ্চরণের মত কাজ হবে। সে সাধনজীবনে ক্রমাগত অগ্রসর হ'তে পারবে। এখানে দীক্ষা নিতে গেলে আগের দীক্ষা ছাড়া লাগে না। তাই গুরুত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না। কোন দীক্ষিত ব্যক্তি এখানে দীক্ষা নিয়ে যেমন ইষ্টভৃতি করবে, তেমনি পূর্ব্বে যেখানে দীক্ষা পেয়েছিল তাকেও মাঝে-মাঝে কিছু দেবে। এমন ঘটনাও শুনেছি যে সৎসঙ্গে দীক্ষা নেবার কথা শুনে একজনের আগের গুরু তার উপর খুব চটে গেলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তিনি ঐ শিষ্যের মধ্যে অভাবনীয় শ্রদ্ধা-ভক্তির নিদর্শন দেখে বললেন--তুমি তো আগে আমার জন্য এতখানি করতে না, এখন তোমার মধ্যে এই ভাব আসল কোথা থেকে? সে বলল—আপনার জন্য কিছু করলে আমার ঠাকুর খুশি হবেন। তাই আমি যতটুকু পারি করি। গুরু তখন বললেন—তাই নাকি? তবে আমি কি দীক্ষিত হ'তে পারি? শিষ্য তখন বলল—আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন। এইভাবে শিষ্যের প্রভাবে কোন-কোন গুরুর এখানে দীক্ষা গ্রহণ করার কথা শুনেছি।

উক্ত ভদ্রলোক—গুরুর নাকি নিত্য প্রত্যেকটি শিষ্যের হ'য়ে তার করণীয় নাম জপ করতে হয়? তাই বহু শিষ্য করলে কোন গুরুর পক্ষে তা' করা কি সম্ভব হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণভাবে এই কথা চলতে পারে। কিন্তু যুগপ্রবর্ত্তক যাঁরা তাঁদের অন্য কথা। তাঁদের নিয়েই পরবর্ত্তী যুগ চলে। শুনেছি যাজ্ঞবল্ক্যের ষাট হাজার শিষ্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণের এত শিষ্য যে গোনাগুনতি নেই। রামদাসের শিষ্যরা এত বিপুল সংখ্যক ছিল যে মোঘলদের কাবু ক'রে দিল। যুগপ্রবর্ত্তক যাঁরা, তাঁরা আসেন সমাজের উদ্ধারের জন্য এবং ব্যাপক দীক্ষা না হ'লে তাঁদের ধারাটা প্রবর্ত্তন করা মুশকিল হয়। তবে যারা দীক্ষিত হয় তাদের পিছনে খবরদারী করার জন্য বহু কর্ম্মী চাই, যারা পিছনে লেগে থেকে তাদের তপস্যাপরায়ণ ক'রে তুলতে চেষ্টা করবে। শুধু নাম দিয়েই ছেড়ে দিলাম, তাতে হয় না। আর, যাজন যদি নিত্যকরণীয় হয় এবং তা' যদি কেউ করে তাকে বাধ্য হ'য়ে কিছুটা যজন করতে হয়। নইলে, যাজন করার সম্বেগ ও সম্বল দুইই ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে। যাজন একটা মস্ত জিনিস। গীতায় আছে—'যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।' (আমাকে যারা যাজন করে, তারা আমাকে পায়।)। যেখানে মানুষ যাজনশীল নয় সেখানে ধর্ম্মপ্রাণতা দিন-দিন স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়। পারিবারিক জীবনে পর্য্যন্ত যজন-যাজনের আবহাওয়া সৃষ্টি করা দরকার।

বর্ধমানের জনৈক দাদা বললেন—আমার বয়স হয়েছে, শরীর ভাল না, তাই একাগ্রমনে করণীয় নাম-ধ্যান করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একাগ্রমনের কথা ছেড়ে দেন। একাগ্রতার কথা যত ভাবা যায়, একাগ্রতা তত অসম্ভব হয়ে ওঠে। বরং আগ্রহ-উদ্দীপ্ত মন নিয়ে করবেন, তাতে আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার মন একাগ্র হ'য়ে উঠবে। 'হরিসে মন রহ রে লাগি।'

উক্ত দাদা—আমি ব'সে কোন কাজে মনোনিবেশ করতে পারি না, মনোনিবেশ করতে গেলেই দাঁড়িয়ে করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি বসে করতে পারেন, শুয়ে করতে পারেন, দাঁড়িয়ে করতে পারেন। যেমন আপনার সুবিধে।

কলকাতার জনৈক হরিপদদা দৌড়ে প্রথম হওয়ায় একটা সুন্দর বড় তোয়ালে পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি উক্ত তোয়ালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিয়ে দৌড়ের বৃত্তান্ত বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত সবাইকে বললেন—ও দৌড়ে এই তোয়ালেটা প্রাইজ পেয়ে আমার জন্য নিয়ে এসেছে। এরকম জিনিস আমার খুব ভাল লাগে।

হরিপদদা যাবার অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তুই দৌড়িয়ে অতখানি করেছিস, দেখি স্থির হ'য়ে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারিস! অনেকক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও একটা শক্তি লাগে। যে দৌড় ও দাঁড়ান দুটোতেই পটু হয়, তার পক্ষে দৌড় ও দাঁড়ান পরিপূরক হ'য়ে ওঠে।

রামদা (দাস) বললেন—ঠাকুর, আমি বহু অন্যায় করেছি, আমার উপায় কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার অন্যায় করার শক্তি আছে, তার ন্যায় করারও শক্তি থাকে। সেইভাবে সেইপথে চল। অন্যায় সম্বন্ধে যখন সচেতন হয়েছ, অনুতপ্ত হয়েছ, তখন আর ভাবনা কী!

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন।

সেখানে তারকদা (ব্যানার্জী), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), চারুদা (করণ), হীরালালদা (চক্রবর্তী), নিরাপদদা (পান্ডা), গুরুদাসদা (ব্যানার্জী), শৈলেনদা (ব্যানার্জী), অমলেন্দুদা (ব্যানার্জী), মনোরঞ্জনদা (চ্যাটার্জী), জিতেনদা (রায়), মনোরঞ্জনদা (ব্যানার্জী), হীরেনদা (ঘোষ), ধীরেনদা (ভট্টাচার্য), হরিচরণদা (গাঙ্গুলী), শম্ভুদা (সাহা), শীতলদা (চক্রবর্ত্তী), বিশ্বরঞ্জনদা (কর),

বীরেনদা (ধর), হরেনদা (রক্ষিত), গিরীনদা (চ্যাটার্জী), জগৎদা (চক্রবর্ত্তী), বিনোদদা (মুন্সী), অমৃতদা (হালদার), ব্রজেনদা (ঘোষ), কুমুদদা (দাস-পুরকায়স্থ), গোপেনদা (রায়) প্রমুখ বহু কর্ম্মী উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের কাছে উদ্বাস্তুদের সর্ব্বপ্রকারে সেবা ও সাহায্য করার কথা বললেন।

সেইপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সৎসঙ্গীরা সর্ব্বত্র আছে। তাই প্রাদেশিকতা প্রশ্রয় পায় এমনতর কোন কথা বা আচরণ সম্বন্ধে আমাদের সাবধান হওয়া লাগবে। পরস্পরের মধ্যে মিলন যাতে হয় তাই করাই উচিত। এদেশের অনেক মুসলমান আছে যারা পছন্দ করে না যে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়। তাদের কাছে গিয়ে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যাপারে যদি ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতে পার, তাদের সহযোগিতা পাওয়া অসম্ভব নয়। তোদের এমনভাবে কাজ করা দরকার যাতে একটা common platform (অভিন্ন মঞ্চ) তৈরী হয়, যেখানে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ভাষা নিয়ে গোলমাল, কিংবা কোন প্রকারের সঙ্কীর্ণতা ঠাঁই না পায়।

৪ঠা বৈশাখ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ১৭।৪।১৯৫০)

বেলা গোটা দশেকের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে বিভিন্ন কর্ম্মীর ব্যক্তিগত নানা সমস্যার কথা শুনছিলেন। যাদের ব্যক্তিগত গোপন কথা ছিল তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় অন্য সবাই বাইরে অপেক্ষা করছিলেন।

পরে পঞ্চাননদা (সরকার)-র সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের অহং ষড়্‌রিপুর এক-একটি কুঠুরির মধ্যে আবদ্ধ থেকে পরস্পরবিরোধী আচরণ করে। আর, প্রবৃত্তিগুলির দ্বারা রঞ্জিত হওয়ায় সব-কিছুকে বৃত্তিরঙ্গিল ছন্দে গ্রহণ করে। এবং যা' কিছুতে প্রতিক্রিয়াও করে যখন যে প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় তারই রকমে। ফলকথা, কোন মানুষ প্রবৃত্তিপরায়ণ হ'লে জগতের কোন জিনিসকেই যথাযথভাবে দেখতে ও বুঝতে পারে না। এবং মানুষের সঙ্গে তাদের ব্যবহারও সহজ, শুদ্ধ ও স্বাভাবিক হয় কমই। এইভাবে যত চলে, তত প্রবৃত্তির বন্ধন পাকা হয়। প্রবৃত্তিগুলির গোলকধাঁধার মধ্যে ঘোরে সে। তার মধ্যে থেকে বেরোতে পারে না। তাই চলনার মধ্যে ক্রমাগত অসঙ্গতি হ'তে থাকে। আর যখনই কেউ সেটা ধরিয়ে দেয়, তখনই প্রবৃত্তির অনুকূলে তার যুক্তিকে লাগিয়ে নিজের ভুলকেই সমর্থন করে। এইভাবে তার প্রতি মুহূর্ত্তের চলনা সত্তাবিরোধী রকমে চলে। সে অনেক কিছু জানতে পারে কিন্তু সেগুলির মধ্যে কোন meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হয় না। তার ব্যুৎপত্তিও হয় প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট। এর ফলে

সে নিজের বা অপরের প্রতি justice (ন্যায়সঙ্গত আচরণ) করতে পারে কমই। কারণ, এক-এক সময় এক-এক বৃত্তিই হয় তার চালক। বৃত্তিগুলি সত্তার শক্তি চুরি ক'রে নিয়ে নিজেরাই যেন সত্তা, এমনতরভাবে চলে। এই ধরনের মানুষ কখনও বুঝতে পারে না যে তার সাত্বত স্বার্থ কী? মায়া-মোহ তাকে যেভাবে চালায় সেইভাবেই চলে সে। হয়তো তার স্ত্রীর গহনা করবার বেলায় টাকা জোটে, কিন্তু বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য একটু দুধ জোগাড় করার বেলায় অভাবের অজুহাত দেয়। এর একমাত্র ওষুধ হ'ল, অচ্যুতভাবে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়া। তখন তার জীবনের কেন্দ্রই হন ইষ্ট। আর প্রতি মুহূর্ত্তের বিবেচনাই হয়, তিনি কী চান, তিনি কিসে খুশি হবেন। এই আগ্রহ-আকুল চিন্তা ও বিচার-বিবেচনা যদি কাউকে পেয়ে বসে তাহ'লে সে নিজের বা অপরের সাত্বত স্বার্থকে কখনও ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। জানে, তেমন কিছু করলে ইষ্টই ব্যথা পাবেন। এইভাবে চলতে-চলতে সুনিষ্ঠ ইষ্ট-চেতনা তার শরীরের প্রত্যেকটা cell (কোষ)-এর মধ্যে ঢুকে যায়। তাকে যদি কেটেও ফেলা যায়, তখন তার মাংসখণ্ডগুলিও যতক্ষণ তাজা থাকে ততক্ষণ ইষ্টনিষ্ঠার অনুকূলেই আচরণ করে। মানুষের আত্মা যেমন অমর, নিষ্ঠাও তেমনি অমর। আমরা যে অমৃত-অমৃত করি, তার চাবিকাঠি হ'ল ইষ্টনিষ্ঠা। ইষ্টনিষ্ঠা যেই একজনকে পেয়ে বসে, তখন এক-একটা প্রবৃত্তির সিন্দুকের ডালা খুলে যেতে থাকে এবং বিভিন্ন প্রবৃত্তি ইষ্টমুখী অর্থাৎ একমুখী হ'তে থাকে। তখন বোঝা যায় কামের স্বরূপ কী, ক্রোধের স্বরূপ কী, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্যের স্বরূপ কী! এবং এগুলির প্রত্যেকটির সপরিবেশ নিজের সত্তাপোষণী বিনিয়োগ করা যায় কিভাবে। তখন মানুষ প্রবৃত্তির হাতে গিয়ে পড়ে না, বরং প্রবৃত্তিগুলি তার হাতে খেলার পুতুলের মত হ'য়ে দাঁড়ায়। বেফাঁস চলন বন্ধ হ'য়ে যায়। এইভাবে মানুষের ভিতরে অখণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। সে প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠে। বোধিসত্ত্ব হ'য়ে ওঠে।

পঞ্চাননদা—তাঁকে ভালবাসা সত্ত্বেও তো আমরা প্রবৃত্তির হাত থেকে রেহাই পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হনুমান মস্তিত্ব পাবার লোভে রামচন্দ্রের কাছে এসেছিল। কিন্তু পরে রামচন্দ্রকে এমন ভালবেসে ফেলল যে তার সব লোভ তুচ্ছ হ'য়ে গেল। এইটে দরকার। ইষ্টকে খুশি করাই আমার একমাত্র সুখ—এমনটা যদি হ'য়ে দাঁড়ায় তাহ'লেই বাঁচোয়া। শুধু কর্ত্তব্যবোধ থেকে যারা ইষ্টের আদেশ পালন করতে যায়, হয়তো কোন প্রবৃত্তির টানে সে কর্ত্তব্যবোধ ছুটে যেতে পারে। কিন্তু ইষ্ট যদি হন নেশার বস্তু, তাঁকে নাহ'লে আমার প্রাণ বাঁচে না, এমনতর যদি হয়, তাহ'লে

আর ভাবনা নেই। অনেকে আমাকে ভালবাসে, তাদের ego (অহং) আমাকে দিয়ে পরিপোষিত হয় বলে। আমি তারিফ করি বলে। দশের কাছে তাকে তুলে ধরি বলে। তাই তার এই প্রত্যাশায় আঘাত লাগলে পীরিত ছুটে যেতে পারে। ধরেন, একজন তার স্ত্রীকে ভালবাসে তার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় বলে। ধীরে-ধীরে ঐ স্ত্রীর উপর সত্যিকার টান যদি হয় এবং তার ভালর জন্য যদি যৌন-সংস্রব ত্যাগ করা প্রয়োজন হয় তাহ'লে সে কিন্তু তাতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কারণ, সে তখন স্ত্রীর স্বার্থে স্বার্থান্বিত হয়। আপনার ঠাকুর যদি আপনার চিত্ত-বিনোদন-তৎপর হন, আর আপনি সেইজন্য যদি তাঁকে ভালবাসেন, তাহ'লে বুঝতে হবে, আপনি আপনার ঠাকুরকে ভালবাসেন না। আপনি ভালবাসেন আপনার নিজের সুখকে। যত সময় আপনার ভালবাসার মধ্যে condition (সর্ত্ত) থাকে, তত সময় পর্য্যন্ত আপনি ভালবাসার রাজত্বে ঢোকেননি। ভালবাসার মধ্যে থাকে তৎসুখ-সুখিত্ব, প্রিয়ের সুখে সুখী হওয়া। শতকষ্ট সত্ত্বেও আমরা যদি সব complex (প্রবৃত্তি) নিয়ে ইষ্টের চিত্তবিনোদন-তৎপর হই তাহ'লেই বাঁচোয়া। নিজের জন্য কোন চাহিদা থাকলে ভালবাসাটা বিশুদ্ধ হয় না। চাই শুদ্ধভক্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় উপবিষ্ট।

হরিপদদা (সাহা) শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথা আঁচড়িয়ে দিলেন।

মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত।

জুঁই মা জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তোমাদের খুব জানা আছে। এতই জান যে বইও লিখতে পার তার উপর দাঁড়িয়ে। ভারতের মেয়েদের চলন, চরিত্র, চাউনি, কথা, ভাবভঙ্গি, রকম এমনই ছিল যে তাদের কাউকে দেখে মানুষ ভাবতে পারত না যে একে উপভোগের ক্রীড়নক ক'রে তুলি। বরং শ্রদ্ধা, সমীহ, ভক্তিতে মা ব'লে অভিবাদন জানাতে আগ্রহ হ'ত মানুষের। মাতৃত্বের আদর্শই ছিল তাদের কাছে মুখ্য। আবার মেয়েদের মধ্যে সেই ভাব যদি জাগে তাহ'লে তাদের সেবায়, যত্নে, পালনে, পোষণে, উৎসাহে, প্রেরণায় জনসাধারণ আবার নবজীবনের অধিকারী হ'য়ে উঠবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। জনৈক বহিরাগত ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—ইষ্ট কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি নিজ জীবনচলনা ও আচরণের ভিতর-দিয়ে জীবন-বৃদ্ধির বিধিকে সম্যক জেনেছেন তাঁকেই কয় আচার্য্য। আচার্য্য যিনি তিনি ইষ্ট। তাঁকে অবলম্বন ক'রে চললে মানুষ সপরিবেশ সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের অধিকারী হয়। তিনি

প্রত্যেককে চালনা করেন তাঁর নিজস্ব রকমে। বৈশিষ্ট্যানুগ পোষণ তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁকেই কয় আবার আদর্শ, যার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ নিজেকে দেখতে পায়।

উক্ত ভদ্রলোক—পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা মহা দুরবস্থায় প'ড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের কর্ম্মদোষেই এমন হয়েছে। আমাদের আদর্শ নেই, সহযোগিতা ও সংহতির অভাব, তার ফলে অনেক জ্ঞান, গুণ, বুদ্ধি, টাকাপয়সা থাকা সত্ত্বেও আমাদের কিছু নেই।

উক্ত ভদ্রলোক—প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শে integrated (সংহত) হ'য়ে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে যেখানে যা' করণীয় তা' করলেই হবে। আদত কথা, মানুষের অপরের জন্য দরদ থাকা চাই। দরদ থাকলে যেখানে যা' করণীয় তা' সে করেই। মনে করবেন প্রত্যেকটি মানুষ আপনার পরম আত্মীয়। কেউ যদি বিধ্বস্ত হয়, তাহ'লে আপনিও বিধ্বস্ত হবেন। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' এ-রকম স্বার্থপরের মতো একক যদি বাঁচতে চান, পরিবেশের জন্য সক্রিয় দায়িত্ব যদি গ্রহণ না করেন তাহ'লে আপনার বাঁচাও বাঁচবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ ক'দিন ধ'রে অক্লান্তভাবে ক্রমাগত মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর নিজের শরীরে সয় না। তবু প্রতিনিয়ত মানুষের কথা শুনছেন। সমাধান দিচ্ছেন। আর কর্ম্মীদের দলে দলে ডেকে বিশদভাবে বলে দিচ্ছেন কেমনভাবে কী করা লাগবে, এবং কোথায় কোন্ কৌশলে চলতে হবে।

কতিপয় ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আপনি যদি এত পরিশ্রম করেন তাহ'লে অসুস্থ হ'য়ে পড়বেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার হ'য়ে আমার কাজটা যদি তোমরা ক'রে দিতে, তাহ'লে এ-কথা বলার মানে হ'ত। মানুষের জন্য উদ্বেগে আমার খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম কোনটাই ভাল লাগে না। বুকের মধ্যে কেমন একটা যন্ত্রণা বোধ করি। তাই মানুষকে যা' বলার তা' যদি না বলতে পারি, তাহ'লেও নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। আমার হয়েছে উভয়সঙ্কট। শরীরেও দেয় না, আবার যা' করণীয় তা' না করলে মনও মানে না। তাই বলি, তোমরা তৈরী হও।

৫ই বৈশাখ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ১৮।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। পরপর অনেকে আসছেন,

জনৈক দাদা বললেন—ছয় বছর নাম নিয়েছি কিন্তু পেটের ধান্ধায় এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে ঠিকমত নামধ্যান করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনের জন্যই নামধ্যান লাগে। ও বাদ দিয়ে হয় না। আগে জীবন তারপর তো খাওয়া। জীবনের কাজ বাদ দিয়ে খাওয়ার দিকে মন দিলে জীবন টেকে না। তাই, আগে তাই করা লাগে যাতে জীবন ঠিক থাকে। আর মাথা ও মন ঠিক থাকলে অন্ন, বস্ত্র সংগ্রহ করতে বেশী বেগ পেতে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

সতীশদা (সরকার) জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষ হ'তে গেলে কী করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ হ'তে গেলে প্রথম চাই আদর্শের অনুসরণ। তাঁতে সুকেন্দ্রিক হ'তে হয়। চাই প্রবৃত্তিগুলিকে আদর্শের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করা, এবং সক্রিয়ভাবে তাদের সার্থক নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধান করা। মোটপর, তোমার বাঁচাটা ইষ্টের জন্য এই বোধটা তোমার ভিতর গেঁথে যাওয়া চাই। ঐভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে চলতে থাকলে তোমার nerve (স্নায়ু), muscle (পেশী), intelligence (বুদ্ধি) আদর্শমুখী হ'য়ে বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে। এর ফলে ইষ্টানুরাগ গভীর হ'তে থাকে। যখন ইষ্টপ্রাণতা সত্তার অণুপরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হয় তখন 'যত্র যত্র নেত্র পড়ে, তত্র তত্র ইষ্ট স্ফুরে'—এমনতর রকম হয়।

পারিপার্শ্বিককেও বোধ করা যায় ইষ্টেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি ব'লে। মানুষ যখন এইভাবে মানুষকে দেখে তখন তার সংস্পর্শে এসে অন্যের ভিতরও দেবভাব জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। তার সমগ্র সত্তা হয় স্বতঃযাজনশীল। তখন পরিবেশের সহযোগিতা ও সেবা তার স্বভাবধর্ম্ম হ'য়ে ওঠে। শুধু সহযোগিতা হ'লেই হ'ল না। সত্তানুপাতিক সহযোগিতা হওয়া চাই। কার সত্তার কী প্রয়োজন তাই বুঝে সহযোগিতা ও সেবা করা লাগে। তাতেই প্রকৃত কাজ হয়। যখন ইষ্টপ্রাণতা মানুষের নিয়ামক প্রবৃত্তি হয়, তখন মানুষের অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ একীকৃত হ'য়ে ওঠে। সে এক হলেন আদর্শ তাই, ভিতরের ও বাইরের চলন একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলে তার ভিতরে জাগে শান্তি ও সমতা।

শরীরের চর্চা করতে-করতে যেমন শরীর বাড়ে, তেমনি চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক, বোধ ও মস্তিষ্কের ইষ্টানুগ তপঃপ্রাণ অনুশীলনের ফলে প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি তীব্রভাবে সাড়াপ্রবণ হ'য়ে ওঠে। সাধারণতঃ প্রবৃত্তিগুলি আমাদের মনকে নানাদিকে, নানাভাবে টানে। কিন্তু যে ইষ্টকে ভালবাসে সে প্রতি-পদক্ষেপে ভেবে দেখে কোন্‌টা ইষ্টানুগ, কোন্‌টা সত্তাসম্বর্দ্ধনী এবং এই মাপকাঠিতে সে বিচার

ক'রে-ক'রে চলে। যখন এই ভাব মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায় তখন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প'ড়েও সে অচ্যুত থাকে। এই অচ্যুত ইষ্টানুরক্তিই মনুষ্যত্বের মানদণ্ড।

সতীশদা—আজ পূর্ব্ববঙ্গে যে-সব অত্যাচার চলছে তার প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের এমনভাবে চলা লাগে যাতে প্রতিকূল-ভাবাপন্ন মানুষকে আমরা অনুকূল ক'রে তুলতে পারি। কেউ মেরেছে বলে তাকে মারা ভাল নয়। মারা লাগে তার অসৎ প্রবৃত্তিকে, শয়তান, শাতন বা কালকে। প্রবৃত্তি চেপে ধ'রে মানুষকে চালিয়ে নেয় খারাপের পথে। কিন্তু যে মারে সেও বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়। আনন্দ পাওয়ার নেশা প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। অপরকে যখন আমরা বাড়িয়ে তুলি তখনই আনন্দের স্বাদ পাই। প্রত্যেকের মধ্যে যাতে এই সুস্থ মনোভাব গজিয়ে ওঠে সেইজন্য তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেশা লাগে। আমরা পাপকে ঘৃণা করলেও যেন পাপীকে ঘৃণা না করি। আমরা যদি মানুষকে সত্যিই ভালবাসি—অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে সক্রিয় রেখে, তা'হ'লে বহু মানুষই সাড়া দিতে বাধ্য। জন্মগত ভ্রষ্ট যারা তাদের অবশ্য অন্য কথা। এমন অবস্থা সৃষ্টি করা লাগে যাতে দুষ্ট লোকেরা isolated (বিচ্ছিন্ন) হ'য়ে পড়ে এবং মানুষের কোন ক্ষতি না করতে পারে।

আর, শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে-দিয়ে একটা ধারণা শিশুকাল থেকে প্রত্যেকের মাথায় গভীরভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া লাগে যে আমরা একলা বাঁচতে পারি না, বাঁচতে গেলে পরিস্থিতি চাই। আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, মানুষ, গরু সব-কিছু নিয়েই পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিকে সত্তানুকূল ক'রে তোলাই ধর্ম্ম। একটা মানুষ মরলে, দুঃস্থ হলে বা প্রবৃত্তিপরবশ হ'লে আমারই একটা asset (সম্পদ) নষ্ট হ'য়ে গেল। তাই, প্রত্যেককেই উন্নত ক'রে তোলাই আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের অঙ্গীভূত। নিজে ইষ্টপ্রাণ না হ'লে আবার তা' পারা যাবে না। তোমার ইষ্টপ্রাণ চাউনি, চাল-চলন, ব্যবহার মানুষকেও ক'রে তুলবে তেমন। তখন ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব সমষ্টিব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠবে। তাই চাই ইষ্ট, চাই দীক্ষা, চাই ইষ্টানুসরণ, চাই পরিস্থিতির ইষ্টানুগ সেবা। এইগুলি আনতে পারলেই আমরা সপরিবেশ সার্থক হতে পারব।

৭ই বৈশাখ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২০।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে আসলেন। যতিবৃন্দ, পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), প্রবোধদা (মিত্র) প্রমুখ আছেন।

প্রবোধদা উদ্বাস্তুদের সেবা-সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকগুলির মাথা, মন, এই নিদারুণ বিপর্য্যয়ে মুষড়ে গেছে। তাদের আবার চাঙ্গা ক'রে তোলা লাগবে। আশা, ভরসা, উদ্দীপনা দিয়ে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা লাগবে। তাদের আবার স্বাবলম্বী ক'রে তোলাই বড় কাজ। আত্ম-বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা লাগবে তাদের ভিতর। শোয়া মানুষকে দাঁড় করিয়ে তুলতে হবে। প্রত্যেকের মাথা আছে, চোখ, কান, নাক, মুখ, হাত, পা আছে। তার সদ্ব্যবহার ক'রে সে যাতে উপচয়ী হ'য়ে উঠতে পারে—অন্যকে উপচয়ী ক'রে তুলে,—তার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্ন, জল, ওষুধপত্র, জামাকাপড়, আশ্রয়, যা' পার তা' তো দেবেই, তবে তারা খেটে-পিটে যাতে আবার জীবনে দাঁড়াতে পারে দশজনের সাহায্য, সহযোগিতা নিয়ে,—তেমনতর সমাবেশ করা লাগবে।

পরে অন্য কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বাধীনতা আনতে গিয়ে তোমরা দেশভাগ করতে গেলে কেন? পাকিস্তানেও হিন্দু-মুসলমান দুই-ই আছে, ভারত-বর্ষেও হিন্দু-মুসলমান দুই-ই আছে এবং থাকবেও এরা পাশাপাশি। কোন্ বুদ্ধিতে দেশ ভাগ করা হল? আজ লাখ-লাখ লোক মারা যায় কেন? এত নারীর কেন আজ এ দুর্গতি? আজ চারিদিকে এই যে বিপর্য্যয় তা'-তো তোমরা নেতারাই করেছ। এ তোমরা করলে কেন? তোমাদের কী প্রয়োজন ছিল এমনভাবে এ বিধ্বস্তিকে ডেকে আনার? আমি যে বলেছি 'ইষ্ট নাই নেতা যেই, যমের দালাল কিন্তু সেই' তা' কিন্তু বাস্তবেই ঘটে গেল। নেতার পেছনে চাই দ্রষ্টানায়ক, যে সবটা দেখতে পারে, বুঝতে পারে। কোন অন্যায়-আবদারের কাছে আত্মসমর্পণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনই সমভাবে মূল্যবান। কতিপয়ের সুযোগ-সুবিধার জন্য বহু লোককে দুঃখ-দুর্দ্দশায় নিষ্পেষিত করার অধিকার কারও নেইকো। আমাদের উচিত ছিল হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন সবাইকে ধর্ম্মপ্রাণ ক'রে তোলার চেষ্টা করা। খাঁটি হিন্দু কখনও খাঁটি মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-জৈন ইত্যাদির শত্রু হ'তে পারে না। ভারতে একদিন এমনও ছিল যে হিন্দু মুসলমানের মসজিদ গ'ড়ে দিয়েছে, মুসলমানও হিন্দুর দেবস্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই মিলনের ভিত্তিকে আমরা কেন চুরমার করে দিলাম? ধর্ম্ম যেখানে, সেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থাকতে পারে না। আবার যাতে প্রত্যেকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হয় তেমনভাবে যাজন ও প্রচার করা লাগে। হিন্দুর উচিত মুসলমানের শাস্ত্র ভাল ক'রে জানা। মুসলমানের উচিত হিন্দুর শাস্ত্রকে জানা। এই সব আলোচনা-চর্চ্চা করতে গেলে দেখা যাবে যে একই কথা ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায় বলা। রসুলকে যে প্রেরিতপুরুষ ব'লে মানা হয়, তা' যে শুধু মুসলমানরা মানে তা' নয়। আমরাও মানি। কোরানের বিকৃতি আমরা যদি বরদাস্ত করি

তাতে আমাদের ধর্ম্মহানি ঘটে। ধর্ম্ম ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে সব অবতার, মহাপুরুষ ও প্রেরিতপুরুষকে মানতে হয়। আমরা যদি পূর্ব্বতন প্রত্যেক মহাপুরুষকে ও পূরয়মাণ বর্ত্তমান যিনি তাঁকে না মানি, তাহ'লে শাশ্বত ধর্ম্ম ও যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করা হয়। কত আর বলব। তোমরা ভাল ক'রে কাজ করনি ব'লে কত যে ক্ষতি হয়েছে তা' ব'লে শেষ করবার নয়। এখনও ভাল ক'রে লাগ। সবাই যাতে সুস্থভাবে বাঁচে তার ব্যবস্থা কর।

এরপর স্বস্তিসেবক সম্পর্কে কথা উঠল।

যতীনদা (দাস) জিজ্ঞাসা করলেন—স্বস্তিসেবকদের করতে হবে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম, তারা দীক্ষিত হবে। তারপর তারা এমনভাবে প্রস্তুত হবে যাতে মানুষকে নানাভাবে সেবা দিতে পারে। এরা চেষ্টা করবে পতিত জমি চাষ করতে, উন্নত প্রণালীতে কৃষি কেমন ক'রে করতে হয় তা' তারা ক'রে দেখাবে। কোথাও যদি জলের অভাব হয়, তাহ'লে তারা দলবল মিলে নিজেদের চেষ্টায় পুকুর কেটে দেবে ও টিউবওয়েল বসাবে। নানারকম ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে তারা গ্রামে-গ্রামে সেটা চারাবে। দেশে যাতে ম্যালেরিয়া না থাকে সেই জন্য তারা জঙ্গল কাটবে, খানা-ডোবা পরিষ্কার করবে, খাল কাটবে, মশা মারার ব্যবস্থা করবে। আর তারা লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, যুযুৎসু ইত্যাদি এমনভাবে শিখবে যে প্রয়োজনমত মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে। এক কথায়, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য যে-অবস্থা বা যে-পরিবেশে যা' করণীয় তা' তারা করবে। এক কথায়, তারা হ'ল লোকসেবক। তারা ধর্ম্ম ও কৃষ্টিরও সেবক।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন।

সেখানে মোহন (ব্যানার্জী) শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটা ঘটনা বলল।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের যদি ছোট্ট অন্যায়ও কিছু থাকে আর তাকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তাই-ই বেড়ে চলে। যাই হোক, তুই দেখবি যাতে তোর তরফ থেকে কোন দোষ না থাকে এবং যার সম্বন্ধে বলছিস তার সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে চলতে পারিস।

মোহন—আমার ক্ষমতা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষমতা নেই কইলে তো ক্ষমতা আর হবে না। তোমার ভিতরে একটা দম্ভ আছে। তাই এত পার, ওটা পারতে চাও না। ইচ্ছে করলে কিন্তু খুবই পার।

মোহন—কাউকেই তো পারতে দেখলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরলাম, কেউ পারে না, কিন্তু তুমি যদি চেষ্টা ক'রে পার, তাহ'লে কি তুমি খাট হ'য়ে যাবে ? না তোমার অগৌরব হবে ?

মোহন—তা' কেন ? বুঝলাম আমার না হয় দোষ আছে। কিন্তু দুই হাত না হ'লে কি তালি বাজে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক হাতই ঘুরুক। তোমার হাত যদি সেখানে না যায় তাহ'লে তো তালি বাজে না।

মোহন—তাহ'লে তিনি যত অন্যায়ই করুন, কোন কথা বলা যাবে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি চাই যে তোমার প্রতি যত অন্যায়ই করুক, তোমার ব্যবহারই যেন তাকে অনুতপ্ত ক'রে তোলে। যদি দেখ বিশেষ ক্ষতির সৃষ্টি হ'তে চলেছে, সেখানে নিরোধ করো,—কিন্তু বিরোধ সৃষ্টি ক'রে নয়।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—মানুষের সঙ্গে কিভাবে চলতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নানা ধরনের লোক থাকে। বেয়াড়া লোক যারা, তাদের নিয়ে চলাই মুশকিল। তারা ভালটার মধ্যেও মন্দ খুঁজে বের করে। সমুদ্রে স্নান করার মতো কখনও ডুব দেবে, ঢেউ মাথার উপর দিয়ে চ'লে যাবে ; কখনও লাফ দেবে, পা'র নীচে দিয়ে ঢেউ চ'লে যাবে। কৌশলে conflict (দ্বন্দ্ব) এড়িয়ে চলতে হবে। মনে যেন থাকে—কদর্য্য যা' তা' যেন নিরুদ্ধ হয়। তোমাদের সত্তার মানুষ যেন সত্তাবান হয়। আর, তোমাদের উপস্থিতিতে দুষমন যেন মাথা নত ক'রে থাকে এবং তার প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। আর, এটা ভিতরে-বাইরে দুই দিক দিয়েই। অর্থাৎ, তোমাদের প্রবৃত্তিরূপী দুষমন এবং বাইরের দুষমন এই দুই দিকেই সামাল দিয়ে চলতে হবে। নিজের প্রবৃত্তিকে যদি কাবেজে আনতে না পার তাহ'লে কিন্তু বাইরের দুষ্ট লোককেও বশে আনতে পারবে না। প্রবৃত্তিকে জয় করার ভিতর-দিয়ে মানুষ যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে তার সুষ্ঠু প্রয়োগে সে জগতে যে-কোন কঠিন কাজ করতে পারে। আর, এই প্রবৃত্তি-জয় কখনও কসরত ক'রে হয় না। ইষ্টের উপর প্রচণ্ড টান যদি থাকে তাহ'লে সহজেই প্রবৃত্তিগুলিকে আয়ত্ত করা যায়।

তারপর কাজকর্ম্ম-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাজ যেন খুব দ্রুত হয়। তোমরা মানুষের সামনে গিয়ে এমন ক'রে দাঁড়াবে, কথা কইবে, হাত নাড়বে যে তাতেই মানুষ মুগ্ধ হ'য়ে যাবে। Magnetic man (চুম্বকশক্তিসম্পন্ন মানুষ) হওয়া লাগবে তোমাদের প্রত্যেককে। বিশেষভাবে চেষ্টা করবে চল্লিশজন নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী যোগাড় করতে। কাজের জন্য গাড়ী থাকলে ভাল হয়। কোলকাতায় পাঁচশ' শ্রমণ যদি কাজ করে, তারা তাদের ইষ্টপ্রাণ ব্যবহার, সাধনা ও সেবা দিয়ে মানুষগুলিকে

integrated (সংহত) ক'রে তুলতে পারবে। শ্রমণরা unmarried (অবিবাহিত) হবে। নেতৃস্থানীয় কর্ম্মীরা বিবাহিত হলেও desired type (বাঞ্ছিত ধরন)-এর যদি হয় তাহ'লে চলতে পারে। যে চল্লিশজনের কথা বলছি তাদের সারা ভারতে ও জগতে ছড়িয়ে পড়তে হবে। ভারতবর্ষের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। সমগ্র ভারত যদি সংহত হ'য়ে না দাঁড়ায়, প্রত্যেক প্রদেশের সক্রিয় সহযোগিতা যদি লাভ করা না যায়, তাহ'লে কিন্তু হবে না। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়া চাই। তোমরা সমস্ত পৃথিবীর মানবসমাজকে সংহত করতে গিয়ে যে-দেশের ধারা যেমন, সেখানে সেইভাবে অগ্রসর হবে। কিন্তু এই করতে গিয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্য যদি হারাও, তাহ'লে কিন্তু পারবে না। নিজেরা নিজেদের বৈশিষ্ট্যে অটুট হ'তে হবে, আবার অন্যকেও তাদের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী মঙ্গলের পথে পরিচালিত করতে হবে। ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা এবং লোকহিতের ব্যাঘাত না হয় এমনতরভাবে স্থান, কাল, পাত্র-অনুযায়ী সামঞ্জস্য ক'রে চলা লাগবে। সুনিষ্ঠ সহনশীলতা একটা বড় জিনিস। প্রত্যেকেরই চেহারা আলাদা, রকম আলাদা, প্রকৃতি আলাদা। তাই পরস্পরকে সয়ে-বয়ে চলা লাগবে। সবাই যে আমার মনোমত হবে তার কোন মানে নেই। তবে বৈশিষ্ট্যের বেলায় ছোট-বড়র কথা না তুলে প্রত্যেকেরই সত্তাপোষণী বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে হবে। এইভাবেই তোমরা মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারবে এবং মিলনসূত্র রচনা করতে পারবে।

যতীনদা—অন্যের দুর্ব্যবহারে সাধারণতঃ আমাদের অহং উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার interest (স্বার্থ) মানুষ, interest (স্বার্থ) জীবন। Whims (খেয়াল) আপনার interest (স্বার্থ) নয়। মানুষের complex (প্রবৃত্তি) আছেই এবং সেই প্রবৃত্তি মাথা তোলা দেবেই। কিন্তু তার ঊর্দ্ধে না দাঁড়ালে মানুষকে চালনা করা যাবে না। আমাদের সয়ে-বয়ে চলার ক্ষমতা যত বেশী হবে, তত আমরা মানুষকে interested (পরস্পর স্বার্থান্বিত) ক'রে তুলতে পারব। নিজের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে যাবেন না। তা' আপনাকে কখনও profitable (উপচয়ী) করবে না। ঈশ্বরের দূত হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আমরা যদি প্রবৃত্তির ভূতগ্রস্ত হই তাহ'লে মহৎ আদর্শকেই অবমাননা করা হবে।

জনৈক ভাই—কেউ যদি মানুষের কাছে অযথা আমার দোষারোপ করে, সেখানে কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দোষ দিয়ে, দোষ দেখিয়ে মানুষকে blameless (নির্দ্দোষ) করা যায় না। তাকে বলা লাগে—তোর দোষ যদি কিছু থাকে এবং আমি যদি তা'

বারবার মানুষের কাছে কই, তাতে তোরও লাভ হবে না, আমারও না। আমার স্বার্থ তুই, তোর দোষ বাড়িয়ে আমার লাভ নেই। তুই যেমন আমার স্বার্থ, আমিও তেমনি তোর স্বার্থ। আমার দোষের কথা বারবার ব'লে যদি আমার দোষ বাড়িয়ে দিস, তাতে তোর লাভ কী? বরং আমিও নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রিত) করতে চেষ্টা করি, তুইও কর। আমরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করি এ ব্যাপারে। তাতে আমাদের উভয়ের সুবিধে হবে। নিজেদের ক্ষতি ক'রে সুখ কোথায়?

প্রকৃত বন্ধুত্ব সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বন্ধুত্ব প্রবৃত্তির সঙ্গে হয় না, বন্ধুত্ব হয় সত্তার সঙ্গে। দুইজন চোরের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব, তা বন্ধুত্ব নয়। তাই, স্বার্থের সংঘাত হ'লে পট্ করে সে-বন্ধুত্ব চ'টে যায়। কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব পাকা করতে গেলে নিজে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে তাকেও ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন ক'রে তোলা লাগে। প্রবৃত্তিপরায়ণতার ভিত্তির উপর বন্ধুত্ব দাঁড় করাতে গেলে তা' কখনও স্থায়ী হয় না। আমার প্রবৃত্তি যেমন আমার শত্রু, তা' তেমনি অপরেরও শত্রু। আবার, অপরের অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি যেমন তার শত্রু, তেমনি তা' আমার এবং পরিবেশেরও শত্রু। মানুষের সমাজে কোন কাজ যদি সবচাইতে জরুরী হয় তাহ'লে সে কাজ হ'ল প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ। কারও দোষ দেখিয়ে বা নীতিকথা ব'লে এ-কাজ করা যাবে না। এর ওষুধ হ'ল ইষ্টানুরাগ।

গোপেনদা (রায়)—নামধ্যান করলেই কি মানুষ নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামধ্যান করলে প্রবৃত্তিগুলি ভেসে ওঠে। জল জ্বাল দিতে যেমন তলার জল উপরে ওঠে, এও তেমনি। ভিতরে চাপা যা' আছে তা' যখন ধরা পড়ে তখন নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে সুবিধে হয়। নামধ্যানে আবার একটা উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সেই সম্বেগ নিয়ে যা' আমরা করতে চাই তা' ভাল ক'রে করতে পারি।

গোপেনদা—মানুষকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে ইষ্টে অচ্যুত থেকে যদি মানুষের জীবন, মন, অন্তর চুরি করতে পার—ভালবাসা দিয়ে, মমতা দিয়ে, সেবা দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে, তবেই হয়। তা' পারলে আর সব পারবে। তোমার চরিত্র যেমন তোমার সম্পদ, তেমনি পরিবেশেরও। চরিত্রের মধ্যে আছে আচরণ। কও, কর না, তাতে পরিবেশের তোমার প্রতি অশ্রদ্ধা হবে। তখন ভাল কথা সম্বন্ধে তার একটা অরুচি জন্মে যাবে। এইভাবে মানুষের ক্ষতি করা ঠিক নয়। Concentric agent (সুকেন্দ্রিকতার হোতা) হ'তে গেলে নিজে ঠিক হওয়া লাগবেই। আমার লোভের জিনিস, আমার উপভোগের জিনিস তোমরাই। তোমরা মানুষ হও।

জনৈক ছাত্র জিজ্ঞাসা করল—আমি কেমনভাবে পড়াশুনা করলে ভাল হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বিজ্ঞানের উপর খুব লোভ। আমার লোভ যদি fulfil (পূরণ) করতে চাও তবে অঙ্ক ভাল ক'রে শিখে বিজ্ঞান পড়। অঙ্ক তোমার কেমন লাগে ?

উক্ত ছাত্র—ভাল লাগে। তবে মাঝে-মাঝে জানা জিনিস ভুল হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অঙ্ক এত বেশী করবে যে ভুলের পথ যেন বন্ধ হ'য়ে যায়।

কাশীদা (রায়চৌধুরী)—কিভাবে কাজ করলে কৃতকার্য্যতা অনিবার্য্য হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কোন কাজ করবে, তা' পুরোপুরি করবে। তার জন্য যে-যে উপাদান বা উপকরণ বা সাহায্য প্রয়োজন তা' নিজেই সংগ্রহ করবে। বাধা কী কী আসতে পারে, তা' ভেবে নেবে। এবং বাধা আসলে কিভাবে তা' অতিক্রম করবে তারও ব্যবস্থা ঠিক রাখবে। মাথায় সবটা সুষ্ঠুভাবে ধারণা করা দরকার। এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ ও তুখোড় ক'রে রাখবে এবং যা' করবে তা' নিখুঁতভাবে সত্বর সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবে। আর, সব সময় নিজের মাথা ঠাণ্ডা রাখবে। যে-কাজে অপরের সহযোগিতা দরকার হয় সেখানে যদি তাদের কাউকে হঠাৎ চটিয়ে দেও, তাহ'লে কিন্তু কাজ পণ্ড হবে। দশজনে মিলে যে-কাজ করছ, তার বেশীর ভাগ কাজ তুমি করলেও নিজে কখনও credit (প্রশংসা) নিতে যাবে না। বরং অন্যকে প্রশংসা দেবে।

১০ই বৈশাখ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ২৩।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও যতিবৃন্দ ছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—বিশেষ প্রতিভা এবং স্বাভাবিক বিকাশ, এ দুটো তো আলাদা জিনিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Electric spark (বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ) একটা জিনিস, আর একটা বাল্ব যখন জ্বলে, সেটা আর একটা জিনিস।

কেষ্টদা—একজন গুরুভক্ত মানুষকে হয়তো দেখা যায় বোকা ধরনের। আবার হয়তো দেখা যায় একজনের গুরুভক্তি কিছু নেই, কিন্তু দুনিয়ায় একটা আলোড়ন এনে দিল। এমন হয় কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃত গুরুভক্ত মানুষ বোকা হ'তে পারে না। হয়তো সে খুবই বুদ্ধিমান, কিন্তু তার মধ্যে তথাকথিত হীনম্মন্য অহং-এর জেল্লা হয়তো থাকে না। গুরুভক্তি থাকলে সে-মানুষের মস্তিষ্ক keen (তীক্ষ্ম) হয়ই—তার জৈবী-সংস্থিতি

মাস্তিষ্ক। তবে এক-এক জনের প্রকৃতি এক-এক রকম। কেউ হয়তো সাত্বিক প্রকৃতির এবং সে নিরিবিলি তার কাজ ক'রে যায়, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোন চেষ্টা থাকে না তার ভিতর।

অন্য কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শুনেছি, আনন্দ বুদ্ধদেবের সঙ্গে কতকগুলি condition (সর্ত্ত) করেছিলেন, তাই নাকি তিনি অর্হৎ-পর্য্যায়ে উন্নীত হতে পারেননি। ভগবানের কাছে বা ইষ্টের কাছে আমরা যখন আত্মোৎসর্গ করি, তখন যদি condition (সর্ত্ত) করি, তা' আত্মবিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি ইষ্টের ইচ্ছাপূরণ ছাড়া ব্যক্তিগত যদি কোন প্রত্যাশা থাকে তাও অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। ইষ্টের সঙ্গে ভাবটা হবে এমন যে আমি তোমার জন্যেই তোমাকে ভালবাসি। কেন ভালবাসি তা' জানি না। ভালো না বেসে পারি না তাই বাসি। এমনটা হলেই তার সত্যিকার আত্মোন্নয়ন হয়। শুনেছি কশ্যপ, মৌদ্গল্লায়ন, সারিপুত্ত এদের রকমটা খুব সহজ ছিল এবং তারা সহজেই অর্হৎ পদ লাভ করেছিলেন।

কেষ্টদা—আনন্দের বুদ্ধদেবের শরীরের প্রতি একটা মূঢ় টান ছিল এবং তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দিকে খুব নজর ছিল। কিন্তু তিনি বুদ্ধদেবের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে টান যদি মূঢ়ও হয়, তাও ভাল ছিল, যদি ঐ condition (সর্ত্ত) না করতেন। Condition (সর্ত্ত) ক'রে ভালবাসলে মানুষটার প্রতি ভালবাসা হয় না। ভালবাসা হয় সেই condition-এর (সর্ত্তের) প্রতি।

কেষ্টদা—তেমন টান যার গজায়, তার এমনি গজায়, উপদেশে তো গজায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপদেশে গজায় না, অভ্যাসে গজায়—যেমন মমতা। একটা ছেলেকে মানুষ করেন, আস্তে-আস্তে তার প্রতি দুর্নিবার টান হ'য়ে পড়বে। শুধু নিজের সন্তান বলে নয়। একটা দত্তক পুত্র নেন তার জন্য করতে-করতে তার উপরও তেমনি টান হবে।

বেলা প্রায় এগারটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় বসে আছেন। ঘরের মধ্যে হরিপদদা (সাহা), প্যারীদা (নন্দী), সুশীলদা (বসু), সরোজিনীমা, বোসমা প্রমুখ ছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যার উপর মানুষের ভালবাসা থাকে, সব প্রবৃত্তি দিয়ে সে তাকে সেবা করতে চায়। যার যেমন নেশা, তার তেমন দিশা।

বোসমা—প্রবৃত্তিগুলি আমাদের কষ্ট দেয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল জিনিসে নেশা না থাকলে, মানুষ প্রবৃত্তিগুলিকেই লাই দেয়।

সং নেশা না থাকলেই মানুষ খারাপের দিকে ঝোঁকে। মানুষ চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে না। তাই ছেলেবেলা থেকে বাপ-মার তাই করা লাগে যাতে ছেলেমেয়ের ভাল দিকে interest (অনুরাগ) গজায়। আর, তারা যা' কিছু করে তা' যেন শ্রেয় কারও মুখে হাসি ফোটানোর জন্য করে। ব্যক্তিগত অর্থ-মান-যশ ইত্যাদি যদি কারও কাম্য হয় তাহ'লে সে কিন্তু পট্ ক'রে প্রকৃতির পাল্লায় প'ড়ে যায়।

১১ই বৈশাখ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ২৪।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিরা আছেন।

শেরপুরের কিরণদা (ঘোষ) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছে পূর্ববঙ্গের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলেন।

কিরণদা কথাচ্ছলে নানা ঘটনা বিবৃত করলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে। বলি, লেখ—
সুধাংশু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। প্রার্থনা পরমপিতার কাছে তুমি তোমার পরিবার ও পরিবেশ নিয়ে সুখে সক্রিয় থেকে স্বস্তির সহিত সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক। দুনিয়ার আঘাত-ব্যাঘাত যা'-কিছু তাদিগকে সুদক্ষ কুশল-কৌশলী নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে আয়ত্ত বা অতিক্রম ক'রে যেন চলতে পার—নির্বিরোধ, নিরোধ-সামঞ্জস্যে।

তোমার বাবা কেমন আছেন? পরমপিতার কাছে প্রার্থনা—তিনি যেন সুখে সুস্থ দেহে সক্রিয় থেকে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকতে পারেন।

মণ্টু কেমন আছে? তার শরীরে আর কোন গণ্ডগোল নেই তো? প্রার্থনা পরমপিতার কাছে সে যেন সুখে সক্রিয় থেকে স্বাস্থ্যবান হ'য়ে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকে—পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকের সহিত সশ্রদ্ধ প্রীতিবন্ধন নিয়ে।

এখানে সানুর জ্বর হয়েছিল। এখন একটু কম। নোটনেরও জ্বর হয়েছে, তা' ছাড়েনি আজও। তার উপর আবার মুকুলেরও জ্বর হয়েছে গেল রাত্রে।

পনেরই তারিখ কাজলের পৈতা হবে মনস্থ করেছি। সকলে ভাল থেকে স্বস্তি ও তৃপ্তি নিয়ে পৈতার ব্যাপার সুসমাধান যাতে করতে পারা যায়—তাই প্রার্থনা পরমপিতার কাছে।

বড় বৌ-এরও জ্বর হয়েছিল, এখনও কাশি আছে।

আমার শরীরও বড় ভাল না। বড়খোকার ব্যাপার তো শুনেইছো। মণিও বেশ সুস্থ নয়কো। এদিকে আর-আর সবাই একরকম আছে।

আমার উত্তর দিতে দেরী হলেও তুমি চিঠি লিখো। তোমাদের চিঠি পেলে ভাল লাগে খুব—সোয়াস্তি পাই।

তোমার বাবাকে আমার নববর্ষের আন্তরিকতাপূর্ণ অভিবাদন দিও।

তুমি আমার আন্তরিক 'রাস্বা' জেনো।

ইতি
তোমারই
দীন
'বাবা'

খুকী,

তোমার চিঠি পেয়েছি। মাঝে কয়েকদিন কনফারেন্সের ভীড়ে সময়মত উত্তর দিতে পারিনি। তোমাদের জন্য সবসময় চিন্তিত থাকি। কলকাতায় আজকাল খুব কলেরা হচ্ছে ব'লে খবর পেলাম। সাবধানে থেকো ও সকলকে সাবধানে রেখো—সর্ব্বপ্রকার প্রতিষেধী ব্যবস্থায় অটুট থেকে।

প্রার্থনা পরমপিতার কাছে—তোমরা সপরিবেশ সুখে সন্দীপ্ত হ'য়ে স্বাস্থ্যর সহিত সুদীর্ঘ জীবন লাভ কর।

পনেরই তারিখ কাজলের পৈতে হবে ক'রে স্থির হয়েছে। তুমি এখানে আস—আশা করতে ইচ্ছে করে, যদিও বুঝি, হয়তো তুমি আসতে পারবে না।

তুমি আমার আন্তরিক 'রাস্বা' জেনো ও যারা চায় তাদিগকে দিও।

ইতি
তোমারই
দীন
'দাদা'

শাস্তু, কানু, অর্চ্চনা, তোতা, মঞ্জু,

তোমাদের চিঠি পেয়ে প্রীত হয়েছি। মাঝে-মাঝে চিঠি দিও। তোমাদের চিঠি পেলে ভাল লাগে, সোয়াস্তি পাই।

তোমরা ভাল আছ তো? তোমাদের বাবা, পিসীমা কেমন আছেন?

প্রার্থনা পরমপিতার কাছে—তোমরা সুস্থ দীপ্ত থেকে সুখস্বস্তিময় সার্থক সুদীর্ঘ জীবন লাভ কর।

আমার আন্তরিক 'ন্নাম্বা' জেনো আর সকলকে দিও।

ইতি

তোমাদেরই দীন

'জ্যাঠামশাই'

পুঃ—শাস্তু। তুমি Microscope-এর (অণুবীক্ষণ যন্ত্রের) কথা লিখেছিলে। কিন্তু ঐ Microscope-টি নিয়ে প্রথম ল্যাবরেটরীর কাজ শুরু হয়, ওটা একটা সায়াতি জিনিস। আমি কিশোরীদাকে বলে দিয়েছি। Microscope-এর ব্যবস্থার কথা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন।

শৈলেনদা (দে) বললেন—পশ্চিমবঙ্গেও এখন ভয়ের কারণ দেখা দিচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভয় হচ্ছে, কিন্তু অভীঃ-র তপ তো এখনও করি না।

ননীদা (মণ্ডল)—মানুষ খামখেয়ালী হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ নানান ধান্ধায় ঘোরে। অসম্বন্ধ নানারকম ছাপ ও সম্বেগ মাথায় গোঁজা থাকে। তার যেটা যখন উত্তেজিত হয় তখন সেইটাই সর্ব্বেসর্ব্বা ও প্রবল হ'য়ে ওঠে। মানুষ একমুখী না হ'লে সর্ব্বদেশদর্শী ব্যুৎপত্তি হয় না, সমন্বয়ী চিন্তা-চলন হয় না। এক-একটা এক-এক সময় পেয়ে বসে এবং সেগুলির মধ্যে সঙ্গতি থাকে না।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর রাস্তার পাশে মাঠে এসে ডিগরিয়া পাহাড়ের দিকে মুখ ক'রে পশ্চিমাস্য হ'য়ে বসেছেন। সূর্য্য তখন অস্তাচলে। পশ্চিম আকাশ আবীর রাঙা। সারাদিন তীব্র গরমের পর এখন একটু ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

পূজনীয় বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), বীরুদা (রায়), সুবোধদা (সেন) প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত।

নানা বিষয়ে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষ যদি শুধু কথা কয়, আর কাজে কিছু না করে, তাদের urge (আকূতি) কথার ভিতর-দিয়ে বেরিয়ে যায়। তাদের nerve-flow (স্নায়ুপ্রবাহ) active expression (সক্রিয় প্রকাশ) লাভ করে কম। এই জিনিসটা মোটেই ভাল নয়। কর্ম্মহীন কথা বড় dangerous (ভয়ঙ্কর)।

কেষ্টদা—কথা না কওয়াই কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা কাজ করে, দেখবেন তারা কথা একটু কম কয়। কাজহীন কথা ভাল নয়। দুয়ের মধ্যে সঙ্গতি থাকা দরকার।

১২ই বৈশাখ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ২৫।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ভিতরে চৌবাচ্চায় নেমে স্নানের পর গামছা দিয়ে গা মুছতে-মুছতে বললেন—আমি বুঝতে পারি না, কিন্তু রোজই যখন ডুব দিই, তখনই কোন না কোন মানুষকে দেখি। তাদের বেশীরভাগ Saint (সন্ত)। সেইদিন নিজেকেই দেখলাম। পুরো চেহারা দেখি না। Bust-মত (শরীরের উপরের অর্দ্ধেকটা) দেখি। চোখ বুজে ডুব দিয়ে দৃষ্টিটা যখন ঝাপসা হ'য়ে ওঠে সেই সময় দেখি। রোজই দেখতে পাই, একদিনও বাদ যায় না। বহুদিন থেকে দেখছি। মা, বাবা বা সাধনা এদের কাউকে যে দেখি তা' নয়। প্রায়ই দেখি সন্ন্যাসীমতন।

সুশীলদা (বসু)—বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, যীশুখৃষ্ট ইত্যাদি যে-সব মহাপুরুষের কথা জানা আছে, তাদের দেখেন কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জানা কিংবা ভাবা চেহারা নয়। যাদের কথা কখনও ভাবিনি, জানি না, যাঁদের কখনও দেখিনি এমন সব দেখি।

১৩ই বৈশাখ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ২৬।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় বসেছেন। যতিরা আছেন।

বীরুদা (রায়) শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাইবেল থেকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সে-প্রসঙ্গে বললেন—When to speak, what to speak, how to speak (কখন বলতে হবে, কী বলতে হবে, কেমনভাবে বলতে হবে)—এই বুঝে বাক্-এর বিহিত প্রয়োগে মানুষকে মঙ্গলে যুক্ত ক'রে তোলাই যাজন। মানুষকে বিবেচনার পাল্লায় ফেললে disconnected element (বিচ্ছিন্ন ভাব)-এর দরুন কিছু decision (সিদ্ধান্ত) ক'রে উঠতে পারে না। সেইজন্য সত্তার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলে ইষ্টকে সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া লাগে। ইষ্ট হলেন জীবনে একায়নী সূত্র। তখন মানুষের ভিতরে অসংলগ্ন ও পরস্পরবিরোধী যে-সব উপাদান থাকে সেগুলির মধ্যে একটা সংগতির সূত্র ফুটে ওঠে। পৃথিবীতে কোন জিনিসই একেবারে ফেলনা নয়। আমাদের জ্ঞান থাকলে আমরা বুঝতে পারি কোন্ জিনিসটা কতটুকু গ্রহণীয় এবং কতটুকু বর্জ্জনীয় এবং সব কিছুর ইষ্টানুগ ও সত্তাপোষণী প্রয়োগ ও সমাবেশ কেমন ক'রে করতে হয়, তাও আমরা টের পাই। যে অন্তর্জ্জগৎটা ছিল chaotic (বিশৃংখল) তা' cosmic intelligence-এ (বিশ্ববোধিতে) উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

কেষ্টদা—সে-রকম প্রজ্ঞা তো দীক্ষিতদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটো জিনিস আছে। একটা আমার জন্য ঠাকুর, আর-একটা ঠাকুরের জন্য আমি। আমার জন্য ঠাকুর হ'লে মানুষ ঠাকুরে সুকেন্দ্রিক হয় না। ঠাকুরকে দিয়ে আত্মস্বার্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠা কী ক'রে হয় সেই ধান্ধা নিয়ে চলে। তাতে ফল হয় না। দীক্ষা বলতে আমি বুঝি seal of God (ভগবানের ছাপ) মানুষের মাথায় এঁকে দেওয়া। তার জীবন যে ইষ্টের জন্য—এইটে তার বোধে এনে দেওয়া। নাম নেওয়া থাকলে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করতে-করতে—তাঁর জন্য আমি এ বোধ খোলার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় সকাম থেকে নিষ্কাম হয়। তাঁর জন্য ভালবাসা যখন গজায় এবং নিঃস্বার্থ সেবার্জিত আনন্দ যখন মানুষ পায়, তখন ব্যক্তিগত স্বার্থের ধান্ধা তার কাছে যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), যামিনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বার্ক, ফক্স, শেরিডনের মতো বক্তৃতা দেওয়া শিখতে হয়। তারা এমনতর বক্তৃতা করত যে মানুষ অজ্ঞান হ'য়ে যেত, পাগল হ'য়ে উঠত। তেমনভাবে তৈরী হওয়া লাগে। ভাব, ভাষা, কণ্ঠস্বর, নাক, চোখ, কান, মুখ, হাতনাড়া, ভঙ্গী সবই ঠিক ক'রে ফেলা লাগে। আর, fact (তথ্য), example (উদাহরণ) এমনভাবে উপস্থাপন করতে হয় যাতে তা' উদ্দেশ্যের পরিপূরণী হয়, এবং মানুষের অকাট্য প্রত্যয় জাগে। বক্তৃতা করার আগে নিজের মনে-মনে কথাগুলি আওড়াতে হয়। নিজের মনে সেগুলি ভাললাগা চাই, আনন্দ-উদ্দীপনা জাগা চাই। বাক্তপা হ'তে হয়, ভাবসিদ্ধ হ'তে হয়। যে-ভাবে ভাবিত হ'য়ে আমি কথা বলছি, সে-ভাবটা বিচ্ছুরিত হওয়া চাই আমার চোখমুখের প্রতিটি রেখায় ও ভঙ্গীতে। এমনভাবে বলতে হয় যেন প্রত্যেকটি শ্রোতার মন তোমার কব্জায় এসে যায়। লাখো-লাখো লোক একযোগে অনুভব করবে যেন তুমি তাদের কোন অজানা আনন্দের স্বর্গে টেনে নিয়ে চলেছ। একটা magnetic charm (চুম্বকীয় আকর্ষণ) নিজের ভিতরে, বাইরে সৃষ্টি করা চাই। বার্ক, ফক্স ইত্যাদির বক্তৃতাগুলি পড়া লাগে, বাংলায় সেগুলি আরও সুন্দরভাবে কিভাবে প্রকাশ করা যায় মনে-মনে তা' মক্স করতে হয়। বাইরে যেয়ে মাঠে মহড়া দিতে হয়। নিজে ইষ্টের ভাবে এবং মানুষের মঙ্গল চিন্তায় যত মাতোয়ারা ও মশগুল হ'য়ে থাকা যায়, ততই ভাব, ভঙ্গী ও ভাষা জোগায় অপার্থিব রকমের। তার অভিনবত্বে মানুষের চমক লেগে যায়। সে দুর্ব্বার আকর্ষণ কেউই এড়াতে পারে না। বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু, ইংরেজী সবরকম ভাষায় বক্তৃতা অভ্যাস করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

শরৎদা (হালদার), নরেনদা (মিত্র), যতীনদা (দাস), কালিদাসদা (মজুমদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সুরেনদা (বিশ্বাস), ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী), মতিদা (চ্যাটার্জী), তারকদা (ব্যানার্জ্জী), খগেনদা (তপাদার), হরেনদা (বসু), মণিদা (কর) প্রমুখ কাছে আছেন।

হাউজারম্যানদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—একলা-একলা মনের কাছে কথা কওয়া লাগে। বিবেক দিয়ে বিচার ক'রে দেখতে হয়, কথাগুলি ভাল লাগে কিনা। মাঠে গিয়ে একাকী উচ্চৈঃস্বরে কথাগুলি বলে দেখতে হয় কানের কাছে ভাল লাগে কিনা। আর behaviour (ব্যবহার) করা লাগে enchanting (মনোমুগ্ধকর) যাতে তা' মানুষের মন জয় ক'রে নেয়। নামধ্যান ভালমতো করা লাগে। তাতে brain (মস্তিষ্ক) keen (তীক্ষ্ন) হয় আর ব্যক্তিগত যাজন ও বক্তৃতার সময় ভাবভঙ্গী কেমন করতে হবে তা' মহড়া দিয়ে ঠিক ক'রে নিতে হয়। বক্তৃতা এমনভাবে করবে যে তুমি যখন কাঁদবে, জনতাও তোমার সঙ্গে কাঁদবে। তুমি যখন হাসবে, জনতাও সেইসঙ্গে হাসিতে উল্লসিত হ'য়ে উঠবে, তুমি যখন রাগবে, তোমার শ্রোতারাও তখন রাগে গরগর করবে। আর, যত গরম বক্তৃতাই কর না কেন, বক্তৃতা করবে আইন বাঁচিয়ে। আর শ্রোতাদের মধ্যে হিন্দু থাক্, মুসলমান থাক্, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন যেই থাক, যে-কোন দেশের, যে-কোন পার্টির যে-কোন লোকই থাক, প্রত্যেকেই মনে করবে এই তো আমাদের মনের কথা, প্রাণের কথা। এককথায় এমন একটা ভাবভূমিতে দাঁড়িয়ে বলতে হয় যেখানে বনের পশুও তোমাকে প্রীতির সঙ্গে আলিঙ্গন দিতে এগিয়ে আসে। নিজের সত্তার গভীরে ঢুকতে হয়। সত্তার তলদেশ ছুঁইয়ে মঙ্গললিপ্সু হ'য়ে যে-কথা বেরোয়, সে-কথা প্রতিটি সত্তাকেই আকুল ক'রে তোলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এর পরে অনুকাকে একটা চিঠি দিলেন।

অনুকা,

এই নূতন বছরে নূতন দিনে তোমার নূতন হাতে চিঠি পেয়ে অনেকদিন পরে নূতন আনন্দ লাভ করলাম। প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে, তুমি সুখে স্বাস্থ্যবতী হ'য়ে সুদীর্ঘজীবন লাভ কর তোমার সবাইকে নিয়ে। স্ফূর্ত্তির সাথে আবেগ নিয়ে লেখাপড়া ক'রো—মনোনিবেশ করে।

তোমার মা, দাদা, দিদি ও অন্যান্য সবাইকে শ্রদ্ধা ক'রো। তাঁদিগকে হাতে-কলমে ও ব্যবহারের ভিতর দিয়ে এমন সেবা করবে, তাঁরা যেন স্বচ্ছন্দতা লাভ ক'রে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন তোমার প্রতি। ভাল হ'তে গেলে প্রথমেই নিজের স্বাস্থ্যটাকে

সুস্থ রেখে, যাদের নিয়ে তুমি আছ, তারা যাতে সুস্থ থাকে তাই করতে হয় কিন্তু। খাওয়া-দাওয়া, চালচলন, আচার-ব্যবহার, এমনতরভাবে করতে হয়, যাতে তোমাকে নিয়ে তোমার সবাই সুস্থ থাকেন।

তোমার কাজলদার পৈতে হবে সম্ভবত ১৫ই বৈশাখ।

বাড়ীর এখানে অনেকেই অসুস্থ। আমার শরীরও ভাল না। আর, বুড়ো হয়ে গেছি কিনা, তাই কিছুতেই ভাল থাকি না। আমার এই অকিঞ্চন কথাগুলি যদি তোমার মনে থাকে, আর তেমনি ক'রে চল, হয়তো পরমপিতা ভালই করবেন।

তোমার মা, দাদা, দিদি, মামা এবং অন্যান্য সবাই কেমন আছেন জানলে খুশী হব। তুমি কেমন আছ জানতে ইচ্ছা হয়।

আমার অন্তরস্থ পরমপিতার আশীর্ব্বাদ তোমাদের সবার উপর বর্ষিত হোক— এই প্রার্থনা।

ইতি

মা!

তোমারই

অকিঞ্চন সন্তান

"আমি"

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) এসে পাকিস্তানের জনৈক দাদার এক চিঠি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তার ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দেবার পর বললেন—মানুষগুলি যেন কেমন একটা রকমের ভিতর ঘুরপাক খায়। ওটা ভেদ ক'রে বের হওয়া যেন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। পাকিস্তানের লোকেরা কী করবে সে সম্বন্ধে বারবার একই কথা বলতে হচ্ছে। তবু বারবার সেই প্রশ্ন। উত্তর পেলেও মাথায় নিতে পারে না। এ রকমটা হয় যখন মানুষ নিজের পছন্দমতন চলতে চায়। কিন্তু আমার পছন্দমতন চলতে নারাজ।

১৪ই বৈশাখ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২৭।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে যতিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। এমন সময় হরেনদা (বসু) এসে জানালেন যে তাঁবু থেকে তাঁর স্বস্ত্যয়নীর টাকা চুরি হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চোর যে চুরি করার সুযোগ পেল, তোমরা যে চোর ধরতে পার না, এইটাই খারাপ লাগে। মাঝে-মাঝেই চুরি হয় অথচ তোমরা সজাগ থাক না। সন্ধিৎসা-সন্ধিৎসা এত বলি কিন্তু এই সন্ধিৎসারই অভাব। চোরদের দিয়েও

আমাদের উপকার হয় যদি আমরা এমন সজাগ থাকি যাতে তারা চুরি করতে না পারে। এইবার খ্যাপনসহ ভিক্ষা ক'রে টাকা পুরিয়ে রেখ। আর দেখো ভবিষ্যতে যেন চুরি না হয়। চুরি হল, এইজন্য প্রায়শ্চিত্তও করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে বসে বক্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

শরৎদা--ভাল বক্তৃতা যদি না শোনা যায় তবে ঠিক-ঠিক ধারণা হয় না বক্তৃতা কেমন হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা যদি নিজের মতো ক'রে চেষ্টা করেন, তার ভিতর থেকে গজিয়ে উঠবে।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ কাল থেকে বক্তৃতার অনুশীলন শুরু করেছেন শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর খুশী হলেন এবং বললেন—এটা খুবই ভাল, কিন্তু বরাবর চালিয়ে গেলে হয়। Continuity (ক্রমাগতি) একটা বড় জিনিস। নিষ্ঠা না থাকলে continuity (ক্রমাগতি) থাকে না। এই যে বহু মানুষ বছরের পর বছর ধ'রে রোজ যজন-যাজন ইষ্টভৃতি করে, এর ভিতর-দিয়ে কিন্তু তাঁদের nerve (স্নায়ু) strong (শক্তিশালী) হ'য়ে উঠছে। শুধু হুজুগের মধ্যে-দিয়ে কিন্তু মানুষ তৈরী হয় কম।

যতীনদা (দাস)—লয়েড জর্জ্জের বক্তৃতা আমি শুনেছি। তাঁর বক্তৃতার সময় কারও সাধ্য থাকত না অন্যদিকে মন দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে বললেন সাধ্য থাকত না, ঐটেই হল কথা। ও দিয়েই বোঝা যায় বক্তার চৌম্বকত্ব কতখানি। আমার ইচ্ছে করে আপনারা যদি তেমন হতেন তবে আপনাদের দিয়ে আমেরিকা ও ইওরোপের বিভিন্ন দেশে বক্তৃতা করিয়ে তাদের জানিয়ে দিতাম যে ভারত ও পাকিস্তানে বাস্তব অবস্থাটা কী।

বক্তৃতা করতে গেলে ভাষা একেবারে নিখুঁত করা লাগে। একটা কথাও বেফাঁস হলে মুশকিল। কারও সম্বন্ধে আমার যে বিদ্বেষ আছে সে ভাবটা প্রকাশ হওয়া ভাল না। বাস্তব ঘটনাগুলি এমন পরম্পরায় সাজান লাগে যা' শুনে লোকে বুঝতে পারে কে কেমনতর। আমি জিনিসটা বুঝি কিসে ভাল হয়, তবে আমি আমার মতো ক'রে বলতে পারি। লেখাপড়া জানা মানুষের মতন পারি না। আমার মনে হয় যারা একই সঙ্গে ভাল বৈঠকী আলোচনা করতে পারে, ছোটখাটো সভায় ভাল ক'রে বলতে পারে এবং বিরাট জনসভায় বাগ্মীর মত বক্তৃতা করতে পারে, তাদের রকমটা কার্য্যকরী হয়। নইলে ব্যক্তিগত বা গুচ্ছগত আলাপ-আলোচনার সময় বা ছোট সভায় বক্তৃতার সময় যদি বাগ্মীর রকমে বলতে থাকে তাহ'লে তা' কিন্তু সুফলপ্রসূ হয়

না। সে-ই পাকা বাগ্মী যার বক্তৃতা শুনে সভার প্রত্যেকটি লোকের মনে হয় যে বক্তা আমার অবস্থাটা সম্যক বুঝে আমার প্রতি দরদী হয়েই যেন বলছে।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর রোহিণী রোডের পাশে মাঠে এসে বসেছেন। সুশীলদা (বসু), বীরুদা (রায়), হরিদাসদা (সিংহ) প্রমুখ উপস্থিত আছেন।

আগামীকাল কাজল ভাই-এর উপনয়ন। বড়াল-বাংলোয় সুন্দর বাজনা বাজছে।

সুশীলদা বললেন—বেশ বাজাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-সব যেন এখন আর আমি enjoy (উপভোগ) করতে পারি না। আগে বীরুদাকে দিয়েই কত গান গাইয়ে শুনেছি। বেদনায় যেন আমার প্রত্যেকটা স্নায়ুগুচ্ছ ভরা।

১৫ই বৈশাখ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ২৮।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে একটি বাণী দিলেন। বাণী দেওয়ার পর সেই প্রসঙ্গে বললেন—ভক্তি কখনও নিষ্ক্রিয় হয় না। Active urge (সক্রিয় আকুতি) চাই। প্রেষ্ঠের জন্য না করলে তার জন্য মমতা বাড়ে না, তাই চাই সেবা করা। নিজের শ্রমঅর্জ্জিত ফল দিয়ে তাঁকে নন্দিত করলে নিজেও আনন্দ পাওয়া যায়। একেই কয় বাস্তব ভজন। তাঁর জন্য যেমন বাস্তব সেবা করতে হয়, তেমনি তাঁর নীতিবিধি-অনুযায়ী চলতে হয়। তা' না হ'লে চরিত্রে তাঁর ছাপ পড়ে না।

১৬ই বৈশাখ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ২৯।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় ব'সে আছেন। যতিবৃন্দ কাছে আছেন। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কতকগুলি ধারণা আছে, মনে হয় সত্যি। মনে হয় একটা ঝাঁকড়া নিমগাছের মোটা একটা ডালে শ্রীকৃষ্ণ হেলান দিয়ে পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় একটা তীর এসে তাঁর পায়ে লাগল। তিনি তারপর মাটিতে প'ড়ে গেলেন। কিছু সময় পরে তিনি দেহরক্ষা করলেন। সব ঘটনাটা খুব স্পষ্ট মনে হয়। ব্যাপারটা আচমকা ঘটে গেল। ঘটনা-পরম্পরায় তখন তাঁর বাঁচার ইচ্ছাও উবে গিয়েছিল। মানুষের মৃত্যু এমনি ঘটে না। তার জন্য একটা উপযুক্ত অবস্থা তৈরী হয়।

এই কটা কথা ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর উদাস, বিষণ্ণ ও গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। আর কোন কথা বললেন না।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে। যতিগণ, কেষ্টদা ও সুশীলদা প্রমুখ আছেন।

খগেনদা (তপাদার)—শরৎদার যেমন মা আছেন, উনি কি তাঁর হাতে খেতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই পাগল। মা'র সঙ্গে আবার কার কথা? মা'র হাতে খেতে পারবে না কেন? আমার তো এইরকম মনে হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় শ্রমণ, যতি, সন্ন্যাসী যারা, জাতির সম্পদই হল তাদের চরিত্র, তাদের জীবন, তাদের তপস্যা। তাদের চরিত্র দেখেই তো জাতি ওঠে। আর, ওখানে যদি গলদ ঢুকে যায় তো সর্ব্বনাশ। তাই চৈতন্যদেব অত কঠোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

কেষ্টদা—যতিদের সদাচার ইত্যাদি সম্বন্ধে কী করতে হবে, কী করতে হবে না—তা' খুঁটিনাটি ক'রে দেওয়া নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুঁটিনাটি করে দিইনি এইজন্য যে বিশেষ ক্ষেত্রে ওর ব্যত্যয় হ'লে অপরে তখন ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে যতিদের তাচ্ছিল্য করতে আরম্ভ করবে। একজন হয়তো অসুবিধায় প'ড়ে বিশেষ কোন সময়ে প্রস্রাব ক'রে জল নিল না, তাই দেখেই অপরে হয়তো তার বিরূপ সমালোচনা করতে আরম্ভ করবে। তাছাড়া খুঁটিনাটি ব্যাপারে মানুষের কখনও-কখনও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ও। সেইটে হয় ব'লে যদি আরও গুরুতর ব্যাপারে ব্যতিক্রমটা তার গা সওয়া মতো হ'য়ে যায় তাহ'লে তা খুব দুঃখের কথা। আর, মোটামুটিভাবে আমার তো সব কথা বলাই আছে। প্রধান জিনিস হচ্ছে যতিদের নিজেদের পবিত্র জীবনযাপনের আগ্রহ। সেইটে যদি প্রবল না হয় তবে শুধু কতকগুলি বাহ্যিক নিয়ম-কানুনের বেড়া দিয়ে কাউকে সংচলনে অভ্যস্ত করা যায় না।

এরপর গিরীশ ঘোষ মহাশয়ের লেখা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গিরীশবাবু অত্যন্ত সহজের উপর দিয়ে খুব সুন্দরভাবে জিনিসগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে কসরত বা কেরদানী ছিল না। সহজ অনুভব থেকে প্রাণস্পর্শী ক'রে লেখা। তাঁর নিজের জীবনে ভালমন্দ বহু অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি প্রবল অনুরাগের ফলে সব-কিছুর মধ্যে একটা শুভ নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় জাগায় তিনি জানতেন জীবনের নানা ঘটনা ও পরিস্থিতিকে কেমন ক'রে মঙ্গলের দিকে মোড় ফেরাতে হয়। তাই ব'লে তিনি নীতিকথার কোন বাড়াবাড়ি করেননি। মানুষের দোষ-দুর্ব্বলতা ও প্রবৃত্তি যেগুলি

আসে সেগুলিও যেমন এঁকেছেন, তেমনি মানুষ কেমন ক'রে তা' থেকে নিস্তার পায় তাও বাস্তব ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন।

১৭ই বৈশাখ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ৩০।৪।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ, পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু) প্রমুখ আছেন।

কাল রাত্রে ফিলানথ্রপি অফিসে চুরি হয়েছে। সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর পরেশদা (দত্তগুপ্ত), মণি (সেন) প্রমুখকে বললেন—চুরি করায় আমার কিছু মনে হয় না, কিন্তু চুরি হওয়ার সুযোগ দেওয়াটাকে আমার খুব অপরাধজনক এবং অবমাননাকর ব'লে মনে হয়। চুরি হবে কেন ? বার-বার চুরি হয় তবু তোমরা হুঁশিয়ার হও না কেন ? যাও, খুঁজে বের কর। কিভাবে কী হল। আর যাতে এমন না হয় তার ব্যবস্থা কর।

এমন সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ফিলানথ্রপিতে কাল নাকি চুরি হয়েছে। আপনাদেরও তেমন সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ শাসন নেই, তা' থাকলে এমন হয় না। সব সময় সজাগ থাকা লাগে যাতে অপরে আমাদের ক্ষতি না করতে পারে। অন্যের ক্ষতি করা যেমন অন্যায়, নিজের ক্ষতি হতে দেওয়াও তেমনি অন্যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার অবস্থা ভাল নয়। তাই তাঁকে বলা হচ্ছিল, দুই-একদিন যদি কথা না বলেন এবং গলাকে বিশ্রাম দেন ও ওষুধপত্র খান, তাহ'লে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সম্পর্কে বললেন—কথা যে বলব না, কিন্তু এমন সব জটিল ব্যাপার এসে পড়ে যে তখন যদি কথা না বলি, এমন গোল পাকিয়ে যায় যে পরে তার জন্য বহু হাঙ্গামা পোহাতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর মাঠে অজিতদার (চক্রবর্ত্তী) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার মনে হয় জমিদারী উচ্ছেদ না করলে ভাল হত। জমিদাররা মাঝখানে থেকে সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে shock absorver (আঘাত-সহনশীল মধ্যস্থ)-এর মতো কাজ করতে পারত। জমিদাররা যাতে প্রজার উপর কোন অত্যাচার করতে না পারে এবং তাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখে তা' দেখার জন্য প্রজাদের মধ্য থেকে তাদের মত নিয়ে কয়েকজন ক'রে সভ্য নির্ব্বাচন ক'রে একটা পরিষদ গঠন করা চলতে পারত। সরকার অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার। কিন্তু জমিদারের সঙ্গে প্রজার যে সম্পর্ক সেটা পুরুষানুক্রমিক এবং তার মধ্যে-দিয়ে যে পারস্পরিকতা এবং আত্মীয়তা গ'ড়ে ওঠা সম্ভব, সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সে-সম্পর্ক গ'ড়ে

ওঠা সম্ভব নয়। প্রজাদের মধ্যে কোন লোক যদি বেচাল চলনে চলে তাহ'লে সপরিষদ জমিদারের তাদের শাসন করার ক্ষমতা থাকা উচিত এবং জমিদার যদি অন্যায় করে, পরিষদ এবং প্রজাদের সেখানে কৈফিয়ত তলব করার অধিকার থাকা উচিত। ভালর পথ যাতে খোলা থাকে এবং মন্দের পথ যাতে সঙ্কীর্ণ হয় তেমনতর বিধি-বিধান থাকা দরকার।

অন্য কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেশে যদি Democracy (গণতন্ত্র) রাখতেই হয়, এমন কিছু থাকা দরকার যাতে মানুষের sentimental binding (ভাবগত বন্ধন) ঠিক থাকে। ইংল্যাণ্ডে যেমন আছে constitutional monarchy (সাংবিধানিক রাজতন্ত্র)। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই দেশ শাসিত হয়। কিন্তু রাজা এবং রাজ-পরিবারের লোকের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে একটা নিবিড় শ্রদ্ধার ভাব আছে। তাই ওদেশের লোক যেমন conservative (রক্ষণশীল), তেমনি liberal (উদার)। অতীতের ভাল যা-কিছু অর্থাৎ সাত্বত ঐতিহ্য যা', তা' বজায় রেখে যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলতে হবে আমাদের, তাহ'লেই সামঞ্জস্য ঠিক থাকবে।

চারিদিকে জ্যোৎস্না ফুট ফুট করছে এবং গরমের রাতে অনেকেই আশ্রম-প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সাগ্রহে সব দেখছেন।

প্রসঙ্গতঃ সুশীলদা (বসু) বললেন—দেশে আজকাল ভাল লোকের অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুই-এক সময় আমার মনে হয় দেশের মধ্যে যেন একটা cultural debauchery (সাংস্কৃতিক ব্যভিচার) ঢুকে গিয়েছে। আমাদের কৃষ্টি কী, ধর্ম্ম কী, বৈশিষ্ট্য কী, সে-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। তাই শত দুঃখ স'য়েও ইষ্ট, কৃষ্টি, ধর্ম্ম ও বৈশিষ্ট্যকে আঁকড়ে ধ'রে থাকার বুদ্ধি পুরুষ-নারী সবার ভিতর থেকে অপসৃত হ'য়ে যাচ্ছে। এতে করে মানুষগুলির আত্মিক ও নৈতিক মান নেমে যাচ্ছে। বিয়ে-থাওয়া সম্বন্ধেও আমরা কুলশীলের চাইতে অর্থনৈতিক দিকের উপর বেশী নজর দিতে শুরু করেছি। এইসব নানা কারণে ভাল মানুষ জন্মাচ্ছে কম। ক্ষেতের চাষের দিকে আমরা যতখানি নজর দিই তার চাইতে ঢের বেশী নজর দেওয়া উচিত ভাল মানুষ যাতে জন্মায় সেই দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চাই দীক্ষা-শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা। এমন সব মানুষ জন্মগ্রহণ করা দরকার যারা সারা দুনিয়াকে মঙ্গলের পথ দেখাতে পারবে। ঘরে-ঘরে যাতে নারায়ণের আবির্ভাব হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এক সময় বলত ভারতে তেত্রিশ কোটি দেবতা। তার মানে ভারতের অধিকাংশ মানুষ ছিল তখন দেবোপম চরিত্রসম্পন্ন। এমনতর মানুষের জন্ম হলেই তারা দেশের সনাতন গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে।

হিন্দু-সমাজের সংহতি সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হরিজন-আন্দোলন ক'রে হিন্দু সমাজকে আরও দুর্ব্বল ক'রে ফেলা হয়েছে। সমাজ-সংহতির জন্য প্রয়োজন পূরয়মাণ একাদর্শের অনুসরণ এবং অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ। এই দুটি জিনিস যদি থাকে তাহ'লে হিন্দুসমাজ কেন, বিরাট মানব-সমাজের সংহতি সহজ হ'য়ে ওঠে। অনুলোমক্রমে অন্য সম্প্রদায়ের মেয়ে বিবাহ করায় কোন দোষ নেই এবং এতে ক'রে সমাজের পরিধি আপনা থেকে বেড়ে যায়। আমাদের বুদ্ধি হল নীচুকে উঁচু করা। উঁচুকে নীচু করা নয়। আজকাল প্রতিলোমের ধুয়ো উঠেছে। ওতে কিন্তু সবার সর্ব্বনাশ। আর আমাদের দেশে সদাচার-সম্বন্ধে যে কড়াকড়ি ছিল সেটা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে। একজন সদাচারী লোক যদি কদাচারীর হাতে খায় তাহ'লে অসুস্থ হ'য়ে পড়তে পারে। এর মধ্যে ঘৃণার কোন কথা উঠতে পারে না। মাও যদি অসুস্থ হন সেসময় তাঁর পাতের ভাত খাওয়া চলে না।

কেষ্টদা—সবাইকে একটালাভাবে লেখাপড়া শেখান কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে শিক্ষা ছিল জীবনের সঙ্গে জড়ান—বাস্তব কাজের উপর দাঁড়িয়ে। প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা না হ'লে সেই শিক্ষা কার্য্যকরী হয় না। অনেকের ধারণা যে আমাদের দেশে আগে বিজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল না। কিন্তু সে-কথা ভুল। শুনেছি আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করার উপক্রম করল, সারস্বত ব্রাহ্মণরা এমন বিদ্যুৎ ও ঝড় সৃষ্টি করেছিল যে আলেকজাণ্ডার প্রথমটা আর অগ্রসর হতে পারেনি। রসজলনিধিতে আছে crystal (স্ফটিক) fit ক'রে (লাগিয়ে) শত শত মাইল দূরে কথাবার্ত্তা প্রচার করা যেত। আমাদের দেশে rustless steel (মরচে না ধরা ইস্পাত) বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আবিষ্কার হয়েছে। আমাদের দেশে এমন সিমেণ্ট ছিল যা' দিয়ে দালান গাঁথলে হাজার-হাজার বছরে সে দালানের কিছু হ'ত না। একটা মুশকিল হয়েছে—বহু জিনিসের পদ্ধতি আজ আমরা ভুলে গিয়েছি। আগে কী ছিল সে-সম্বন্ধে যদি গবেষণার ব্যবস্থা হয় তাহ'লে এখনও অনেক কিছু উদ্ধার হ'তে পারে। পূর্ব্বতন শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের কোন যোগ নেই। সেইটেই খারাপ হয়েছে। শুনেছি পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, কাম্বোডিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশ থেকে দলে-দলে ছাত্র আসত। বাইরের কোন দেশ ভারতকে আক্রমণ করার কথা কিংবা ভারতের কৃষ্টি ধ্বংস করার কথা চিন্তা করতে পারত না। আমাদের কত পুঁথিপত্র পরবর্ত্তীকালে নানা আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে। সেগুলির মধ্যে কী ছিল তা' তো আমরা জানিই না।

আগে ছাত্ররা শুধু পড়ত না, বিশিষ্ট ছাত্ররা সাধারণ ছাত্রদের পড়াবার দায়িত্ব গ্রহণ করত। আগে ছাত্ররা গুরুকে ভিক্ষা ক'রে খাওয়াত। তার ভিতর-দিয়ে তারা অজ্জী হ'য়ে উঠত। তারা যেমন ভিক্ষা করত তেমনি মানুষের অভাব-প্রয়োজনের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে সেগুলি পরিপূরণ করার জন্য গবেষণা করত। শুনেছি আচার্য্যের নির্দ্দেশে প্রয়োজন-উপযোগী যন্ত্রাদিও বের করত। আর, সে-সব তারা বৈশ্যদের হাতে তুলে দিত, যাতে সে-সবের সমীচীন ব্যবহার তারা করে। বহু গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। পারস্পরিক সেবা-বিনিময় চালু ছিল। পরস্পর বদলা বা বেগার দিয়ে একযোগে কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করত।

এরপর আভিজাত্য সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আভিজাত্য মানে অন্যকে ঘৃণা করা নয়। Traditional trait (ঐতিহ্যগত গুণ) বিকশিত করার সক্রিয় আগ্রহ ও চেষ্টাকেই কয় আভিজাত্য। নিজের আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য অন্যের আভিজাত্য যাতে বজায় থাকে তাও দেখা লাগে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অপরিহার্য্য ক্ষেত্রে ছাড়া মহাযন্ত্রের ব্যবহার ভাল নয়। আমি যদি সরকার হাতে পেতাম তাহ'লে ঘরে-ঘরে পারিবারিক যন্ত্র ও পারিবারিক শিল্প যাতে বেড়ে ওঠে সেই ঢেউ তুলে দিতাম। একদিন আমাদের দেশের ঢাকাই মসলিন না হ'লে রোমের অভিজাত পরিবারে চলত না। এরা সে-সময় হাতে এত সুন্দর জিনিস সব করত যে যন্ত্র তাদের সাথে পারত না। যাতে আমাদের দেশের শিল্প নষ্ট হয় সেজন্য হাজার-হাজার দক্ষ তাঁতির বুড়ো আঙ্গুল কেটে দেওয়া লেগেছিল। তাই, আমার মনে হয় বর্ণগত দক্ষতা-অনুযায়ী আবার যদি কাজকর্ম্মগুলি সাজিয়ে তোলা যায় তাহ'লে অসম্ভব কাণ্ড ঘটতে পারে। পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান থেকে যা' আমাদের নেবার তা' তো আমরা নেবই, কিন্তু সমাজের কাঠামোটা যেন থাকে আমাদের নিজস্ব ধরনের। আগে আমাদের দেশে বিপ্ররা সব-রকম কাজ শিখত অন্যকে শেখাবার জন্য। কিন্তু তারা অন্যের বৃত্তি অপহরণ করত না। যেদিন থেকে টাকা ও ভোগ বড় হ'ল, সমাজের সামগ্রিক সামঞ্জস্য ও সুখশান্তি উপেক্ষিত হল, সেইদিন থেকে আমাদের অধোগতি শুরু হয়েছে।

অজিতদা—আমরা এখন কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা দীক্ষা বাড়াও। মানুষ যাতে অন্তরে বাহিরে কোনদিক দিয়ে দুর্ব্বল না থাকে এবং প্রত্যেকে দক্ষ হ'য়ে ওঠে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পারস্পরিক সেবা-সাহায্য নিয়ে, তাই কর।

১৮ই বৈশাখ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ১।৫।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আছেন। যতিবৃন্দ এবং বহিরাগত কয়েকজন উপস্থিত।

নোয়াখালির নবদীক্ষিত এক ভাই বললেন—আমি বাড়ীতে যখন সন্ধ্যা-আহ্নিক করতাম, তখন আমার দাদা ঠাট্টা করতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে এদিকে ফিরিয়ে আনবি তোর চলন দিয়ে, চরিত্র দিয়ে, চাউনি দিয়ে, কথা দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে, রকম দিয়ে। শুধু দাদাকে নয়, তোর কলেজের অন্যান্য ছাত্রদেরও ঠিক ক'রে ফেলতে হয়।

জনৈক দাদা—ইষ্টভৃতি যদি নিয়মিত করি এবং তিন-চার মাস অন্তর পাঠাই তাহ'লে ক্ষতি কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টভৃতি-বিধির ব্যতায় হ'লে সুখ-শান্তিও ব্যত্যয়ী রকমে চলে আমাদের জীবনে।

উক্ত দাদা—ভোরে বিছানায় ব'সে বাসি কাপড়ে ইষ্টভৃতি করতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করা যায়, তবে যতটা পবিত্রভাবে করা যায় তাই ভাল।

উক্ত দাদা—সামর্থ্য যদি না থাকে তবে ইষ্টভৃতি করব কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রয়োজন হ'লে ভিক্ষা ক'রে করবে। নইলে ফুল, ফল, জল যা জোটে তাই দিয়েই করতে পার। তবে নিজে যদি অন্নজল গ্রহণ কর, ইষ্টের জন্য ভোজ্যানুকল্পে যা' পার নিবেদন করবেই। যোগ্যতাকে কখনও ফাঁকি দিও না।

উক্ত দাদা—আমাদের পারিবারিক জীবনে অশান্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে পরস্পর পরস্পরের nurturing (পোষণী) নয়, তা' কি শরীরে, কি মনে।

উক্ত দাদা—আমাদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গতি কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে বাবা-মাকে ভালবাস না।

উক্ত দাদা—সে কি বলেন ? বাবা-মাকে তো খুবই ভালবাসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি ক'য়ে দিচ্ছ যে ভালবাস না। বাবা-মাকে ভালবাসলে ভাইদের মধ্যে মিল থাকেই। আমাকে যারা ভালবাসে, তাদের মধ্যে ঐক্য হওয়াই স্বাভাবিক। ওখানে যতটুকু গরমিল, পারস্পরিক ভালবাসায় ততটুকু গরমিল।

উক্ত দাদা—বাড়ীতে প্রায়ই অসুখ-বিসুখ লেগে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসুখ-বিসুখ কেন হয় তা' নির্ণয় ক'রে সেই কারণের নিরাকরণ করতে হবে। সদাচারে চলতে হবে। আবার, পরিবেশ ঠিক না হ'লে শুধু নিজে-

নিজে ভাল থাকা যায় না। তাই, পরিবেশসহ ঠিকভাবে চলতে হয়। কতকগুলি অসুখ আসে পরিবেশ থেকে সংক্রমণ হিসেবে। কতকগুলি আছে জন্মগত। আর কতকগুলি আছে, গ্রহবৈগুণ্যজনিত রিষ্টি। জীবনে এমনভাবে চলবে যাতে সর্বদিক দিয়ে উন্নত হ'তে পার। আর, তোমার উন্নতি যেন তোমার পরিবেশেরও উন্নতি নিয়ে আসে। আবার, সপরিবেশ ইষ্টে সুকেন্দ্রিক হ'তে হবে। নচেৎ উন্নতি স্থায়ী, সার্থক ও ক্রমবৃদ্ধিপর হবে না

যামিনীদা (রায়চৌধুরী)—যাজন করি, অথচ আশানুরূপ দীক্ষা হয় না, তার কী করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাজন মানেই সৎ-কথা, সদালাপ, সৎ-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে মানুষের ভাল হবার আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা এবং সেই আগ্রহ যখন জাগে তৎক্ষণাৎ মানুষকে ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেওয়া। বিবেচনা ঢুকিয়ে দিলে মুশকিল। আবার, আমার চলন যদি শ্রদ্ধার্হ না হয়, তবে আমাকে দিয়ে অন্যের ভিতর আমার ইষ্ট সঞ্চারিত হন কম। যে-সব মানুষ ইষ্টে সুকেন্দ্রিক হয়, তা'রা স্বতঃই পারস্পরিক স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে। তাদের মধ্যে আসে একটা প্রীতি, মমত্ব, সেবাবিনিময়, সহনশীলতা। তা' থেকেই আসে শান্তি। নচেৎ শান্তিবৈঠক ক'রে শান্তি হয় না। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, অশান্তির মূলে থাকে তাদের প্রবৃত্তিবশ্যতা। প্রবৃত্তির অধীশ্বর যিনি তাঁকে ভালবেসে মানুষ যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ না করে এবং পরস্পর পরস্পরের ভাল না করে তাহ'লে ঐক্য, সুখ, শান্তি সুদূরপরাহত।

যামিনীদা—আমার আত্মনিয়ন্ত্রণ হ'চ্ছে না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আমার কতকগুলি complex (প্রবৃত্তি) আছে, যেগুলিকে আমি ক্ষমা করি, লাই দিই বা আপোষরফায় বজায় রেখে চলি—যদিও তারা আমার শ্রেষ্ঠ-পরিচর্য্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

কেষ্টদা—বুদ্ধদেব ব'সে-ব'সে চিন্তা ক'রে নির্ব্বাণ লাভ করলেন কিভাবে ? কাজকর্ম্ম ছাড়া কি আত্মনিয়ন্ত্রণ হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মপর্য্যালোচনা, আত্মপর্য্যবেক্ষণের ভিতর-দিয়ে তিনি নিজের দোষ-ত্রুটি আবিষ্কার ক'রে সেইগুলি adjust (নিয়ন্ত্রণ) করেছিলেন। অবশ্য, তপস্যা ও কাজের মধ্য-দিয়ে সক্রিয়ভাবে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করলেই ভাল হয়। তাই আমি সক্রিয় প্রচেষ্টা, সাধনা ও অভিব্যক্তির উপর অত জোর দিই।

চৈতন্যদেবের মধ্যে ছিল একটা ভাবভক্তির উম্মাদনা। বুদ্ধদেবের মধ্যে ছিল একটা স্থির প্রশান্তি। বুদ্ধদেব অল্প বয়সে মা হারিয়েছিলেন। যীশুর বাবার সঙ্গে ছিল কম। এই শূন্যতা তাঁদিগকে প্রীতি-গম্ভীর করেছিল। আবার, চৈতন্য-

দেব ছিলেন প্রীতি-উচ্ছল। একটা রকম যেন প্রশান্ত মহাসাগর, আর-একটা রকম যেন আটলান্টিক মহাসাগর।

স্পেন্সারদা—মানুষ পূর্ণতা লাভ করে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের থাকা চাই একজন শ্রেষ্ঠ। আর তাঁতে concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া চাই with indomitable unrepelling adherence (অদম্য অচ্যুত নিষ্ঠা সহ)। সাধারণতঃ প্রবৃত্তিগুলি আমাদের টেনে নিতে চায় তাদের ভোগোপকরণ সংগ্রহের দিকে। কিন্তু প্রবৃত্তির উপর আমাদের যতখানি টান, ইষ্টের উপর যদি তার চাইতেও বেশী টান থাকে তাহ'লে প্রবৃত্তিটান এবং ইষ্টানুরাগ এই দুয়ের মধ্যে যে সংগ্রাম শুরু হয় তাতে ইষ্টানুরাগই জয়ী হয় এবং প্রবৃত্তিগুলি স্বভাবতঃই ইষ্টের অনুগত ও অধীন হয়। এইভাবে প্রবৃত্তিগুলি যখন বশে আসে তখন মনুষ্যত্ব জেগে ওঠে। আমাদের সুপ্ত গুণগুলি বিকশিত হয়। অখণ্ড ব্যক্তিত্ব থাকে ব'লে তারও উদ্বোধন হয় ঐ পথে। যিনি পূর্ণ তাঁকে যখন আমরা সর্ব্বৃত্তি দিয়ে ভালবাসি ও পূরণ করি, তখনই আমরা perfection বা পূর্ণত্ব অধিগত করতে পারি।

কেষ্টদা—একরাত্রে কিভাবে নির্ব্বাণ জেগে উঠল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পিংপুলিয়া হরিদাসের কথা ধরেন। সে ভাব হবার জন্য চোখে পিপুলের গুঁড়ো দিয়ে কাঁদত, ঐভাবে চেষ্টা করতে-করতে টক্ ক'রে একদিন খুলে গেল। লালাবাবুর কথা ধরেন। তিনি পাল্কীতে ক'রে যাচ্ছেন। এক ধোপার মেয়ে বলছিল—"বাবা! বেলা তো যায়, বাসনায় আগুন দেবে না।" অমনি চট্ ক'রে লালাবাবুর মাথায় নতুন ক'রে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তাধারা এসে গেল। লালাবাবুর আগে অনেকখানি করা ছিল এবং ঐ-জাতীয় সংস্কার ছিল ব'লে হঠাৎ কথাটা তাকে পেয়ে বসল। পট্ ক'রে কিছু হয় না। নানারকম দ্বন্দ্বের ভিতর-দিয়ে সেগুলির নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধান করতে-করতে একটা enlightening conclusion (জ্ঞানোজ্জ্বল সিদ্ধান্ত) এসে যায়।

আমি নাম করতাম। এমন গেছে যে ছ'মাস যাবৎ কোন কিছু নেই। কোন রস-কস নেই। ভিতরটা যেন শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। নিজের অবস্থা কাউকে কওয়ার মতো মানুষ ছিল না। তবু একগুঁয়ে রকমে দাঁড় টেনে যেতাম দোয়াড়ে। তখন চকিতে হয়তো এমন আসল যে আনন্দে অস্থির। সে আনন্দ এত দুর্দ্দান্ত যে শরীর যেন ফেটে চৌচির হ'য়ে যায়। জলের মধ্যে খুঁটি পুঁতে সেখানে যেয়ে ধ'রে পড়ে থাকতাম। কিন্তু তবু কি আনন্দ কমে। দম বন্ধ হ'য়ে প্রাণ যায়-যায়, তখনও ঐ আনন্দ পাগল ক'রে তুলত। মনে হ'তো আমি ভুত না মানুষ! কেবল ক'রেই

চলতাম। অবাধ্য, অনিবার্য্য নেশা। তীব্রভাবে নামধ্যান, ভজন না ক'রে যেন রেহাই ছিল না।

শরৎদা—মা'র উপর অনুরাগ থেকে কি এ-সব করতেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা'র উপর টান তো ছিলই। মা যা' ব'লে দিয়েছিলেন তাই করতাম। মা'র উপর টান চলছে এখনও জবর। সে এক irresistable (দুর্নিবার) জিনিস। আমার যা'-কিছু মাকে কেন্দ্র ক'রে। ঐ নেশাই আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। হুজুর মহারাজের কথা তো মার কাছে শোনা, তাঁকে তো দেখিনি। দেখলাম, করার ভিতর-দিয়ে যা' পেলাম, তা' দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই explained (ব্যাখ্যাত) হয়। বস্তুজগৎ অধ্যাত্ম-জগৎ বাদ দিয়ে নয়। বিজ্ঞানে যেগুলি অঙ্কের রকমে বলে, এগুলি আমি ছেলেবেলা থেকে নিজ চোখে দেখেছি। তার নানা পর্য্যায় সাধনার সময় নানাভাবে ধরা পড়েছে। তাই, সেগুলি আমার কাছে এই স্থূল জগতের মতই সত্য। অত্যন্ত শক্তিমান মাইক্রোস্কোপ ও টেলিস্কোপ দিয়ে যা' না দেখা যায় তা' সাদা চোখেই দেখা যায় যদি আমাদের ইন্দ্রিয় তেমন sensitive (সাড়াপ্রবণ) হয়। আমি কোন জিনিসকে বিজ্ঞান ব'লে জানতাম না। হরতকিবাগানে গিয়ে যখন এইসব কথা বলতাম, শশাঙ্ক, বিধু ওরা বলত যে, বিজ্ঞানে ঐসব কথা আছে। তখন আমার খুব confidence (আস্থা) আসল। আর, আমি বুঝি আপনারাও যদি ঠিকমত করেন তাহ'লেই হয়।

কেষ্টদা—কোন্‌টা বড়। করা না হওয়া ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না করলে কি হয় ?

কেষ্টদা—সব হবার পর কি এমনতর মনে হয় যে এটা বিশেষ কিছু না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হত, আমার যেমন হয়েছে, সবার তেমনি হয়।

১৯শে বৈশাখ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ২। ৫। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আসীন। যতিগণ, সুশীলদা (বসু), সুরেনদা (শূর) প্রমুখ আছেন।

সুরেনদা রানাঘাট আশ্রমের একটা Plan (নকশা) দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাই কর আমার যেন নদীর ধারে একটা নিরিবিলি জায়গা থাকে এবং যতি-আশ্রমটা কাছে থাকে—চল্লিশজন যতির ব্যবস্থাশুদ্ধ।

শরৎদা (হালদার)—বুদ্ধদেব সব জেনেশুনেও মেয়েদের ভিক্ষুণী ব্রতে দীক্ষিত করার ব্যাপারে রাজি হলেন কেন ? ঐ তো একটা পতনের ছিদ্র র'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর পিছনে ছিল আনন্দ। ঐভাবে ধরলে রাজি না হ'য়ে করেন কি? আমিও তো কত সময় আপনাদের নাছোড় পীড়াপীড়িতে কোন-কোন ব্যাপারে মত দিতে বাধ্য হই। অবশ্য যখনই তেমন করি, সঙ্গে-সঙ্গে সাবধান ক'রে দিই—এই করলে এই হ'তে পারে। সুতরাং এটা করলেও তার থেকে যে ক্ষতি হ'তে পারে তার প্রতিকার হিসাবে এই-এই করা দরকার। নিরাকরণের জন্য যা' করণীয় তাও ব'লে দিই। শ্রীকৃষ্ণ যে গৃহস্থী ব্যবস্থা করেছিলেন সেইটেই অনেকখানি নিরাপদ। তাই অতদিন পর্য্যন্ত সে ধারাটা নিরাবিলভাবে ব'য়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয় সন্ন্যাস নেওয়া যায় না। সন্ন্যাস আসে বিধিমাফিক অন্যান্য আশ্রমের নীতিগুলি পরিপালনের ভিতর-দিয়ে।

সুশীলদা একজনের নাম ক'রে বললেন—ওমুক অবসাদের দরুন মাতালের সঙ্গ ধ'রে মদ খেতে শুরু করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবসাদের দরুন কিন্তু সঙ্গে পড়ে না, প্রবৃত্তির টানে সঙ্গে যেয়ে ভেড়ে। কেউ নিজেকে দোষ দিতে চায় না, তাই ঐভাবে বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় রোহিণী রোডের পাশে মাঠে এসে বসেছেন। আজ এখনও গরম হাওয়া বইছে।

সরোজিনীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পাখা দিয়ে বাতাস করছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), কান্তিদা (বিশ্বাস), কিশোরীদা (চৌধুরী), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রবোধদা (মিত্র) প্রমুখ অনেকেই কাছে আছেন।

প্রবোধদা বললেন—ছয়শো মহাধনী মাড়োয়ারি স্বেচ্ছায় শপথ গ্রহণ করেছে যে তারা মদ খাবে না, ভেজাল দেবে না, ওজনে কম দেবে না এবং চোরাকারবারীর প্রশ্রয় দেবে না।

এ-কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তা' ভাল। ওতে আরও অনেকে উৎসাহিত হবে। মোটপর মানুষ মানুষের সহায় না হ'লে হবে না। কিন্তু আজকাল সরকার অনেক সময় বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। তারা চায় যে, সব ব্যাপারে সরকারী কর্তৃত্ব থাকুক। কিন্তু সরকারী হস্তক্ষেপ যত বেশী হয়, ততই সেখানে গোল ঢুকে যায়। আগেও ঘুষঘাষ নিত, কিন্তু তার সঙ্গে একটা লজ্জা জড়ানো ছিল এবং তখন এ ব্যাপারটা এত ব্যাপক হয়নি। আজকাল রক্ষকই ভক্ষক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। যে সরষেকে দিয়ে ভূত ছাড়াবে, সেই সরষেকেই যদি ভুতে পেয়ে বসে তাহ'লে আর উপায় কী?

বীরুদা (রায়) কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যীশুখৃষ্টের নানারকম দর্শন হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ঐ-রকম হয়। বিশেষ-কিছু বলতে গেলে vision-এর (ছবি) মত না আসলে বলতে পারি না। দেখে-দেখে বলি। তাই তাতে আমার

আয়াস লাগে না। মনে হয় সবই পরমপিতার কাজ। তিনিই করান। নইলে আমার এমন কোন বিদ্যেবুদ্ধি নেই যে কিছু কইব বা করব।

প্রবোধদা—হিংস্র জন্তুকে হত্যা করা কি অপরাধ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাকে যদি কেউ মারতে আসে তোমার তাকে resist (প্রতিরোধ) করাই লাগবে। তাই করতে গিয়ে তাকে যদি মারা অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে সেখানে আর উপায় কি ? ধর, একটা বাঘ লোকালয়ে এসে মানুষ-গরু ইত্যাদির প্রাণহানি করে এবং তা' নিরাকরণের কোন পথ যদি না থাকে, সেখানে ঐ বাঘটাকে মারা দোষণীয় নয়। অবশ্য, ঐ বাঘকে যদি আটক ক'রে রাখা যায় সে অন্য কথা।

আজ বৌদ্ধ পূর্ণিমা। চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নাস্নাত। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সবাই নীরবে ব'সে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও আত্মসমাহিতভাবে আছেন। তাঁকে এইবার তামাক সেজে দেওয়া হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে খেতে নীরবতা ভেদ ক'রে হঠাৎ বললেন—বীরুদা, আপনি সকালে ক'টায় ওঠেন ?

বীরুদা—সাড়ে তিনটেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উষাকালে সূর্য্য ওঠেনি, অথচ পূব দিকে আলো এসেছে, তখন চেয়ে দেখবেন কত রকম রঙ দেখা যায়। ঐ-সব রঙ দেখলে মনের মধ্যে অন্তর্মুখী ভাব জাগে। যারা নাম-টাম ঠিকমত করে তারা অন্তর্জ্জগতে যে-সব আনন্দ অনুভব করে এবং তাদের মধ্যে গভীর চিন্তাশীলতার যে-সব ধারা জাগে তার কোন তুলনা হয় না। যখন যে-রকম অনুভূতি জাগে সেটা লিখে রাখলে পরে সেইগুলি প'ড়ে আবার উদ্দীপন হয়। সবার যে ঠিক একই রকম অনুভূতি হয় তা' কিন্তু নয়। তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী রকমারি থাকে।

বীরুদা—আপনার কথিত কোনও কথা ঠিকভাবে লিখে রাখলেও অনেক সময় মানুষ তার ভুল ব্যাখ্যা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উল্টোরকম ব্যাখ্যা করতে চাইলেও মিলবে না। এর একটা মূল আছে। একটা fact (তথ্য)-ই নানানটার উপরে প্রয়োগ ক'রে নানা কথা বলা। যেমন, তালার চাবির নম্বর থাকে, ঠিক সেই নম্বরী চাবি না হ'লে তালা খোলে না। আমারও তেমনি বলার যে সূত্র আছে, সেই ঘাটে না ফেললে সঙ্গতি পাওয়া যাবে না। উল্টোতে চাইলে মিল করা যাবে না, ঠেকে যাবে।

২০শে বৈশাখ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ৩।৫।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু),

যতীনদা (দাস), শরৎদা (হালদার), হরিদাসদা (সিংহ), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ উপস্থিত আছেন।

কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—ইষ্ট গ্রহণ করার পর আমাদের কর্ম্মফলগুলি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটি কর্ম্মই আমাদের মাথায় একটা ছাপ ফেলে, এবং ব্যুৎপত্তিও সৃষ্টি হয় সেই অনুযায়ী। সেই ব্যুৎপত্তি আবার পরে আমাদের কর্ম্মকে পরিচালিত করে। সদ্‌গুরু গ্রহণ করার পর ঐ ব্যুৎপত্তির মধ্যে যদি এমনতর পরিবর্ত্তন সৃষ্টি হয় যার দরুন আমাদের প্রবৃত্তিমুখরপ্রবণতা ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত হয় তাহ'লেই কর্ম্মফলের কিছুটা নিরসন হচ্ছে ব'লে বোঝা যাবে। নামধ্যান খুব করতে হয়। তখন মস্তিষ্কের বহু গুপ্ত ও সুপ্ত প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করে। তার প্রত্যেকটা ধ'রে-ধ'রে ইষ্টের দিকে মোড় ফেরাতে হয়। প্রত্যেকটি চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম আত্মকেন্দ্রিক না হ'য়ে ইষ্টকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠা চাই। এক কথায়, সত্তার আমূল রূপান্তর না হ'লে হয় না। যে-জীবনটা এতদিন ঘুরছিল, 'আমি আমার, আমি আমার' ব'লে, তা' আবর্ত্তিত হওয়া চাই ইষ্টসর্ব্বস্ব হ'য়ে। ইষ্টের জন্য আমি এই বোধটা পাকা হওয়া দরকার।

কেষ্টদা—কোন একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলুন, কিভাবে একটা খারাপ প্রবণতা প্রশমিত হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরুন, একজনের ভিতর চৌর্য্য প্রবণতা আছে। সে আপনার ঘরে গিয়ে একটা পেন্সিল আনল, বলার প্রয়োজন বোধ করল না। তখন আত্মবিশ্লেষণ ক'রে দেখল, চৌর্য্যপ্রবৃত্তি ঐ কাজ করেছে এবং তা' বোঝার পরই আপনাকে গিয়ে বলল। আবার হয়তো এমনও হ'তে পারে যে আমার কাজের জন্য এনেছে তাই বলেনি। তখন আবার চিন্তা ক'রে দেখল যে, ঠাকুরের কাজে আনলেও বলার প্রয়োজন ছিল। আর, যদি লোক না পায় তখন একটা কাগজে লিখে এমন জায়গায় রেখে আসা উচিত ছিল যাতে সবার নজরে পড়ে। এইভাবে যত সময় পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র দুর্ব্বলতা থাকে তত সময় পর্য্যন্ত সে যদি নিজেকে রেহাই না দেয় এবং ক্রমাগত আত্মসংশোধনে তৎপর থাকে, তাহ'লেই এক-একটা খারাপ গ্রন্থির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হ'তে পারে। নিজের দোষ-দুর্ব্বলতাকে আদৌ ক্ষমা করতে নেই। আপনি হবেন আপনার দুর্ব্বলতার সর্ব্বপ্রধান শত্রু। এমন হ'লে এক-একটা ধ'রে-ধ'রে সংশোধন করা যায়।

কেষ্টদা—অবিধিপূর্ব্বক প্রতিগ্রহ ঋত্বিকরা তো খুব করে। তাতেও তো জন্ম-জন্মান্তর ভুগতে হতে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইরকম কত ব্যাপার আছে। আমরা মানুষের কাছ থেকে যা'ই গ্রহণ করি তা' এমনভাবে করা উচিত যাতে সে কোনভাবে ব্যাহত, বিড়ম্বিত বা বিক্ষুব্ধ না হয়। আমি যদি কারও কাছ থেকে কিছু নিই, আমার মাথায় থাকে কেমন ক'রে সে তার বহুগুণ পেতে পারে। তাকে সেইভাবে বুদ্ধি, বিবেচনা, উৎসাহ, উদ্দীপনা দিতে কসুর করি না। আমার জন্য যারা সংগ্রহ করে, তাদের মধ্যেও সেই ধান্ধা থাকা দরকার। কেউ যদি ধাপ্পা দিয়ে নেয়, তাহ'লে ধীরে-ধীরে তা'র পাওয়ার পথই রুদ্ধ হ'য়ে যেতে থাকে।

শরৎদা—কোষ্ঠি দেখে অনেক সময় মানুষের বিপদ-আপদের কথা বলা যায়। কিভাবে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে করেন, জন্ম-লগ্ন-রাশি ইত্যাদি আছে। লগ্ন থেকে বোঝা যায় তার চেহারা, গঠন কেমন হবে। আর চন্দ্র যে রাশিতে আছে তা' দেখে বোঝা যাবে তার মন কেমন হবে। যে রাশিতে যে গ্রহ থাকে, সেখানে সেই গ্রহটাই যেন complex (প্রবৃত্তি)। প্রত্যেকটা রাশি ও গ্রহের character (চরিত্র) আছে, action (ক্রিয়া) আছে। যে-ঘরে যে-গ্রহ থাকে, সেইটেই যেন তার চালক। আবার, বিভিন্ন গ্রহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব আছে। এইভাবে ছকটা থেকে গ্রহের বিন্যাস পেলেন। গ্রহগুলি সরছে, নবগ্রহের স্থান পরিবর্ত্তন হচ্ছে। তার মানে ঐ গ্রহসমাবেশ অনুযায়ী এক-একজনের জীবনে এক-এক জাতীয় পরিবর্ত্তন আসছে। জন্ম থেকে বয়েস বাড়তে লাগল। তার মানে গ্রহ-অভিভূত গ্রন্থিগুলির সংক্রমণ তেমনভাবে হ'তে লাগল। তাই নিয়েই তার জীবন চলল। ঐগুলির ভিতর-দিয়েই বোঝা যায়, তার জীবনে কখন কী ঘটবে। পরাশরে আবার আছে ইষ্টনিষ্ঠ হ'লে সব ফল খাটে না। Complex-এর (প্রবৃত্তির) রং বদলে যায়। কারণ, সেগুলি ইষ্টানুরাগে অনুরঞ্জিত হ'য়ে ওঠে।

কেষ্টদা—কেউ যদি ইষ্টার্থে চুরি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থী ও লোকহিতী দুইই হওয়া চাই। একটা কাজ লোকহিতী না হ'লে কিন্তু ইষ্টার্থী হয় না।

যতীনদা—বৃহস্পতি কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃহস্পতি মানে বৃহৎ পতি। Great controlling agent of the whole system (সমস্ত বিধানের পরম নিয়ন্তা)। বৃহস্পতির মানুষ মানে গুরুর মানুষ। সে গুরুর প্রভাবে চলে।

যতীনদা—সে যদি সদ্‌গুরু গ্রহণ না করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃহস্পতি ভাল থাকলে সে করেই।

কেষ্টদা—একজনের বৃহস্পতি যেমন জোরালো, অন্য আর একটা খারাপ গ্রহও হয়তো তেমনি জোরালো, সেখানে কী হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজন হয়তো যৌন প্রবৃত্তি দ্বারা অভিভূত, আবার হয়তো গুরুবল আছে। তখন সে বিল্বমঙ্গলের মত হয়। ঐ যৌন আবেগকেই মোড় ফিরিয়ে গুরুতে সার্থক হ'তে ছোটে। লগ্ন আর গ্রহ সমাবেশ দেখে ব'লে দেওয়া যায়, যে মাতৃগর্ভে আসার সময় তার পিতামাতার ভাবভূমি কেমন ছিল।

সুশীলদা—একজনকে দেখে তার নাম বলে কী করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাকে দেখে হয়তো ঠিক পাওয়া যায়, কেমন লোক বা কে আপনার নাম রাখবে। তেমন লোক আপনার এ চেহারা দেখে কী নাম বলতে পারে, তাও বোঝা যায়।

কেষ্টদা—আপনার তো ছবির মত ভেসে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটু অনুশীলন করলেই পারা যায়। সমস্ত হিসাব-সহ vision (ছবি) জেগে ওঠে।

শরৎদা—হাতের রেখা দেখে কিভাবে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেও ঐ। হাতের রেখা দেখে মাথার ছাপ এবং স্নায়ুবিধানের অবস্থা ধরা পড়ে। তা' থেকেই সব অনুমান করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন।

কান্তিদা (বিশ্বাস), চন্দ্রদা (মুখার্জী) এবং পূজনীয়া রাঙামা (ভূষণীমা) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মন যখন কেন্দ্রায়িত উৎফুল্লতা নিয়ে সক্রিয় হ'য়ে সেই অনুযায়ী পা ফেলে-ফেলে চলে, তখন অসুখ-বিসুখ কম হয়। হ'লেও তাড়াতাড়ি সেরে যায়। তার মানে তখন vitally exalted (প্রাণসম্বেগে উন্নত) থাকে। ঐ অবস্থায় রোগ প্রতিরোগ ক্ষমতা এবং আরোগ্যলাভের শক্তি ইত্যাদিও বেড়ে যায়। তাই, রোগ-সংক্রমণ হ'লেও বেশি কাবু করতে পারে না।

স্মরাজিৎদা (ঘোষ) এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্মরজিৎ অর্থাৎ কামজিৎ না হ'লে মানুষ সুবুদ্ধি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বললেন—যে সময় কথাবার্ত্তা কই, কাজে থাকি, ভিতরে একটা বোধ থাকে মা আছে। কিন্তু কথাটা বা কাজটা শেষ হয়ে গেলেই মনে হয় সত্যিই তো মা নেই।

২১শে বৈশাখ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ৪। ৫। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে উপস্থিত। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও যতিবৃন্দ কাছে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন। তারপর সেই সম্পর্কে বললেন—আপনি হয়তো একজনের সঙ্গে অনেক ভাল কথা বললেন এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে নানা consideration (বিবেচনা) এনে দিলেন, কিন্তু একটা active urge (সক্রিয় আকূতি) গজিয়ে দিতে পারলেন না, যাতে সে উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে যায়, তাহ'লে কিন্তু হল না।

আজকাল আমাদের দেশে বেশীর ভাগ শিক্ষিত লোক অনেক কিছু জানে, কিন্তু সেই জানাগুলির মধ্যে সঙ্গতি নেই। তাই তাদের মধ্যে করার সম্বেগ কমই দেখা যায় এবং পরের অধীনে চাকরী করা ছাড়া পথ দেখে না।

কেষ্টদা—পঞ্চবর্হি'র মধ্যে যেমন এক এবং অদ্বিতীয়ের শরণাগতির কথা বলা হয়েছে। আমাদের জীবনে তার প্রয়োজন কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর--ঐটেই চলে আমাদের জীবনের সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে।

কেষ্টদা—সে কী রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন বাবা-মাকে কেন্দ্র ক'রে ছেলেমেয়ে সুকেন্দ্রিক হ'তে চেষ্টা করে। বাবা-মার উপরে আছেন আবার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ গুরু। এইভাবে ক্রমান্বয়ে বিশ্বের মূল কেন্দ্রে সব-কিছুর সার্থকতা লাভ করে। মানুষ পিতামাতায় যতখানি কেন্দ্রায়িত হয়, বংশগত ঐতিহ্যের উপর তত তাদের আনুগত্য হয় এবং পিতামাতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা, তাদের সঙ্গে সঙ্গতি নিয়ে চলার বুদ্ধিও তত হয়।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ যত প্রবৃত্তির দাস হয়, ততই তার ব্যক্তিত্ব বিখণ্ডিত হয়। তাই শ্রেয়নিষ্ঠ হওয়া মানুষের এতই প্রয়োজন। আবার, পিতামাতার বিকেন্দ্রিক রকম থাকলে সন্তানও তেমনতর ভাব পায়। তার কারণ ক্রোমোজম ও জিনগুলিও ঐভাবে রঞ্জিত হ'য়ে থাকে।

২২শে বৈশাখ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ৫। ৫। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রবোধদা (মিত্র) এবং যতীনদা (দাস) আছেন।

তাঁর সঙ্গ করার ফল সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনেকেই কিন্তু আমার সঙ্গে থেকেও আমার সঙ্গ করে না। সে তার শামুকের খোরাক সংগ্রহ করে। আমার কথা থেকে সেইটুকু নেয়, যেটুকু

তার প্রবৃত্তির পরিপোষণী। ঠিক-ঠিক আত্মনিয়ন্ত্রণে আগ্রহশীল হ'লে কথাগুলি পুরোপুরি নেয় এবং সেইমত চলতে চেষ্টা করে। তাদের চরিত্রের উপর তার প্রভাব পড়েই।

শরৎদা—আমরা সাধারণতঃ আপনার সেই কথাগুলিই নিই যা' আমাদের প্রবৃত্তির সঙ্গে খাপ খায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যে-প্রবৃত্তি ইষ্টের কাজে লাগে না, তার সঙ্গে আমি আপোষ-রফা করতে পারি না। অনেক সময় ইষ্টের নির্দ্দেশ এবং আমাদের প্রবৃত্তি এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্বের মধ্যে-দিয়ে আবার সমাধান হয়। ধীরে-ধীরে ইষ্টের উপর টানটা নিঃশ্বাসের মত স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। আর, তখনই জীবনটা উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাজলের মা ওর ব্রতভিক্ষার টাকা দিয়ে ওকে হীরের আংটি ক'রে দিতে চায়। কিন্তু কাজল বলে তা' দিয়ে কী হবে। ও টাকা তো সবাই দিয়েছে, যার যেখানে যেমন প্রয়োজন সেই বুঝে তাদের জন্য খরচ করলেই হয়। মা-বাবার উপর টান থাকলে বুদ্ধিটা এমনতর স্বচ্ছ হয়।

কেষ্টদা—গীতায় আছে—

'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।'

(দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে নিঃস্পৃহ এবং আসক্তি, ভয় ও ক্রোধরহিত মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন।)—এর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-কথার মানে হচ্ছে সুখ-দুঃখে unbalanced (সাম্যহারা) না হওয়া। এতে দুঃখও ঠিক পাওয়া যায়, সুখও ঠিক পাওয়া যায় এবং দুয়েরই ঊর্দ্ধে থেকে সেগুলিকে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার সহায়ক ক'রে নেওয়া যায়। যারা প্রকৃত ভক্তিমান, তারা সব-কিছুর মধ্যে কিছুটা অবিচলিত থাকে। কারণ, তাদের মূল লক্ষ্যটা ঠিক থাকে। আমার কিন্তু মানুষের জন্য বড় শঙ্কা হয়। ভাবি, এরা নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলতে পারে না, তাই কোন্ সময় কী বিপদেই জানি পড়ে।

শরৎদা—আপনার নিজের জন্য কোন শঙ্কা বা দুশ্চিন্তা হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজ কথার তো মানে হয় না আপনাদের বাদ দিয়ে। মানুষ যেমন তার পরিবারবর্গকে নিয়ে নিজেকে feel (অনুভব) করে, আমারও তেমনি আপনাদের প্রতি-প্রত্যেককে নিয়ে যা'-কিছু নিজ বোধ। ও বাদ দিয়ে পারারও জো নেই।

আমার মমতা কেবলই বাড়ছে। আর, সবার জন্য মমতা যেন অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য।

কেষ্টদা—সুখদুঃখের বোধ নেই এমনতর নিৰ্ব্বাণের অবস্থাটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো নিৰ্ব্বাণ হ'ল না। আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। মমতাই বেড়ে যাচ্ছে। মমত্ব না থাকলে নিজের বাঁচার দিক দিয়ে সুবিধে হ'তে পারে। আমার নিজের সুবিধা-অসুবিধার জন্য যে খুব একটা সুখ-দুঃখ বা রাগ-বিদ্বেষ হয়, তেমন বোধ করি না। বুদ্ধদেব প্রমুখও বোধহয় নিছক নিজের সম্পর্কে ঐ-রকম নির্লিপ্ততার কথা বলেছেন। নইলে বুদ্ধদেবের মধ্যে তো হৃদয়বত্তার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। প্রবৃত্তিগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে যারা সাত্বতভূমিতে বিচরণ করে, সবার প্রতি তাদের দরদ স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ বাদে বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন।

সুশীলদা (বসু), অজয়দা (গাঙ্গুলী), কিশোরীদা (চৌধুরী), হরিপদদা (সাহা) প্রমুখ ছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের প্রয়োজন আছে বহু, কিন্তু করবে না কিছু, কারও সঙ্গে সদ্ব্যবহারও করবে না, সবাইকে চটিয়ে রাখবে। তাই সব-কিছুই আমাকে দিয়েই করিয়ে নিতে চায়। টাকা জোগাড় ক'রে দেওয়া, ডাক্তার ডাকা, ওষুধের ব্যবস্থা করা, যখন যার যে সাহায্য প্রয়োজন সে ব্যাপারে ব'লে দেওয়া—ইত্যাদি যাবতীয় যা'-কিছু আমার ক'রে না দিলে হয় না। নিজে কিছু করবে না, কাউকে কিছু ব'লে-ক'য়ে কিছু করিয়ে নেবে, তাও পারে না। প্রত্যেককে এমন ক'রে তিক্ত, বিরক্ত, বিরূপ ক'রে রাখে যে কাউকে কিছু বলতে সাহস পায় না। সবাই এমন নয়। কিন্তু কয়েকজন এইরকম যারা আছে, তাদের এসব তাল দিতে গিয়ে যা' করণীয় ব'লে মনে করি, তা' আর ক'রে উঠতে পারি না। মূল কাজেরই ক্ষতি হয়।

২৩শে বৈশাখ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ৬।৫।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট।

হাউজারম্যানদা, প্রবোধদা (মিত্র), কান্তিদা (বিশ্বাস), রাজেনদা (মজুমদার), প্রকাশদা (বসু) প্রমুখ কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভারতীয় সমাজতন্ত্রের একটা প্রধান জিনিস ছিল সামাজিক শাসন। লোকেই লোকের শাসন করত। কোর্টে যাওয়া লাগত কম। মানুষ এমনতর আচরণ করতে সাহস পেত না, যে দৃষ্টান্তে সমাজের লোকের খারাপ

হ'তে পারে। তা' করলেই সকলে মিলে ঠেসে ধরত। কিছুতেই রেহাই দিত না। মানুষ যত প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী হ'য়ে উঠল, ততই সামাজিক শাসনের বিরোধিতা করতে লাগল।

হাউজ্জারম্যানদা—মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তো থাকবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার স্বাধীনতা আছে বাঁচাবাড়ার পথে চলার। কিন্তু তুমি যদি আত্মহত্যা কর, তাহ'লে আইনতঃ তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। আবার, তুমি যদি অন্যের ক্ষতি কর, মানুষ তোমাকে চেপে ধরবে। তোমার ভালোর জন্য যদি তুমি পুরস্কৃত হও, তাহ'লে তোমার মন্দের জন্য তুমি তিরস্কৃত হবে না কেন ?

সুরেনদা (ঘোষাল) কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোকের গচ্ছিত কুড়িটি টাকা খরচ ক'রে ফেলেন। সুরেনদা সেই কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানানোতে তিনি তাকে ভিক্ষা ক'রে পঁচিশটা টাকা তুলতে বলেন। কয়েকদিন ধ'রে উক্ত পঁচিশ টাকা ভিক্ষা ক'রে এনে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—ভিক্ষা করা হয়ে গেছে, এখন কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুড়ি টাকা যার ভেঙেছিস তাকে দিবি। আর পাঁচ টাকা দিয়ে জনা পাঁচেক গুরুভাইকে খাইয়ে দিবি। আর তাদের কাছে খুলে বলবি, আমি অমুকের এই টাকা ভেঙ্গে ফেলেছিলাম—আশীর্বাদ করুন ভবিষ্যতে যেন আমি কখনও এমন কাজ না করি।

২৮শে বৈশাখ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ৭। ৫। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আসল জিনিস হ'লো মানুষের কাছে তৃপ্তিপ্রদ ও স্বস্তিকর হ'য়ে ওঠা। যে-মানুষ এমনতর, তাকেই মানুষ ভালবাসে। পূর্ব্বকালের গুরুরা শিষ্যদের সঙ্গে যে দুর্ব্ব্যবহার করতেন—তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ঐ কঠোর দুর্ব্ব্যবহার stand (সহ্য) ক'রেও যদি নিজেরা তৃপ্তিপ্রদ ও স্বস্তিকর চলনা maintain ক'রে (বজায় রেখে) যেতে পারে, তাহ'লে যে-কোন environment (পরিবেশ)-এ পড়ুক না কেন, ভাবনা থাকে না—কেউ তাদের দুঃখ দিতে পারবে না, সুখ তো তাদের প'ড়েই আছে—সারাজীবন সুখ ভোগ করতে পারবে—কিন্তু দুঃখ পাওয়ার পথ বন্ধ হ'য়ে যাবে। আর, তাদের চরিত্রও এমনভাবে গ'ড়ে উঠবে যে, যে-কোন লোককে manipulate (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে চলতে পারবে। আর, তা' না ক'রে গুরু যদি শুধু praise (প্রশংসা) করেন, তাহ'লে যাদের দিয়ে তারা praised (প্রশংসিত) ও flattered (তুষ্ট) হ'বে না তাদের সঙ্গে প্রীতির সাথে চলতে পারবে না।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—সব থেকে খারাপ জিনিস হ'ল গুরুর কাছ থেকে নেওয়া। মানুষ তখন নেওয়াতেই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে পড়ে। এটা একটা বাধা হ'য়ে পড়ে। তাতে যোগ্যতা নষ্ট হয়।

খেপু ওরা যখন allowance (ভাতা)-রূপ allurement (প্রলোভন)-এর সৃষ্টি করল, তখন থেকেই সব নষ্ট হ'তে শুরু করল। আমার ইচ্ছা ছিল মানুষ পারস্পরিকতার উপর দাঁড়াক।

আর, ভূষণদা যেভাবে তপোবনের ছেলেদের প্রাত্যহিক কাজ-কর্ম্ম ও কৃচ্ছ্রতা থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাদের আরাম ও খাওয়ার বিলাস বাড়িয়ে দিল, সেই সময় থেকে তপোবনের আগের রকমটা ভেঙে গেল। প্রবৃত্তি-ঔদার্য্যে আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না, কোন্‌টার প্রকৃত মঙ্গল। তপোবন ভালভাবে চললে আমরা হয়তো ওখান থেকেই অনেক কর্ম্মী পেতে পারতাম। কিন্তু আমি যা' করতে চেয়েছি, পদে-পদে বাধা পেয়েছি। আমার দৃষ্টিভঙ্গীটা অনেকেই বুঝতে পারেনি।

স্কুলের শিক্ষা যেমন প্রয়োজন, বাড়ীর শিক্ষা কিন্তু তার চাইতেও বেশী প্রয়োজন। বাড়ীতে এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করা দরকার, যাতে ছেলেপিলে মাতৃভক্ত, পিতৃভক্ত ও গুরুভক্ত হ'য়ে ওঠে। পিতামাতা ও গুরুজনকে নিত্য কিছু দেওয়ার অভ্যাসটা খুবই প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যেবেলায় রোহিণী রোডের পাশের মাঠে এসে বসেছেন।

বীরুদা (রায়), সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার) প্রমুখ আছেন। পূজনীয় বড়দা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

বীরুদা—অবতার ও সদ্‌গুরুর পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের বাঁচা যখন বিপন্ন হয় এবং আত্মরক্ষার জন্য সাধারণের প্রাণে একটা আকুল কান্না জাগে, তখন সেই ভাবটা হয়তো কোন পবিত্র দম্পতির প্রাণে দানা বেঁধে ওঠে, এবং সেখানে পরিত্রাতা আসেন—পূর্ব্বতনের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যুগোপযোগী সমস্যার সমাধান দিতে। অবতার মহাপুরুষদের মধ্যে নূতনতর পরিপূরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সদ্‌গুরু যাঁরা, তাঁরা সাধনার ভিতর-দিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। তাঁদের ভিতর further fulfilment (আরোতর পরিপূরণ) পাওয়া যায় কমই। যা' আগে পাওয়া গেছে, তারই বাস্তবায়নে ব্রতী থাকেন তাঁরা।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ৮।৫।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ, সন্তোষদা (রায়) ও সুরেশভাই (রায়) প্রমুখ আছেন।

ব্যবসার সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Account (হিসাব)-ই হল ব্যবসায়ের compass (দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র)। Account (হিসাব) কোন ফাঁকা জিনিস নয়। Account (হিসাব)-ই দেখিয়ে দেয়—কোথায় আমি দাঁড়িয়ে আছি এবং কেমনভাবে চলব।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় খেপুদা ও কানুর কাছে দুটো চিঠি লেখালেন।

খেপু,

আজ এইমাত্র কিরণ ও কানুর চিঠিতে জানতে পারলাম যে, তুমি মেদিনীপুর থেকে অসুস্থ হ'য়ে কোলকাতায় এসেছ, এবং সেই অবধি পেটের ব্যারামে ভুগছ। এই খবর শোনা অবধি আমার মন বড় চঞ্চল ও অস্থির হ'য়ে পড়েছে। তোমার হাতের লেখা চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই স্বস্তি পাব না। তুমি এখন কেমন আছ, বিস্তারিত লিখো। যথাবিহিত চিকিৎসা ও পথ্যাদির কোন ত্রুটি হচ্ছে না তো? কার চিকিৎসাধীন আছ এবং তাতে ফলাফল কেমন হচ্ছে, অতি সত্বর জানতে ইচ্ছে হয়। উপযুক্ত লোকের চিকিৎসাধীন থেকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হ'য়ে ওঠ।

বাড়ীর আর সকলে ভাল আছে তো?

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো ও যারা চায় তাদিগকে দিও।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'।

কানু,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। খেপুর পেট খারাপ শুনে খুবই চিন্তিত আছি। এখন কে দেখছে এবং কেমন আছে ফেরত ডাকে জানতে ইচ্ছা হয়। উপযুক্ত লোকের চিকিৎসায় তোমার বাবাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ ক'রে তোল। আশা করি, তোমরা যখন আছ, সেবা-শুশ্রূষা যথারীতি হচ্ছে।

কোলকাতায় ও আশেপাশে খুব কলেরা হচ্ছে। সর্ব্বপ্রকার প্রতিষেধক ব্যবস্থার কোন ত্রুটি যেন না হয়। টি এ বি সি ইঞ্জেকশন নিতে পারলে ভাল হয়, তা' যদি না পাওয়া যায়, অগত্যা কলেরা ভ্যাক্সিন নিতে হয় ও সকলকে নেওয়াতে হয়।

ওখানকার আর সবাই কেমন আছে জানিও ;

আমার আন্তরিক 'রাম্বা' জেনো।

ইতি

আশীর্ব্বাদক

তোমারই

দীন

'জ্যাঠামশায়'।

২৬শে বৈশাখ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ৯। ৫। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে যতিদের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—গৃহস্থ-ঘরে সবসময় পিছনে একটা তহিল রাখতে হয়। আর, আহরণ করতে হয় কর্ম্ম, সেবা ও ব্যবহারে মানুষকে তুষ্টি-পুষ্টি দিয়ে। এটা রাখতে হয় অসুস্থতা বা অপারগ অবস্থার জন্য। সুস্থতার সময় তা' খরচ করতে নেই। এটা গৃহস্থদের পক্ষে। সন্ন্যাসীদের সঞ্চয় করতে নেই, তাহ'লে তাদের অগ্রগতি থেমে যায়।

শরৎদা (হালদার)—মানুষের আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য কি দীর্ঘজীবনের পক্ষে সহায়ক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন্দ্রায়িত একমুখীন সদাচারসম্পন্ন যদি হয়, তবে তা' দীর্ঘজীবনের সহায়ক হয় ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা গোটা দশেকের সময় বড়াল-বাংলোর ঘরে হরিদা (গোস্বামী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), নীরদদা (মজুমদার) প্রমুখকে বললেন—যে sentiment-এর (ভাবানুকম্পিতার) উপর দাঁড়িয়ে কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে মানুষ বড় হয়, সেই sentiment (ভাবানুকম্পিতা)-টা যদি injured (আহত) হয় তাহ'লে মানুষ বড় হ'তে পারে না। ঐ জিনিসটা না থাকলে সাধারণ মেকদারের মানুষই দেশে বেশী হয়। তারাই তখন বড়লোকের স্থান নেয়। অর্থাৎ, তারা সত্যিকারের বড় নয়, অথচ বড়র আসন নেয়। Sentiment (ভাবানুকম্পিতা)-টাই আদত জিনিস। Concentric condensation of sentiment-এর (সুকেন্দ্রিক ভাবানুকম্পিতার ঘনীভূত ভাবের) উপরই মানুষ দাঁড়ায়। তা' থেকে আসে প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহারের মাধুর্য্য। এতে সূক্ষ্ম গুণগুলি unfolded (বিকশিত) হয়, wisdom (প্রজ্ঞা) আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার মাকে বললেন—তুমি যে সুরেনের সঙ্গে অমন ব্যবহার কর, ওটা কিন্তু ভাল না।

রমণদার (সাহা) মা—ও যে কেমন করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও যাই করুক না কেন, তা' সত্ত্বেও যদি তুমি ভাল ব্যবহার না করতে পার, তবে তোমার শিক্ষার দাম কী? মানুষ তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে, তবে তুমি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে, এ তো হ'লো প্রবৃত্তিমাগী কথা। মানুষ দুর্ব্যবহার করা সত্ত্বেও যদি তুমি ভাল ব্যবহার করতে পার, সেখানেই তো তোমার শিষ্টাচারের বাহাদুরী। লোকে অশিষ্ট ব্যবহার করলেও তুমি যখন শিষ্ট ব্যবহার করতে পার; তখনই তোমার শিষ্টাচার পাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে ব'সে বলছিলেন—যীশু তাঁর বাবাকে বাবা ব'লে ডাকতে পারতেন না সামাজিক পরিস্থিতির দরুন। তাই পরমপিতাকে তাঁর বাবা বলে ডাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বাবা ডাকার hunger ও hankering (ক্ষুধা এবং আকাঙ্ক্ষা) তাঁকে স্বতঃই অনন্তর ক'রে তুলেছিল। বুদ্ধদেবের যেমন জন্মের পরেই মা মারা গিয়েছিলেন। তাতে ছেলেবেলা থেকেই তাঁর জীবনটা দুঃখময় মনে হ'ত। তাই তিনি জগতে রোগ, শোক, দুঃখ-কষ্ট ছাড়া কিছুই দেখতে পেতেন না। তাঁর নিজের জীবনে শূন্যতার বোধ এত গভীর হয়েছিল যে, সেইটাই ভূমায়িত হ'য়ে তাঁর দেবত্বকেও শূন্যতার রঙে রঙ্গীন ক'রে দিয়েছিল।

সুশীলদা (বসু)—হীনম্মন্যতা মানুষের এত গভীর কেন? এটা আসে কিসের থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা আসে স্বার্থসন্ধিৎসু প্রবৃত্তিপরায়ণতা থেকে।

২৭শে বৈশাখ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ১০। ৫। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

শরৎদা (হালদার)—কাল কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল মানে গতি। সংসার মানে যা' স'রে-স'রে যায়। পরিণয়নপ্রসূ গতিই কাল। গতিটা যে পরিণতির দিকে যাচ্ছে সেই নিয়ে কাল।

শরৎদা—'যখন কাল আসেনি'—তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে পরিণয়নের প্রশ্নই আসেনি, বা সৃষ্টিই হয়নি তখনও। স্থিতিটা যখন থেকে গতির ভিতর দিয়ে পরিণয়নের পথে চলেছে তখন থেকেই কাল।

২৮শে বৈশাখ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ১১। ৫। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে ব'সে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ধাতুর মধ্যে ধা আছে। যা' বক্তব্যটাকে ধারণ করে। সেই মূল বক্তব্য বাদ দিয়ে যদি শব্দের মানে করতে

যাই, শব্দের মূলে প্রাণটা হারাব। ধাতু আগেই হোক আর পরেই হোক, ধাতুর ব্যাপার একটা আছেই। আমার জিনিসগুলি আসে প্রেরণার মতো। প্রেরণাই যেন শব্দায়িত হ'য়ে কথায় বের হয়।

পরে বড়াল-বাংলোর ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বসলেন।

কাছাকাছি শরৎদা, হাউজারম্যানদা প্রমুখ ছিলেন।

হাউজারম্যানদা—শান্তি পেতে গেলে তো দ্বন্দ্ব এড়ানো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার অনুরাগ যদি এতখানি কেন্দ্রায়িত হয় যে, কোন cnflict (দ্বন্দ্ব)-ই আমাকে নাড়াতে পারে না, তখন সর্ব্বাবস্থায় শান্তি পাওয়া যায়।

সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সর্ব্বধর্ম্মের মূলে তত্ত্ব যে এক এটা না বুঝলে যে ক্ষতি হয় এবং বুঝলে যে ক্ষতিরই ক্ষতি হয় অর্থাৎ লাভ হয় তা' বোঝে না।

শরৎদা—আপনি যতই বলেন, মানুষের গোঁড়ামি যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোঁড়ামি নয়তো, গেরোমি। গেরো মানে knot (গ্রন্থি)। They like their knot (তারা তাদের গ্রন্থিকে পছন্দ করে)। প্রকৃত গোঁড়ামি থাকলে মানুষ সব-কিছুর তাৎপর্য্য বুঝতে চেষ্টা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর তাঁর শয্যায় উপবিষ্ট।

শৈলমা, রমণদা (সাহা)-র মা এবং মায়েদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

শৈলমা বললেন—আমাকে সবাই খাওয়ার জন্য নিন্দামন্দ করে, তাই বড় কষ্ট লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই যে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকিস। কে তোকে মন্দ বলল সেই কথা বড় ক'রে ভাবিস। কেউ খারাপ বললে তাই নিয়ে ব্যথা পাস। নিন্দা করলে চ'টে যাস। তার মানে তোর মন ঠাকুরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে না। এইটেই তোর কষ্টের কারণ। কে তোকে নিন্দা করল বা প্রশংসা করল, তা' নিয়ে নিজের মন আটকে রেখে লাভ কী? তাহ'লে তো তুই নিজেকে নিয়েই আছিস। কেউ যদি ইষ্টনিন্দা করে সেই জায়গায় তুই চটবি। কিন্তু তোকে নিন্দা করলে তোর চটার কী আছে?

৩০শে বৈশাখ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ১৩।৫।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে আছেন। কলকাতা থেকে মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী), মন্মথদা (দে) এবং আরও কয়েকজন এসেছেন। তাঁরা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—চল্লিশজন বিশিষ্ট কর্ম্মী সংগ্রহ করাই চাই। নানারকম আন্দোলনের ফলে মানুষের বোধগুলি বিকৃত হ'য়ে গেছে। তাদের মাথা ঠিক ক'রে তোলা কম কথা নয়। খুব খাটা লাগবে। কতকগুলি মাথা-সাফ লোকের নিরন্তর মানুষের মধ্যে কাজ করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসলেন।

দুমকার সিভিল সার্জেন এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখলেন এবং প্যারীদার সঙ্গে ওষুধপত্র সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য অন্যত্র গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে শরৎদা (হালদার) বললেন—কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে আপনারা অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী না বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী—তার উত্তর কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছি আমরা অব্যয়ী প্রজ্ঞার উপর। তিনি যদি না থাকেন, সব-কিছু না থাকা হ'য়ে যায়। সূর্য্য আছে ব'লেই কিরণ আছে, কিরণ সূর্য্য হতেই নিঃসৃত, যদিও প্রত্যেকটি কিরণ সূর্য্য নয়, কিন্তু সূর্য্যই কিরণের আশ্রয়। ভগবান হলেন সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। যেখানে অস্তিত্ব ব'লে কিছু আছে, সেখানেই চিৎ ও আনন্দ আছে। যা'-কিছু সবই অব্যয়ী প্রজ্ঞা বা অদ্বয়ী এক বা ঈশ্বরে অনুস্যূত।

পুরুষ আছে, প্রকৃতি আছে। তার সংমিশ্রণে নানা রূপের সৃষ্টি হচ্ছে। পরা পুরুষ ও পরা প্রকৃতি বীজাকারে সব-কিছু সৃষ্টির সম্ভাবনা রেখে দেন। সেই সম্ভাবনাগুলিই রূপায়িত হয় কার্য্যকারণ, স্থানকাল ও পাত্রের মাধ্যমে।

রাজেনদা—(মুখার্জী)—আমার অদ্বৈত অনুভূতি লাভ করতে ইচ্ছা করে—তা' তো হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একদিনেই কি হয়? প্রথমে চাই ইষ্টে বৃত্তিভেদী প্রবল অনুরাগ। তেমনতর অনুরাগ না থাকলে প্রবৃত্তিগুলি আমাদের বিক্ষিপ্ত ক'রে তোলে ও মনকে নীচে টেনে আনে। কিন্তু ঐ ধরনের ইষ্টানুরাগ থাকলে বৃত্তিগুলি স্বতঃই সংহত, সুকেন্দ্রিক ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়। তখন জীবনের সব-কিছুর মধ্যেই আসে একটা সার্থক বিন্যাস। এমনি ক'রে ধীরে-ধীরে সক্রিয় ইষ্টানুরাগকে আশ্রয় ক'রে সত্তা সম্বন্ধে যথাযথ অনুভূতি জাগে। এটা বোধে বোধ করতে হয়। মুখে বলা যায় না। এক কথায়, স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লেই ব্যাপারটা বোঝা যায়।

রাজেনদা—তা' তো হ'তে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টের উপর নেশা বাড়িয়ে দিতে হয়। তখন প্রবৃত্তিগুলি তাঁর পরিপন্থী রকমে মাথা তোলা দেয় কমই। তখন আমাদের বিচ্ছিন্ন বোধগুলি সংহত হ'য়ে ওঠে। আমাদের স্নায়ু, ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্ককোষগুলিও তখন এমন হ'য়ে ওঠে যা'

ঐ অনুভূতি জাগার সহায়ক হয়। এর জন্য খাওয়া-দাওয়াগুলি ঠিক মতো করা লাগে।

রাজেনদা—আমি এত চেষ্টা করি কিন্তু শান্তি পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তি-শান্তি করলে শান্তি হয় না। মন সুকেন্দ্রিক হ'লেই হল। আর, তার জন্য চাই অবাধ্য, অনিবার্য্য টান।

অজয়দা (গাঙ্গুলী)—পরান্নভোজী হওয়া কাকে বলে? তাতে তো দুঃখ বেড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতি-সন্ন্যাসীরাও তো পরান্নভোজী। লোকের জন্য করার বুদ্ধি যদি থাকে এবং কেউ যদি লোককল্যাণকর কাজ করে, তাহ'লে পরেরটা খেলে দোষ হয় না। তোমার স্বার্থও বুঝি না, প্রতিষ্ঠাও বুঝি না, তুষ্টিও বুঝি না, স্বস্থিও বুঝি না অথচ তোমারটা খেয়ে যাচ্ছি, তাকে কয় পরান্নভোজী।

এরপর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্র এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সাধারণভাবে কথাবার্ত্তা বললেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ১৫।৫।১৯৫০)

কাল রাত থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। আজ সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে শুয়ে আছেন।

তারই মধ্যে কালিদাসদা (মজুমদার), সুরেনদা (শূর), সুধীরদা (বসু), সুধীরদা (দাস), প্রবোধদা (মিত্র), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখকে ব'লে বোনামার জন্য নানারকম বাসনপত্রাদি আনানর ব্যবস্থা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। পূজনীয় গোঁসাইদা, যতিবৃন্দ, বীরুদা (রায়) প্রমুখ উপস্থিত আছেন।

বীরুদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিকালীন কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই লেখাটি পড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—পুরাতন সুখস্মৃতি মানুষকে অনেকখানি নবীন ক'রে তোলে। সে এক যুগ গেছে। মত্ততার যুগ।

একটু থেমে বললেন—যে-রকম মানুষ আপনাদের কাছে চাইলাম তা' আপনারা দিতে পারলেন না।

বীরুদা—শয়তানের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গেলে ভগবান ছাড়া আর কেউ পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যদি সুকেন্দ্রিক হ'য়ে তার সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলে, তবেই পারে।

বীরুদা—আমরা যে শয়তানের রাজ্যের প্রজা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শয়তানের রাজ্যের প্রজা হ'লেও আনন্দ আমাদের জীবন। সেই আনন্দকে যখন অবলম্বন করি, তখন বুদ্ধি, কৌশল, যোগ্যতা আমাদের বেড়ে যায়। তা' আমরা বুঝি, কিন্তু করি না।

বীরুদা—প্রবৃত্তিমুখী সংস্কারই যে আমাদের প্রবল হ'য়ে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' আছে তা' নেই ব'লে ধ'রে নিতে হয়। সেগুলি আমার নয়। বৃত্তিগুলি আছে দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে চলবার জন্য কতকগুলি সাড়াবাহী যন্ত্র হিসেবে। যন্ত্রগুলি আমি নই। আমি সত্তা। সত্তানুগ চলনে চলব আমি। গীতায় আছে—'ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ'। (জীবগণের মধ্যে আমি ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম)।

বীরুদা—টাটানগরের দুইজন সঙ্গী আছে, যাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাবেন খন, ব্যস্ত কেন?

বীরুদা—আমারও থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ঠাকুর বললেন তাই আছি। এতে অহং-এর তৃপ্তি বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কিন্তু তৃপ্তি হয় আপনি যদি নিজে ইচ্ছে ক'রে আমার কাছে থাকেন। আমার কথায় থাকলেন, সেটা যেমন আমার দায়িত্ব, তেমনি আপনার ইচ্ছায় থাকলেন সেটা আপনার দায়িত্ব। আপনার দায়িত্বে থাকলে সেটাই ভাল।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে।

পূজনীয় বড়দা এবং যতিদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন।

কেষ্ট দাসের প্রসঙ্গ উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্ট দাসের কাছে আমি একদিন বললাম—সৃষ্টিতত্ত্ব তো আমি ভুলে গেছি। মানুষের কাছে বলতে পারি না। তুই যদি একটু ঠিক ক'রে দিস তাহ'লে তো হয়। ও সেই কথা শুনে বেশ উপভোগ করল, হুঁ ক'রে মাথা নাড়ল। আমি তখন থেকেই বুঝলাম, রকমটা কী! তারপর থেকেই আস্তে-আস্তে কীর্ত্তি-কলাপ শুরু হ'ল।

প্রফুল্ল—আপনি কেষ্ট দাসকে যে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তাতে তো অমঙ্গলের পথই আরও পরিষ্কার হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যে অমঙ্গলেরই ভজনা করেছিল। যার যেমন ভজনা সে তেমনি

ফল পাবে তো। ভগবান মঙ্গলেরও যেমনি, অমঙ্গলেরও তেমনি। এক কথায়, যার যেমন ভজনা, তার তেমনি প্রাপ্তি। 'যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' (যে আমাকে যেমনভাবে চায়, সে আমাকে তেমনভাবে পায়।)

শরৎদা (হালদার)—আপনার প্রশংসাও তো তাহ'লে ভয়ের ব্যাপার!

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রশংসাটা খারাপ হয় যদি কেউ insincere (কপট) হয় তার পক্ষে। Sincere (অকপট) যে তার পক্ষে খারাপ হয় না।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ১৬।৫।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

পূর্ব্ব বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকজন দাদা এসেছেন। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

জনৈক দাদা—হিন্দুদের সম্পত্তির উপর খুব মায়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের সংহতি নেই, সহযোগিতা নেই, তাই সবসময়ই নিজেদের অসহায় মনে করি। ভাবি সম্পত্তি গেলে দাঁড়াব কি ক'রে? আমার আর আছেই বা কি? তাই দশজনের সাহায্য-সহযোগিতার ভরসায় নির্ভীক চিত্তে একটা-কিছু করতে পারি না।

বিজয়দা (রায়) ব্যবসা করা সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পয়সার লোভ ক'রো না। সততা ও সেবার লোভ কর।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার বিধুবাবু (সেনগুপ্ত) আসলেন। প্রাথমিক কুশল প্রশ্নাদির পর পাবনা আশ্রমের সম্পত্তি বিনিময় বা তার ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে বিধুবাবু কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মস্থানের বদল হয় কেমন ক'রে? আমি চাই ঐ জিনিস যা' ছিল তা' আমাকে নতুন ক'রে ক'রে দিক। আমাদের আশ্রম ওরা জোর ক'রে নিয়েছে। আমাদের মত নেয়নি, আমরা মত দিইনি আর দেবও না। আমাদের কাছে ওটা অত্যন্ত পবিত্র। তবে আপাতত এদিকে আমরা একটা ব্যবস্থা করব। যদি ওরা দেয় যা' আনা যায় এখানে নিয়ে আসব। আবার যদি দিন পাই নিয়ে যাব ওখানে।

বিধুবাবু দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তির খোরাক জুগিয়ে মানুষকে কখনও সংহত করা যায় না।

ধর্ম্মের উপর দাঁড়ালে সংহতিটা আসে। সেই ভিত্তিটা পাকা করা দরকার। সাংস্কৃতিক বিপর্য্যয় যেন কিছুতেই না ঘটতে পারে। আর একটা কথা—আমরা কত জিনিসের চাষ করি, কিন্তু মানুষের চাষ করি না। আপনার ছেলে আপনার থেকে যদি আরও উন্নত না হয় তাহ'লে কি হ'ল ?

বিধুবাবু—প্রত্যেকের জন্য উন্নতির সুযোগ কিভাবে করা যেতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভারতীয় সমাজতন্ত্রের মধ্যে এই জিনিসটি ছিল। প্রত্যেকের বর্ণানুযায়ী জীবিকা সুনির্দ্দিষ্ট ছিল এবং বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ছিল সহযোগিতা। এক আদর্শ ও অনুলোম বিবাহের উপর দাঁড়িয়ে থাকাতে সমাজ থাকত সংহত। আগে এমন ছিল যে, কেউ কারও বৈশিষ্ট্য নষ্ট করত না। আমাদের মঙ্গলচণ্ডীর মা-বাবা ছেলেবেলায় মারা যায়। কৈবর্ত্তের ঘরে মানুষ। কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তান হিসাবে ওর সব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই সেই কৈবর্ত্ত মানুষ করেছে ও বিয়ে দিয়েছে ওকে।

আমরা খাই, কোষ ক্ষয় হয়। তার পূরণ না হ'লে বাঁচি না। সমাজের ক্ষয় পূরণ না হ'লে সমাজও পুষ্ট হয় না। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের ভিতর-দিয়ে একসময় সমাজের পুষ্টিবিধান হ'ত।······গোয়ার খ্রীষ্টানদের নাকি বর্ণাশ্রম মাফিক বিয়ে-থাওয়া হয়।

বিধুবাবু—মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান একান্ত দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত ভাল মানুষের জন্ম হবে এবং তারা বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কর্ম্ম ও সেবার মধ্য-দিয়ে যোগ্য হ'য়ে উঠবে ততই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে। কৃষি, শিল্প সবই বাড়িয়ে তোলা লাগে। চাকরী করার বুদ্ধি যত সমাজে প্রশ্রয় পাবে, ততই কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যা প্রবল হবে।

বিধুবাবু—হবে কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাই প্রচার এবং হাতে-কলমে ক'রে দেখান। মানুষগুলির পিছনে খেটে তাদের আত্মনির্ভরশীল ক'রে তুলতে হবে। পারিবারিক শিল্প গড়ার দিকে নজর দিতে হবে।

শরৎদা—বর্ত্তমানের এই যান্ত্রিক যুগে তা' কি ক'রে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইঞ্জিনীয়ারদের লাগিয়ে পারিবারিক শিল্পের উপযোগী যন্ত্র তৈরী করা লাগে।

বিধুবাবু—নেতার প্রেরণা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচার আকাঙ্ক্ষা সবারই আছে। পরিবেশকে নিয়ে বাঁচার পথে যদি চলতে থাকেন আপনিই একজন নেতা হ'য়ে উঠবেন।

বিধুবাবু—কিছু-কিছু চেষ্টা হচ্ছে। না হ'লে তো দেশে অরাজকতা এসে যেতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা করতে হ'লে জানা চাই আপনি কী করবেন ও কেমনভাবে করবেন।

যতি-আশ্রম সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু লোক সন্ন্যাসীর মতো চলা চাই যাতে গৃহীদের ও সমাজকে বাঁচাতে পারে। আমাকে মানুষ দেন দেখবেন সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মালিক এবং শ্রমিক উভয়েরই উভয়ের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হওয়া দরকার। পরস্পর পরস্পরকে যদি না দেখে তাহ'লে কেউই বাঁচতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কতকগুলি বাণী বিধুবাবুকে প'ড়ে শোনান হল।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ১৭।৫।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ ও রঘুনাথদা (মিশ্র) উপস্থিত আছেন। গতকাল রঘুনাথদার শরীর অসুস্থ হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের শরীরের ভিতরে organ (যন্ত্র)-গুলির মধ্যে যখন সক্রিয় সহযোগিতার ব্যত্যয় হয়, তাতে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয় এবং সেইটেই রোগ-আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এটা শরীরের মধ্যে যেমন, সমাজ-রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তেমনি।

শরৎদা (হালদার)—যা' হয় না নয় বছরে, তা' হয় না নব্বই বছরে,—কথাটির মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যা' করে তার পিছনে তার জৈবী-সংস্থিতি থাকে। ভিতরে সেই সম্ভাব্যতা না থাকলে শুধু চেষ্টাতেই সবসময় কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। যার অন্তর্নিহিত সম্ভাব্যতা যেমন, তার তদনুযায়ী প্রচেষ্টা করা ভাল।

শরৎদা—শঙ্কর, রামানুজ—কার অদ্বৈত ঠিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো জানি না কোন্‌টা কী। আমার মনে হয় সবই ঠিক। এক-একজন এক-এক aspect (দিক) থেকে বলেছেন। আমি বুঝি আমাদের আচার্য্যে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। আমরা যখন ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে যা'-কিছু ভাবি, বলি, করি, তখন সব-কিছুর ভিতর একটা common factor (উপাদান সামান্য) জেগে ওঠে—প্রত্যেক যা-কিছুর বৈশিষ্ট্যসহ। এর ভিতর-দিয়েই 'যত্র-যত্র নেত্র পড়ে, তত্র-তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে'—রকমটা হয়। সেই এক কোথায় কিভাবে আছেন,

তা' ধরা পড়ে। যা'-কিছু একেরই রকমারি প্রকার। কেষ্ট ঠাকুরের গুরু তাঁকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন 'অচ্যুতো ভব'। এই অচ্যুত ইষ্টানীতিই সব-কিছুর মূলে।

শরৎদা—গীতায় নির্ব্বাণ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, নিরাশী ও নির্ম্মম হ'য়ে চলার কথা। প্রত্যাশা এবং প্রবৃত্তিমূলক আসক্তি ও কামনা আমাদিগকে ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে। যখন তিনিই একমাত্র আমাদের কামনার বস্তু হন, তখন আমাদের আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠামূলক কামনাগুলি নির্ব্বাণ লাভ করে, এবং তখন আমরা আমাদের ভাগবত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি।

শরৎদা—বর্ণবিধান কি সত্ত্ব, রজঃ, তম এই তিন গুণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বামুন হ'লে যে সাত্ত্বিক হবে, ক্ষত্রিয় হ'লে যে রাজসিক হবে বা শূদ্র হ'লে যে তামসিক হবে, তার কোন মানে নেই। যে-কোন বর্ণের মধ্যে যে-কোন গুণ থাকতে পারে। সত্ত্ব, রজঃ, তম সবার মধ্যেই আছে। যেটা যেমন অনুশীলন করা যায়, সেটা তেমনি বেড়ে ওঠে। তবে যার জন্মগত প্রবণতা যেমন, সেটা সাধারণত প্রবল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন।

সুশীলদা (বসু) ও রঘুনাথদা কথাপ্রসঙ্গে যীশু খ্রীষ্টের ভারতে আগমন-সম্বন্ধে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্রাইস্ট যদি এখানে এসে থাকেন, তাহ'লে আমরা গর্ব্ববোধ করব না কেন? যে-কোন মহাপুরুষই হোন তাঁর স্পর্শ আমরা লাভ ক'রে থাকলে আনন্দ ও গর্ব্বেরই কথা। কারণ, তাঁদের জীবনের আলোতেই দুনিয়া আজও চলছে, সে-চলাটা যত খোঁড়াই হোক না কেন। অবশ্য, তিনি যত বড় মহানই হোন না কেন, কিছুতেই কিছু হবে না, যদি আমাদের জীবনে তিনি জীবন্ত হ'য়ে না ওঠেন।

রঘুনাথদা—পূর্ব্বের অনেককে আজ উড়িয়ে দিচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁদের থাকা আমাদের মহা স্বার্থ। তাঁদের দিয়েই আমরা পাই জীবনের উপাদান, সম্বর্দ্ধনার লওয়াজিমা।

রঘুনাথদা—মানুষের দুর্ব্বলতা থাকলে সে অনন্ত শক্তির উপর নির্ভর না ক'রে ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ধারণা উল্টো। আমি মনে করি, মহাপুরুষদের অস্তিত্ব মানা একান্তই প্রয়োজন। তা' যারা মানতে পারে না তারাই দুর্ব্বল। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব তাঁদের কথাগুলির সত্যতা প্রমাণ করতে। শাস্ত্রে যে অমৃতের

কথা আছে, আমরা যদি তেমন ক'রে চেষ্টা করি, আমরা তা' স্মৃতিবাহী চেতনারূপে লাভ করতে পারব।

রঘুনাথদা—তা কি সম্ভব ? তা কি কখনও হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন এ্যাটম বোম প্রথমে ছিল না, আগে ছিল ধারণা, তারপর সেইটাই বাস্তবায়িত হ'ল চেষ্টার ভিতর-দিয়ে। তাছাড়া বাস্তবেও শোনা যায়—যেমন শান্তির কথা শুনেছি তার পূর্ব্বজন্মের কথা সব স্মরণে আছে—এমনকি কোথায় কী করেছে সেসব স্মৃতিসহ।

এরপর রঘুনাথদার কোষ্ঠী বিচার করলেন কাশীদা (রায়চৌধুরী)।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার একাদশে রাহু আছে। তাই সমস্ত জিনিসটাই বাস্তব ক'রে পেতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

শরৎদা—গোড়ায় তো মানুষ মুক্তস্বরূপ। কিন্তু সে সৃষ্টির মধ্যে প'ড়েই বন্ধনের ভিতরে এসে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি 'মাতৃক' জগৎ বলি। সৃষ্টির মধ্যে আছে যৌগিক সংস্থিতি, নাম, রূপ, দেশ, কাল ও কার্য্যকারণের বন্ধন। এই সবের মধ্যে প'ড়ে জীবের আত্মবিস্মৃতি ঘটে।

শরৎদা—গোড়ায় তো নিজের ইচ্ছায় আসেনি, সেখান থেকে নেমেছে যা'-কিছু সত্তা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু মূলতঃ তিনিই আছেন। তবে উৎস-বিমুখতা এবং কামনার দরুন মানুষ নিজের প্রকৃত রূপ ভুলে যায়। সাধনার ক্ষেত্রে গোড়ায় সোঽহং বলায় মুশকিল আছে। প্রবৃত্তির অভিভূতির ভিতর-দিয়েও ভাবতে পারি সোঽহং। তাই বলা ভাল, জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস। তাঁর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্যের ভিতর-দিয়ে মানুষ বুঝতে পারে সে কী।

শরৎদা—আপনি যে পুণ্যপুঁথিতে বেদান্ত পড়ার কথা বলেছেন, সেটা কোন্ মতের বেদান্ত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুণ্যপুঁথির কথার জন্য আমি দায়ী নই। যা'হোক, আমি যেখানে যা' বলেছি সামগ্রিকতার বোধ নিয়েই বলেছি, বাস্তবের কথা বলেছি। বাদ হিসাবে কিছু বলিনি। আমার যা-কিছু হল—narration of facts (তথ্যের বিবরণ)।

শরৎদা—শঙ্কর, রামানুজ প্রমুখের কথাগুলির ভিত্তি কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁদের উপলব্ধিও ছিল, পাণ্ডিত্যও ছিল। তাঁরা কথাগুলি ব্যাখ্যা করেছেন এক-একটা দৃষ্টিভঙ্গীর উপর দাঁড়িয়ে। রামকৃষ্ণদেব বা আমার কথার মধ্যে দেখতে পাবেন সেগুলি fact (তথ্য) হিসাবে বলা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রোহিণী রোডের পাশে মাঠে এসে বসেছেন।

সুশীলদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), স্পেন্সারদা, হরিদাসদা (সিংহ) প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষ যতই অচ্যুত অপ্রত্যাশী অনুরাগ নিয়ে ইষ্টকে ভালবাসে, ততই সে আস্তে-আস্তে বোধ করতে পারে এক অজানিত হাত তাকে সবসময় সাহায্য করছে। কিন্তু মানুষের ভিতর যদি প্রত্যাশা থাকে তাহ'লে ঐ বোধ আসে না।

স্পেন্সারদা—মানুষ অন্যের জন্য যখন কিছু করে, তখন তো প্রত্যাশা আরও বেশী ক'রে পেয়ে বসে। অপ্রত্যাশী ভাব তো সেখানে দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অপ্রত্যাশী মানে, তিনি আমাকে ভালবাসুন, না-বাসুন, আমার জন্য কিছু করুন, না-করুন, তা' আমার কাছে প্রশ্ন নয়। আমার জীবন দিয়ে যাতে তাঁকে সুস্থ ও তুষ্ট রাখতে পারি, সেই আমার কাম্য। তাহ'লে আমার ভাল-মন্দ যা-কিছু থাক তা' সুকেন্দ্রিক হয়। কারণ, আমার জন্য তো কোন চাহিদা নেই। চাহিদা থাকলে পর্দা প'ড়ে যায়। তখন ভালবাসা হয় চাহিদায়। তাঁকে আমার চাহিদা পূরণের যন্ত্র ক'রে নিই।

স্পেন্সারদা—এতখানি পবিত্র ভাব আমার আয়ত্তের মধ্যে নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' অনেকেরই আয়ত্তের মধ্যে নয়। কিন্তু অন্যভাবে কষ্ট বেশী। অমনটা হ'লে সহজে হয়। আয়ত্তের মধ্যে নেই বলি। কিন্তু এইই আমরা করি ও চাই। যেমন স্পেন্সারকে ভালবাসি, তার কাছে যাই, তাতেই কিন্তু সুখ পাই। সে টাকা দেয় তাই তার কাছে যাই, তাহ'লে কিন্তু তাকে enjoy (উপভোগ) করতে পারি না, সেও পারে না আমাকে enjoy (উপভোগ) করতে।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার, (ইং ১৮।৫।১৯৫০)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খারাপ। মাথাধরা, দাঁতে ব্যথা, বুকে ব্যথা প্রভৃতি আছে।

রাম চ্যাটার্জ্জি এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্ম্মী এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সঙ্গে অনেক সময় নিভৃতে আলোচনা করলেন।

শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীঠাকুর আজ কতকগুলি বাণী দিলেন।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১৯।৫।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার যদি তোমার উপর ভালবাসা থাকে, তাহ'লে তোমাকে দিতে আমার কোন কষ্ট হয় না। আমি আত্মবোধেই তা' করি। আমি সব সময় ভাবি কিসে তোমার সুখ, সুবিধা, সোয়াস্তি হয়। আমার নিজের মনই পাগল হ'য়ে ওঠে সেজন্য। আমার সব-কিছু তোমাকে উজাড় ক'রে দিতে ইচ্ছে করে। সে-দেওয়ায় কষ্ট তো হয়ই না, বরং অত দিয়েও তৃপ্তি হয় না। কিন্তু মাঝখানে নিজের কোন স্বার্থবুদ্ধি থাকলে, দিয়ে এই তৃপ্তি বোধ হয় না। দেবার ঐ আবেগও থাকে না।

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ২০।৫।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

সমস্তিপুর থেকে হরিনন্দনদা (প্রসাদ) ও আরও কয়েকজন দাদা আসলেন।

হরিনন্দনদা—নামধ্যান করি কিন্তু শব্দ পাই না, এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা আসে প্রবল আগ্রহ থেকে। আগ্রহ মানে একাগ্রতা। নাম কম্পন সৃষ্টি ক'রে স্নায়ুর ভিতর তরঙ্গ তোলে। তাতে মস্তিষ্ককোষগুলির মধ্যে একটা দহন-তাপের সৃষ্টি হয়। এতে কানের ভিতর সুপ্ত শব্দ যেগুলি আছে জেগে ওঠে। আসল কথা যোগ, টান। অনুভূতির কামনায় নাম করলে সেটা অনুভূতির অন্তরায় হ'য়ে ওঠে। আমি তাঁকে ভালবাসি—তাঁর সব-কিছু নিয়ে। তাঁকে জীবন্ত ক'রে তুলতে চাই আমাদের জীবনে। তাঁর পরিপোষণ, পরিপূরণ, পরিরক্ষণ আমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে। এমনি ক'রে আমাদের অনুরাগ অবাধ্য হ'য়ে পড়ে।

Urge (আকুতি)-ই energy (শক্তি) হ'য়ে ওঠে। ভাবের আবেগ হয়তো জাগল, আবার হয়তো উবে গেল, তাই নিরন্তর সক্রিয় অনুরাগের উপর দাঁড়াতে হয়। আকুতিটা ক্ষুধার মতো। এর সঙ্গে সক্রিয় সম্বেগ থাকলে সোনায় সোহাগা। কোন ভাল আবেগ আসলে কিছুতেই তা' ব্যর্থ হ'য়ে যেতে দিতে নেই। একজনের প্রতি হয়তো দয়া হ'ল, কিন্তু তার জন্য যদি কিছু না করি তখন ঐ দয়া উবে যায়,

আমি নিরেট হ'য়ে যাই। তাকে অন্ততঃ একমুঠো চালও যদি দিই, তাহ'লেও ঐ আবেগটা বজায় থাকে এবং আমার চরিত্রও উন্নত হয়।

তাই, ইষ্টানুরাগ বাড়াতে গেলে নিয়মিত ইষ্টভৃতি ক'রে যেতে হয়। তা' আমাদের ভিতর এমন একটা শক্তি সঞ্চিত ক'রে তোলে যা' আপদে-বিপদের সময় আমাদের অভাবনীয়ভাবে রক্ষা করে।

ছেলেপেলেরা যাতে মা-বাবাকে দিতে অভ্যস্ত হয় সেজন্য মা-বাবা উভয়েরই চেষ্টা করা উচিত। মা'র উচিত সেভাবে বলা যাতে বাবাকে দেয় এবং বাবার উচিত ছেলেপেলেকে দিয়ে মাকে দেবার অভ্যাস করানো।

ছেলেপেলেদের শিক্ষা-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বামী-স্ত্রীর কখনও ছেলেমেয়েদের সামনে ঝগড়া করতে নেই। এতে খুব ক্ষতি হয়। মা-বাবার কথা এবং করার মধ্যে যদি খুব সঙ্গতি থাকে এবং তাই দেখে ছেলেমেয়েরা যদি প্রভাবিত হয় তাহ'লে খুব ভাল হয়, প্রকৃত শিক্ষা হয়। শিক্ষার গোড়ার ব্যাপারই এইটুকু। মানুষ যদি লেখাপড়া নাও জানে আর এই চরিত্রগত শিক্ষা থাকে সুকেন্দ্রিকতা-সহ, তাহ'লে তাদের সাথে পারার জো নেই। শিবাজী, আকবর, কবীর সাহেব প্রমুখ অনেকের জীবনেই এটা দেখা যায়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর রোহিণী রোডের পাশে মাঠে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য), সুশীলদা (বসু) প্রমুখের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সৎসঙ্গের এমনভাবে কাজ করা লাগে যাতে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী উন্নত হয় এবং সব দেশগুলির মধ্যে একটা সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ভাব গজিয়ে ওঠে। ধর্ম্ম যে কখনও দুই নয়, ধর্ম্ম যে এক এবং মহাপুরুষদের বাণীর মধ্যে যে গভীর সঙ্গতি বিদ্যমান, সেটা লোকের সামনে তুলে ধরা লাগে।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ২১। ৫। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা গোটা নয়েকের সময় বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। নানাজনে এসে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনা করলেন।

এরপর কাগজ পড়া হ'ল এবং কয়েকটি বাণী সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল।

রমণদা (সাহা)-র মা সরোজিনীমাকে একটা বেফাঁস কথা বলেন। সেই নিয়ে সবাই তাঁকে চেপে ধরেন। তখন রমণদার মা কাঁদতে থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—আমি যে তোমাকে সেদিন অত ক'রে বুঝিয়ে বললাম—কিভাবে চলতে হয়, কিভাবে কথা বলতে হয়, সেকথা তো তুমি মাথায় নেও না। তাহ'লে কী বুঝব? টান তোমার আমার প্রতি নয়, টান তোমার অন্য কিছুতে।

আর ইচ্ছা থাকলে যে ভাল জিনিসটা শেখা যায় না, সেভাবে চলা যায় না—তা'তো নয়। একটা কুত্তা যে কুত্তা সেও তো পোষ মেনে কত জিনিস শেখে, তুমি কেন পারবে না ?

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ২২। ৫। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)-র সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অবতার পুরুষরা হলেন যুগসমস্যার সমাধান-মূর্ত্তি। তাঁরা যেখানে আসেন, শুধু সেই জায়গা নয়, সমগ্র জগৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আলোকিত ও প্রভাবিত হয় তাঁদের দিয়ে।

কেষ্টদা—ভাল হবার অনিবার্য্য প্রয়োজন প্রকৃতির মধ্যে আছে। তাই খারাপের ওপর প্রতিক্রিয়া আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচাবাড়ার তাগিদ আছে ব'লেই এই জিনিসটা আছে।

কেষ্টদা—ভালবাসার ভিতর-দিয়ে যে উন্নতি লাভ হয়, বিরূপ ভাবের ভিতর-দিয়ে তা' হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ভালবাসাই যে আমাদের প্রকৃতি। আর দ্বেষ, বিদ্বেষ, হিংসা তার বিকৃতি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং। ২৩। ৫। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে ডাক্তার কালীদার (সেন) সঙ্গে নস্তুস ও নোটনের চিকিৎসাপ্রসঙ্গে বললেন—রোগের চরিত্র এবং ওষুধের চরিত্র সম্বন্ধে যদি উপলব্ধি না থাকে, যান্ত্রিকভাবে চিকিৎসায় কাজ হয় না। আমি কী করছি সে-সম্বন্ধে আমার যদি একটা ধারণা না থাকে, তাহ'লে কি হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত টোটকাটি বললেন—বেলপাতা, নিষিন্দা, গাঁদাল, আদা প্রত্যেকটি সমপরিমাণে নিয়ে বে'টে সবসুদ্ধ একছটাক রস অল্প একটু গরম ক'রে খেতে হবে। কিংবা সব ঐভাবে মিলিয়ে দুই তোলা পরিমাণ আধ সের জল সিদ্ধ ক'রে আধ-পোয়া থাকতে নামিয়ে খাওয়া যেতে পারে। সবরকম বাতের পক্ষে এটা ভাল।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ২৪। ৫। ১৯৫০)

ক'দিন প্রচণ্ড গরম পড়েছে। সকাল থেকেই খুব গরম।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন।

রোদ উঠে গেছে। সামনের সেগুন গাছগুলির পাতা ঝ'রে গেছে, কিন্তু পাতা ওঠেনি। তাই টিনের ঘরের বারান্দায় বেশ গরম মনে হচ্ছে।

নোটনকে সময়মতো উপযুক্ত মাত্রায় পেনিসিলিন না দেওয়ায় তার নিউমোনিয়া হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—আমার উদ্বেগ কিছুতেই যায় না। নির্ভরযোগ্য লোকের অভাব। তেমন লোক থাকলে তাদের উপর নির্ভর ক'রে একটু নিশ্চিত হওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড়াল-বাংলোর ঘরে গুরু (হালদার), খোকা (মজুমদার), পরিমল (দে), মনুভাই (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখকে বললেন—খুব ভাল ক'রে বক্তৃতা দিতে শিখতে হয়। রোজ মাঠে গিয়ে মহড়া দিতে হয়। আর, বিশিষ্ট বাগ্মীদের বক্তৃতাগুলো পড়তে হয়। দাঁড়ানো, হাতনাড়া, অঙ্গভঙ্গী, চোখের চাউনি, ভ্রূকুঞ্চন, ঠোঁটের ভাব, মুখের হাঁ ইত্যাদি ঠিক ভাবানুপাতিক ক'রে তুলতে হয়। কোন্ কথা বলব, কোন্ কথা বলব না এবং কেমন ক'রে কথাগুলি সাজাব, কোন্টা অনুকূল, কোন্টা প্রতিকূল ভেবেচিন্তে ঠিক করা লাগে। মাঝে-মাঝে একত্র আলোচনা করা লাগে। এই ফাঁকে হিন্দিটাও শিখে ফেলতে হয়। পনের-কুড়িজন এমন গ'ড়ে উঠলে হয়। আর অঙ্ক খুব ভাল ক'রে শিখতে হয়। খেলার মতো শিখতে হয়। অঙ্ক যত শেখা যায়, বিজ্ঞানও তত ভাল ক'রে শেখার সুবিধা হয়। আর কাজকর্ম্ম, বক্তৃতা ইত্যাদির মধ্যেও mathematical accuracy (গাণিতিক যাথার্থ্য) এসে যায়।

আজ বিকালে সুধাংশুদা কোলকাতা থেকে ডাক্তার বিধুবাবুকে নিয়ে এসেছেন নোটনকে দেখাতে। ডাক্তারবাবু আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুটা আশ্বস্ত হলেন।

পরে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর আলোচনা করলেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ২৭।৫।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

খবর পাওয়া গেল আশু ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী টাইফয়েডে মারা গেছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) সেই প্রসঙ্গে বললেন—আশু যে বিয়ে করল, আপনার মত নিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে জানায়ইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন।

অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

একজন ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব স্বার্থের মূলে আছে, আমি বেঁচে থাকি, সুখে থাকি, সুস্থ থাকি। চাহিদাই আমার ঐটে। অমৃতত্ব যাতে হয় তাই আমার পথ, তা' যাতে আমার না হয় তা' আমার পথ নয়। একলা বাঁচার কোন দাম হয় না। পরিবার-পরিবেশ, যা' দিয়ে আমি গজিয়ে উঠেছি, তাদের বাদ দিয়ে বাঁচা যায় না। এই জৈবী-সংস্থিতি যাদের ভিতর-দিয়ে উদ্ভূত হ'য়ে পোষণ পাচ্ছে, যারা না থাকলে কষ্ট পাই, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, যারা থাকলে আমার মনে হয় থাকাটা সুষ্ঠু হ'ল, আমার থাকার জন্য তাদের থাকাটা চাই। তাই ধর্ম্মের সংজ্ঞা হল—'যেনাত্মন-স্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ' (যা' দিয়ে নিজের এবং অপরের জীবনবৃদ্ধি বিধৃত হয়, তাই ধর্ম্ম।) আমার মতো অন্যেরও জীবনবৃদ্ধি চাই। কারণ, অন্যে না থাকলে আমিও থাকি না। আমরা পরাধীনভাবে স্বাধীন। আমাদের জন্ম নিতে লাগে মা-বাবা। তারপর বেঁচে থাকতে, বৃদ্ধি পেতে পরিবার-পরিবেশ লাগেই। আমারই মতো ক'রে তারা সুখে, সুস্থ দেহে, সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে যাতে বেঁচে থাকে, সেই প্রয়াসটা আমাদের চাই।

পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে আমাদের বোধ নেই, তাই সহযোগিতা নেই। তাই চাই একাদর্শ। প্রত্যেকটি ব্যক্তির তাতে যুক্ত হওয়া লাগে। তখন সংহতি, সহযোগিতা দুই-ই আসে। এ-জাতির মধ্যে ওটা আসলে এদের সঙ্গে পারা মুশকিল। তখন এরাই সবজাতিকে বাঁচাতে পারে। গীতায় আছে 'যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্' (যারা আমার যাজন করে, তারা আমাকেই পায়)। যজনের মতো যাজনও ধর্ম্মের অঙ্গ। যজনে নিজের ভিতরে ইষ্টকে প্রতিষ্ঠা করে, যাজনের মাধ্যমে অপরের মধ্যে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখতে হবে যাতে উভয় দেশ, উভয় দেশের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে। আমাদের সমবেত অন্তর্নিহিত ইচ্ছা যদি তেমনতর হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে হবে। আর, তা' না হ'লে হবে না। ভারতে যদি একাদর্শ ও সংহতি আসে তাহ'লে ভারত জগতের উদ্ধাতা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। Common Ideal (একাদর্শ) না থাকলে মানুষগুলির মধ্যে ঐক্য আসে না। Chaos (বিশৃঙ্খলা) থেকে cosmos (শৃঙ্খলা) সৃষ্টি হয় না। বিভিন্ন আদর্শ থাকলেও তাদের মধ্যে পরিপূরণী সঙ্গতিসূত্র থাকা চাই।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যখন বাইরে থেকে জগৎটাকে দেখি, তখন

মনে হয় এলোমেলোভাবে চলছে। কিন্তু এর পিছনে একটা কেন্দ্র আছে ব'লে এই চলার মধ্যে একটা সঙ্গতি আছে। মানুষের জীবনেও একটা আদর্শ থাকলে তারও তেমনি হয়। হনুমান ছিল, তার পিছনে ছিলেন রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের উপর ছিল তার উর্জ্জী ভক্তি। রামচন্দ্র তাকে বহন করুন, তা' সে চায়নি কখনও। সে-ই তার জীবনের সব-কিছু দিয়ে রামচন্দ্রের স্বার্থপ্রতিষ্ঠা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যই চেয়েছে। রামচন্দ্র শত্রুকে ক্ষমা করতে চান তো সে কিন্তু ক্ষমা করতে নারাজ। তাই আগ্রহ-উন্মাদনা নিয়ে সৈন্য সংগ্রহ ক'রে যুদ্ধে জয়ী হ'ল। সে ভাবত—রাম, তুমি আমার বেঁচে থাক, আর আমিও থাকি পারিপার্শ্বিক যা'-কিছু সব নিয়ে তোমারই জন্য। প্রীতির ভিতর যদি পরাক্রম না থাকে, তাহ'লে তা' ক্লীব প্রীতি। তাঁকে ভালবাসতে চাইলে হনুমানের পথ ধরতে হবে। হনুমানের জীবন আমরা যা' জানি, সেই গুণগান করতে হবে মানুষের কাছে।

ডাঃ সুর্যাদা (বসু)—একজন জ্যোতিষী বলেছেন, আশ্বিন মাসে সব খতম হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কথায় কান দিলে হবে না। আমরা চাই আদর্শে সংহত হ'য়ে থাকতে, বাঁচতে, বাড়তে। আদর্শ বলতে আমি বুঝি একজন জীবন্ত মানুষ, যাঁর মধ্যে সব ভাবনা মূর্ত্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর মাঠে উপবিষ্ট। বেশ বাতাস বইছে। হাউজারম্যানদা, স্পেন্সারদা, পরেশ ভোরা প্রমুখ আছেন।

ক্রাইস্ট সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্রাইস্টের কথা মনে হ'লে বড়ই ব্যথা লাগে। একলা-একলা যখন ভাবি তখন কান্না পেয়ে যায়।

'অন্যায়ের প্রতিরোধ ক'রো না' এই কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, এ-কথার মানে হচ্ছে যে, তোমার নিজের সঙ্গে কেউ যদি দুর্ব্যবহার করে, তবু তুমি তাদের ভালবাসবে, ভাল ব্যবহার করবে। কারণ, তাদের বাদ দিয়ে তুমি বাঁচতে পার না, তাই তাদের দৌরাত্ম্য সহ্য ক'রেও তুমি তাদের ভাল ক'রে তুলো। কিন্তু তোমার সামনে যদি কেউ অত্যাচারিত হয় সেখানে কিন্তু প্রতিরোধ করাই বাঞ্ছনীয়।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ২৮।৫। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট।

হরেনদা (বসু), হাউজারম্যানদা, স্পেন্সারদা এবং অন্য দাদারা আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গতঃ বললেন—যারা ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মকে অনুসরণ করে, ধর্ম্ম যাদের জীবনে কিছুটা পরিস্ফুট, যদি ধর্ম্মকথা শুনতে হয়, তবে তাদের কাছে শোনাই ভাল। ধর্ম্মব্যবসায়ীদের ভ্রান্ত পরিবেশনে গা ঢেলে দিতে নেই। তাতে ভ্রান্তিই হ'য়ে ওঠে ধর্ম্মের পথ।

হরেনদা—আজকাল তো দেখা যায় মানুষ প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণের কথা শুনতে চায় না এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতাও করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যে যোগ্যতাই থাক্ না কেন, সে-যোগ্যতা যদি লোকহিতী মহামানবদের সেবায় সে না লাগায়, তাহ'লে তার কোন সার্থকতা হয় না। বরং প্রত্যাশারহিত হ'য়ে সে যদি সতের সেবা করে তাহ'লে সমৃদ্ধি তাকে স্বতঃই অভিনন্দিত করে। মহতের প্রতি অশ্রদ্ধা মানুষের অন্তর্নিহিত দৈন্যেরই পরিচায়ক।

বেঁচে থাকার সার্থকতা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের বেঁচে থাকা সার্থক হ'য়ে ওঠে ঈশ্বরে, অর্থাৎ বেত্তা-পুরুষে। আমার যা'-কিছু দিয়ে যদি তাঁকে পরিপূরণ করতে পারি, তাতেই জীবন সার্থক হয়। আর, এর ভিতর-দিয়েই আসে অমৃতত্ব।

এরপর ধর্ম্মের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সত্তা সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রশ্ন নেই। আর, প্রত্যেকের সত্তাই থাকে নিজস্ব প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এর থেকে অনুমান করা চলে যে, এমনতর থাকার কারণ আছে। সৃষ্টির পিছনে স্রষ্টা আছেন। আর স্রষ্টাকেই আমরা বলি পরমাত্মা বা পরমেশ্বর। ঈশ্বর বা আদর্শে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে সত্তাকে বাঁচাবাড়ার পথে পরিচালিত করাই ধর্ম্ম। এই চিরন্তন ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ।

হরেনদা—আমরা তো অনেকের কাছ থেকে অনেক দয়া পাই, কিন্তু সে তুলনায় তো তাদের জন্য আমরা ততখানি করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যার কাছ থেকে যে উপকার পাই, তার প্রয়োজনমতো তার চাইতে বেশী আমাদের করা উচিত। সেই চেষ্টা সবসময়ই সজাগ রেখে চলা লাগে। তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্যও আমাদের করা ভাল এবং পরিবেশের যার জন্য যেখানে যতটুকু করা যায় তা' করতে হয়। এই সেবাবুদ্ধি থাকলে সবার পক্ষেই সুবিধা হয়।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ২৯। ৫। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা

(হালদার) প্রমুখ আছেন। সন্ন্যাস এবং গার্হস্থ্য সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ গৃহী হওয়াই ভাল, কিন্তু তা' সবাই পেরে ওঠে না। তাই, আদর্শ গৃহী তৈরীর জন্য আজকের দিনে বহু সন্ন্যাসীর প্রয়োজন।

শরৎদা—সন্ন্যাসী Ideal (আদর্শ) তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ideal (আদর্শ) সন্ন্যাসী নয়, Ideal (আদর্শ) ভগবান। তাঁর পথে চলতে-চলতে normally (সহজভাবে) সেজেগুজে তা' হয় না। সন্ন্যাসী পাকা গৃহস্থ। সব গৃহই তার গৃহ হ'য়ে ওঠে।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ৩০।৫।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় ব'সে কয়েকটা বাণী দিলেন।

এরপর প্যারীদা (নন্দী) শ্রীশ্রীঠাকুরকে এসে বললেন—কোলকাতায় আমি যে ওষুধের কথা লিখেছিলাম, তা' ঠিক লেখা সত্ত্বেও ওরা জানিয়েছে যে আমি ভুল লেখার জন্য ওরা ওষুধ পাঠাতে পারেনি। সব বেলায় যত দোষ আমার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ না পেরে দোষ দেয় ভগবানকে। তুই চটিস্ কেন? তোর উপর দোষ দিয়ে ওরা বাঁচতে চায়।

প্যারীদা এই কথা শুনে প্রসন্ন বদনে বললেন—আমিও তো দোষ থেকে বাঁচতে চাই, কিন্তু যেখানে দোষ দেখি না, সেখানে দোষ শোধরাব কিভাবে? তা' সত্ত্বেও অন্যে দোষ দিলে তাকেই বা বোঝাব কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর তা' দিয়ে কাজ কী? তুই ভগবানের কোলে থাক্।

প্যারীদা হাসিখুশি মনে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। ব্রহ্মানন্দদা জিজ্ঞাসা করলেন—মুসলমানরা কি হিন্দুদের থেকে বেশী কূটনীতিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিন্দুরা অসাধারণ কূটনীতিক। কিন্তু সংহতি না থাকায় ক্লীব হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আধুনিক মেয়েদের অনেকের চাল-চলন সম্বন্ধে বললেন—ওরা যেভাবে সেজেগুজে রুমাল হাতে কায়দা ক'রে চলে তা' দেখে আমার ভয়-ভয় করে। ওদের রকম দেখে মনে হয়, যে-কোন সময় প্রলোভনের শিকার হ'য়ে পড়তে পারে। যাদের নিষ্ঠা থাকে, তারা পরাক্রমী হয়। তাদের চলন যতই শান্ত হোক্ না কেন, তাদের কাছে সহজে কেউ এগুতে সাহস পায় না।

কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি চাই, সৎসঙ্গ দেশের আমূল

রূপান্তর নিয়ে আসুক। ভারত আবার সোনার ভারতে পরিণত হোক। নিজেরা ছোটখাট একটা Institution (প্রতিষ্ঠান) ক'রে খেলাম, দেলাম, শান্তিতে থাকলাম, সেটা কোন বড় কথা নয়। দেশের দুরবস্থা মোচনে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। তার জন্য কর্ম্মীদের মনে একটা উদ্বেগ লেগে থাকা চাই। সেই উদ্বেগই মানুষের যোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে। প্রকৃত কর্ম্মী যে, সে প্রতিমুহূর্ত্তে ভাবে তার সব চলাটা আদর্শ-পরিপূরণের সহায়ক হচ্ছে কিনা।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ৩১।৫।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে বসে পূজনীয় খেপুদার কাছে নিম্নলিখিত চিঠিটি লেখালেন—

খেপু,

তোমার চিঠি পেলাম।

এদিকে নস্তুস ও নোটন প্রায় একই রকম। বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন বোঝা যাচ্ছে না। কখনও একটু কম, কখনও আবার বেশী। স্থায়ী উন্নতি কিছু মালুম হচ্ছে না।

এখানে চারিদিকে খুব জলবসন্ত হচ্ছে। বড়খোকার ছেলে সোনার হয়েছে, পণ্ডিতের হয়েছে। তাছাড়া গেস্ট হাউসে তো কথাই নেই। সাত-আটজনের হয়েছে। এদিক-ওদিক আরও আছে। এইসব অসুখ-বিসুখ নিয়ে সতত শঙ্কিত অন্তঃকরণে আতঙ্কপীড়িত হ'য়ে দিন কাটাচ্ছি, বড় বিপন্ন হ'য়ে পড়েছি।

অর্চ্চনার অসুখের কথা শুনে আরও ভাবিত হ'য়ে পড়লাম। কী ধরনের জ্বর সেটা কি বোঝা গেল? যদি টাইফয়েড হয়, তবে সহায়রামবাবুর পোলিপোরিন সংগ্রহ ক'রে দেওয়া ভাল। তাতে পেটের দোষই থাক, লিভারের দোষই থাক, বুকের দোষই থাক, সহজে আরোগ্য হয়।

শোভনার শরীর এখন কেমন? তুমি কেমন আছ? খুকী, শম্ভু, কানু, তোতা, মঞ্জু, বাদল প্রমুখ ভাল আছে তো? তাড়াতাড়ি তোমাদের সব খবর জানিও। আমার আন্তরিক 'রাম্বা' জেনো ও যারা চায় তাদিগকে দিও।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমার
দীন
'দাদা'

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর কয়েকটি বাণী দিলেন।

বাণী দেবার পর যতিদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আগে প্রত্যেকটা পদক্ষেপে আমি সজাগ থাকতাম,—চোখ, কান, নাক, শরীর সবই যেন সদাপ্রস্তুত। যেখানে যা' করণীয় তাই করতাম। আজকাল বোধ আছে, শরীরে পেরে উঠি না। আগে যেমন—একটা শব্দ হয়তো হল, তখনই ছুটে যাওয়া দরকার—ছুটে যেতাম, এতটুকু ত্রুটি ছিল না। তাই, শরীরটাকে সুপটু রাখা খুবই প্রয়োজন।

যখনই আপনাদের কোন ত্রুটি দেখি, তখনই ভাবি, এর মূল কারণটা কী, এবং সেই কারণটা যাতে দূরীভূত হয়, তারই চেষ্টা করি। আমি যখন যেটা বলি তখন-তখনই সেটা করবেন। এতে আত্মসংশোধন সহজ হবে আপনাদের পক্ষে।

শরৎদা (হালদার)—আমাদের ভালমন্দতে ভগবানের কি যায়-আসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের কিছু না হোক আমাদের যায়-আসে। আমরা যত ভগবান থেকে দূরে স'রে যাই, ততই বেঘোরে পড়ি। কষ্ট পাই।

শরৎদা—সবই যখন ব্রহ্ম, তখন প্রতিলোম বিবাহে দোষ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রজননের একটা বিধি আছে। সে-বিধির ব্যত্যয় হ'লে জাতককে যেমন তার ফল ভোগ করতে হয়, তার পরিবেশকেও তেমনি তার ফল ভোগ করতে হয়। অন্তর্জগতে সে এক অভিশপ্ত জীবন বহন ক'রে চলে। জৈবী-সংস্থিতির গোলমালে মানুষকে যে কী কষ্ট পেতে হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই বোঝে।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ১।৬।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

পূর্বপ্রদত্ত একটি বাণী-সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল।

সেই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পৃথিবীতে কোন দুটি মানুষই সব দিক দিয়ে সমান নয়। প্রকৃতির মধ্যেও অবিকল এক,—দুটি জিনিস দেখা যায় না। তাই সবাইকে সমান ভাবা ও সমান করার চেষ্টা সফল হয় না। আমার মনে হয় সমান নেই, সদৃশ আছে। সমান করার প্রচেষ্টা যেখানে সেখানেই গোলমাল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন।

> সমত্বের দাবী যেখানে যত
> দূরত্বও সেখানে তত,
> মমত্বের বোধ যেখানে যত
> মিলনও সেখানে তত।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ৫।৬।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি আশ্রমে। যতিবৃন্দ ও পি এস ভাণ্ডারী আছেন। কথায়-কথায় ভাণ্ডারীদা জিজ্ঞাসা করলেন—অনেক সদ্বংশজাত লোকের ভিতরেও তো দীক্ষা নেবার প্রবৃত্তি দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও হয়তো এমন কতকগুলি প্রবৃত্তি তাকে চালনা করে যে, সে হয়তো দীক্ষা নেবার প্রয়োজন বোধ করে না। আবার, ঐ পথে যখন ধাক্কা খায়, তখন হয়তো এইদিকে ঝোঁকে। ছোট থাকতেই দীক্ষা দিয়ে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি পালনের অভ্যাস করিয়ে দেওয়া ভাল। পরিবারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যিনি তাঁর যদি শ্রদ্ধার্হ চলন না হয় এবং তিনি যদি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে না পারেন, তাহ'লে হয় না। পারিবারিক জীবনে যাজন খুব প্রয়োজন। আর, পরিবারের মধ্যে থাকা চাই একটা ধর্ম্মীয় পরিবেশ। একটা পরিবারও যদি ঠিকভাবে গ'ড়ে ওঠে, আশ-পাশের অন্যান্য পরিবারও তা' দেখে প্রভাবিত হয়। যারা ইষ্টকে নিয়ে ঠিকমত চলে, তাদের সঙ্গে জড়িত অন্য লোকেরাও সেই দিকে আকৃষ্ট হয়।

ভাণ্ডারীদা—সদ্‌গুরুর কাম্য হ'ল মানুষের মুক্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁদের দর্শন সর্ব্বতোমুখী। তাঁরা সব জানেন। একপেশে কথা তাঁরা বলেন না। যেমন ক'রে যা' হয়, তাই বলেন তাঁরা। বর্ণাশ্রম জানেন না, বোঝেন না, তা' কিন্তু নয়। যে-প্রসঙ্গে যে-কথা বলেছেন, সেইটে সেইভাবে না নিলে ভুল হয়। ধর্ম্মপথে চলার অধিকার সবারই আছে। তাই ব'লে সামাজিক জীবনে বিয়ে-থাওয়ার ব্যাপারে একাকার করতে হবে এ-কথা তাঁরা বলেননি। যেখানে যে-বিধি মেনে চললে কল্যাণ হয়, সেখানে তাই মানা দরকার। বৈশিষ্ট্যসম্মত স্বাতন্ত্র্য এবং তার অন্তর্নিহিত ঐক্য দুটোই জানা প্রয়োজন।

ভাণ্ডারীদা—শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মজ্ঞানীই ব্রাহ্মণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতে বর্ণাশ্রম বাদ যায় না। প্রত্যেক বর্ণেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া। বর্ণের মধ্যে ছোট-বড় কথা না। প্রত্যেক বর্ণ একটা বিশিষ্ট রকমের সংস্কার বহন করে, সবারই লক্ষ্য ভগবান। প্রত্যেকেই যেতে পারে সেদিকে।

শরৎদা—ভক্তি জিনিসটা কি বংশগত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জৈবী-সংস্থিতির মধ্যে ঝোঁকটা না থাকলে সহজে হয় না। তবে ভক্তি যে যেদিকে পরিচালিত করে, তার পরিণতি তেমন হয়। একজন হয়তো ভক্তি ন্যস্ত করল এ্যাটম বোম আবিষ্কারের দিকে। সে সেইদিকে উন্নতি লাভ করল। কিন্তু সেই যদি সদ্‌গুরুতে অনুরক্ত হ'য়ে গবেষণামূলক কাজ করে, তবে তার কাজ হয়তো আরও সুন্দর ও কল্যাণপ্রসূ হ'য়ে উঠবে।

ভাণ্ডারীদা—সদ্‌গুরুরা তো জাতপাতের উপর জোর দেন না। তাঁরা বিশেষ ক'রে বলেন প্রেম-ভক্তির কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যদি বলে গুরু নানক, কবীর, স্বামীজী মহারাজ, হুজুর মহারাজ বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে বলেছেন, তা' ঠিক নয়। তাঁরা ভক্তির কথা জোর দিয়ে বলেছেন। তাঁদের কথা—তুমি জাতির বড়াই নিয়ে যদি ভক্তি-সাধনা বাদ দেও, তবে হবে না। সদ্‌গুরু যদি শূদ্রবংশেও আসেন, তাঁকেও কিন্তু গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ বঞ্চিত হতে হবে। রুহিদাস চামার ছিলেন, কিন্তু কত বামুন তাঁর শিষ্য হয়েছে।

প্রফুল্ল—সুকেন্দ্রিক হবার সম্ভাবনা কি সবার সমান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবারই সম্ভাবনা আছে, যার-যার মতো ক'রে।

ভাণ্ডারীদা—শব্দতত্ত্ব আবহমান কাল থেকে আছে। কিন্তু খুব কম মানুষই তা' ধরেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরুর প্রতি টান না হ'লে শব্দ আমাদের উদ্ধার করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ভাণ্ডারীদা, শরৎদা (হালদার) প্রমুখ আছেন। দর্শন, স্বপ্ন ইত্যাদি বিষয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক সময় এমন হয় যে, স্বপ্নের ভিতর সব কিছুর মরকোচ পর্য্যন্ত চোখের সামনে ভেসে ওঠে—যেমন একটা গাছ বড় হচ্ছে—কিভাবে কেমন ক'রে ছোট থেকে বড় হ'য়ে উঠছে, খুঁটিনাটি-সহ সব ধরা দেয়। Whole process (সমগ্র পদ্ধতি)-টা শুদ্ধ, স্বচ্ছভাবে বোঝা যায়। চিৎকণা-টনা যা' বলি, সব তো দেখার উপর দাঁড়িয়ে বলা। বিজ্ঞানের সঙ্গে বেশ মেলে। জাগ্রত অবস্থায় যেমন দেখা যায়, স্বপ্নাবস্থায় অনেক সময় তার থেকে বেশী ভাল দেখা যায়। সাধারণতঃ ঘুমুতে গেলে আমার চোখের সামনে আকাশ ভেসে ওঠে। সে-আকাশ কত স্পষ্ট ও বিশদ।

ভাণ্ডারীদা—উচ্চস্তরে উঠলে কি নিম্নস্তরের সব মনে থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে occur করলে (উপস্থিত হ'লে) জেগে ওঠে—তখনকার মতো। Soul বললে soul-spirit-mind (আত্মা-শক্তি-মন) তিনটে কথা আমার মনে হয়। Soul (আত্মা) বললে মনে হয় basis of existence (অস্তিত্বের ভিত্তি)। Spirit (শক্তি) বললে মনে হয় যেমন ক'রে it sprouts, on which it breathes (যেমন ক'রে গজিয়ে ওঠে ও প্রাণ ধারণ করে)। Mind (মন) বললে মনে হয়—তরঙ্গায়িত সত্তা, existence-এর (অস্তিত্বের) মধ্যে তরঙ্গ আছে।

Realisation (উপলব্ধি) সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওঁ হ'ল sound (শব্দ)। ওঁ-কারকে ভেদ করতে পারলে তারপর যেগুলি আছে, সেগুলিও পাওয়া যায়। 'রাধাস্বামী' শব্দ নয়, শব্দপ্রাণ—এই নাম নিজ নাম, সেইজন্য অনামী কয়। এই feeling (অনুভূতি)-টা যেমন ক'রে sprout করে (গজায়) মানুষের vocal sound (স্বরযুক্ত শব্দ)-এর মধ্যে, তাকে বলা যায় 'রাধাস্বামী'। এটা the central life of the universe (বিশ্বের কেন্দ্রীয় জীবন) হিসাবে feel (অনুভব) করা যায়—যাকে বলা যায় causal thrill (কারণ-স্পন্দন)।

যারা গেরস্থ মানুষ তাদের মাঝে-মাঝে একলা বসা লাগে, মাঝে-মাঝে ভাল সঙ্গ করা লাগে, সব সময় গোলমালের মধ্যে থাকলে ভিতরটা জাগে না।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন।

'শুনলে অনেক—করলে না
ঠকলে কত—বুঝলে না।'

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ৬।৬।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। চুনীদা (রায়চৌধুরী), অজয়দা (গাঙ্গুলী), প্রবোধদা (মিত্র) প্রমুখ আছেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আত্মানুসন্ধিৎসু হ'য়ে নিজের দোষগুলি নিজে ধরা চাই। জিজ্ঞাসুভাব চাই, আর দোষগুলি সংশোধন করা চাই।

আমার একটা ইচ্ছে করে, তোদের মধ্যে কতকগুলি মানুষ বার্ক, শেরিডন, ফক্স-এর চাইতে বড় orator (বাগ্মী) যদি হতে পারিস—অবশ্য চরিত্রের সঙ্গে। আমাদের মধ্যে নামজাদা মানুষ নেই—চেষ্টা ক'রে-ক'রে যদি কেউ হতে পারে। আমাদের মধ্যে এমন মানুষ নেই যে রানাঘাট কলোনীর ভার নিয়ে যা'-যা' করার যথাবিহিত করতে পারে। এই রকম ছোটবড় এক-একটা ব্যাপারের সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব নিয়ে কর্ণধার হয়ে সেই সম্পর্কে যা'-যা' করণীয় বিহিতভাবে করতে পারে। যেখানে যেমনতর ব্যবস্থা বা সমাবেশের প্রয়োজন তা' করে এমন লোক নেই। এইরকম ১০৷১২ জন লোক থাকলে তাদের জেল্লায় ৪০ জনও যোগাড় হ'য়ে যেত।

অজয়দা—আমার মনে হয়, আমাদের ছেলেরা যদি tanning বা hand-made paper-making (চর্মশিল্প বা হাতে তৈরী কাগজের কাজ) শিখে আসে তবে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় ওর চাইতে তেমন able man (সক্ষম মানুষ)

কেউ যদি বিভিন্ন রকমের কাজ শিখে আসে এবং এখানে এসে যার যেমন normal knack (স্বাভাবিক ঝোঁক) তাকে সেইভাবে শিক্ষা দেয় তাহ'লে সুবিধা হয়।

একজন দাদা বলছিলেন, তাঁর বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন তাঁর সহকর্ম্মীরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে তোমার স্বার্থ আছে, প্রত্যাশা আছে, সেখানে কাউকে কিছু দিয়ে বিশ্বাস করতে গেলে বিশ্বাসের নিদর্শন ও প্রতিভূ থাকা চাই। যুদ্ধ করতে গেলে মানুষ যেমন বেড়া দিয়ে চলে যাতে তার বিপদ না আসে, জীবনের পথে চলতে গেলেও তেমনি সাবধান হ'য়ে চলতে হয় যাতে অন্যে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে। সৎসঙ্গীরা তোমার ভাই, কিন্তু শয়তানী তোমার ভাই নয়। তাই সাবধান, তাদের সত্তা তোমার সেবা যেন পায়, কিন্তু তাদের শয়তানীর দ্বারা তুমি যেন আক্রান্ত না হও।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিলেন।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ৭।৬।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়ালের ঘরে ব'সে আছেন। জিতেন (দেববর্ম্মণ এক মা'র খবর এসে বলছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন।

৩রা আষাঢ়, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ১৮।৬।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), সুধাংশুদা (মৈত্র) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপনিষদে Revelation (আপ্তবাক্য) আছে, তাই না ?

কেষ্টদা—হ্যাঁ, আছে কিছু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপনিষদ মানে ?

কেষ্টদা—গুরুর কাছে বসে যে জ্ঞান পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Devoted (অনুরক্ত) হ'য়ে attend (মনোনিবেশ) ক'রে যে জ্ঞান পাওয়া যায়। Revelation (আপ্তবাক্য) মানে যা' revealed (ব্যক্ত) হ'য়ে উঠেছে আমার কাছে।

পুণ্যপুঁথির Revelation (আপ্তবাক্য) সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ও-utterance (উক্তি)-এর জন্য responsible (দায়ী) না।

কেষ্টদা—Revelation (আপ্তবাক্য)-এরই তো কদর বেশী মানুষের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই dictation (শ্রুতলেখন)-গুলির কদর আমার কাছে বেশী।

এগুলিও কিন্তু revealed (দর্শন) হওয়ার মতো ক'রেই আসে। একটা miss (বাদ) হ'য়ে গেলে বলতে পারি না। আমারই experience (অভিজ্ঞতা) যেন আমারই অজ্ঞাতসারে ঘটনা বা অবস্থার উস্কানিতে স্বতঃই বেরিয়ে আসে। যেমন, একটা affair (বিষয়)-এর উপর মন দিলাম—সেইটাকে লক্ষ্য ক'রে absorbed (নিবিষ্ট) হলাম—বুদ্ধি-করা প্রচেষ্টা রইলো না—আসল—কইলাম—অনেক সময় আসে না।

Laboured (কষ্টসাধ্য) রকম হ'লে সে জেল্লা থাকে না—পারিও না। কথাও কই ঐভাবে। পাখীর ঝাঁক আসছে—ধ'রে-ধ'রে ফেলে-ফেলে দিচ্ছি—কী কচ্ছি নিজেই যেন ঠিক পাই না।

গভীরভাবে অঙ্কিত ছাপ চরিত্রের উপর এসে পড়ে automatically (স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে)। যেমন, 'Turn-Turn thy hasty foot' (তোমার অসাবধান পদক্ষেপ তুমি ফেরাও)—এই কথাটা পড়া অবধি ধ'রে গেলো। Laboured (কসরত) ব'লে কিছু থাকে না তখন, এগুলি একটা physiological momentum (শারীরিক গতিবেগ) সৃষ্টি করে, মায় প্রস্রাব করা, থুথু ফেলা পর্য্যন্ত যেন সেইভাবে determined (নির্দ্ধারিত) হয়। যন্ত্রের মতো আমার যেন কোন কিস্মত নেই—আমার কোন তালও নেই, বেতালও নেই।

নাম করতাম—Vision (দর্শন) হ'তো, intuitive knowledge (অন্তর্দৃষ্টিমূলক জ্ঞান) এইভাবে জেগেছিল—common factor (উপাদানসামান্য)-এর knowledge (জ্ঞান)-এর কথা যা' বলি তা' এই। Effort (চেষ্টা)-শূন্য, ego (অহঙ্কার)-শূন্য আগ্রহ যখন থাকে, তখন ঐ intuition (অন্তর্দৃষ্টি) যেন আত্মপ্রকাশ করে। Effort (চেষ্টা) ক'রে কইতে গেলে পারি না।

কেষ্টদা—পরমপিতা ব'লে দেন, এ-কথা বলেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা না থাকলে আমি কই কিভাবে ?

কেষ্টদা—এটা faith (বিশ্বাস), না sensation (বোধ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Faith (বিশ্বাস)-ও কইতে পারেন, কিন্তু faith (বিশ্বাস) ঐ sensation (বোধ)-ই।

কেষ্টদা—পরমপিতা যেন আপনার higher self (ঊর্দ্ধতর সত্তা) এমন মনে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন আমার বাবা আছেন—আমি তাঁর aperiodical continuation (অপরাবর্ত্তনী ক্রমাগতি)। তাঁর বাবা আছেন, তিনি আবার তাঁর

aperiodical continuation (অপরাবর্ত্তনী ক্রমাগতি)—এইভাবে পিতৃপরম্পরা যেন রূপ থেকে রূপে হ'য়ে-হ'য়ে এসেছি।

কেষ্টদা—রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রে লিখেছেন, ঠিক মনে পড়ে, আমি একদিন গাছ হ'য়ে ছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও অমন বোধ করতাম, কিন্তু আরও বোধ করতাম গাছ হ'য়ে transcend (অতিক্রম) ক'রে আছি—এবং কেমনভাবে যে তা' হয়—সবটার mechanism (মরকোচ) শুধু আমার কাছে unfolded (ব্যক্ত) হ'য়ে দেখা দিতো—ছেলেবেলায় কাজলের মত বয়স, একদিন যোগীধোপার ঘাটে ক'জন মেয়েছেলে ছিল। আমি বললাম, আমি তো পার হতে পারছি না। ওরা কোন সাড়া দিল না। আমি তখন ভাবলাম, ওরা একটা আলাদা জাত হয়তো। আমাদের কোন কথা বোঝে না, ওরা হয়তো আলাদাভাবে দেখে, বোঝে, কিন্তু বলে অন্যরকম—একটা মহাবিস্ময়। পরে একদিন যখন শুনলাম, একটা মেয়েছেলের পেটে ছেলে হয়েছে, তখন মনে হল—ও বাবা, এ তো অসম্ভব, ওরা তো সব বোঝে। ওদের পেটে মেয়ে-পুরুষ দুই-ই হয়।

আমার মনে হত—এক মাটি, আলাদা-আলাদা গাছ হয় কি ক'রে? ভেবে পাই না, বড়ই কষ্ট হতে লাগল। কত গাছ তুলে-তুলে দেখি। তখন ফলগুলি, বীজগুলি লক্ষ্য করলাম। আস্তে-আস্তে জিনিসটা ধরা পড়ল। মাটি দেয় nurture (পোষণ)। বীজের বিভিন্নতার দরুন আলাদা-আলাদা গাছ হয়। ঐ থেকেই বোধহয় বর্ণাশ্রমের উপর লক্ষ্য পড়ল—তাই ভাবি, বর্ণাশ্রম নষ্ট করলে সর্ব্বনাশ।

কেষ্টদা—এ-সব তো সত্য দর্শনের মতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fact (তথ্য)-এর উপর দাঁড়িয়ে এগুলি হয়। বস্তুজগতের ভিতর-দিয়েই সত্য প্রতিভাত হয়। সুকেন্দ্রিকতা ও ভক্তির ভিতর-দিয়েই সব জাগে।

কেষ্টদা—কোন্ সত্য কোন্ স্তরের তা' বুঝব কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেটা যত পুরুমাণ, যত penetrating (অন্তর্ভেদী), যত সবখানিকে explain (ব্যাখ্যা) করে, fulfil (পূরণ) করে, সেটা তত উচ্চাঙ্গের।

স্পেন্সারদা আসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইংল্যাণ্ডে নাকি মেধাবী ছাত্রের সংখ্যা দিন-দিন খুব ক'মে যাচ্ছে। আমরা Christ (ক্রাইস্ট) থেকে যত স'রে যাব, জীবনের পথ থেকেও তত স'রে যাব। তখন যোগ্যতাহীন অর্জ্জন ও সাধনাহীন সমত্বের দাবী প্রবল হবে। আর, দাবী প্রবল হ'লে ভ্রাতৃত্বের ভাব থাকে না। এমনি ক'রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন একটা যান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদয় হয়।

শরৎদার ঘড়ি নেই শ্বনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তা'তো আমি জানি না। আমার কেমন জানি ছেলেমান্ষী হাউস। এরা সকলে পরে, মনে হয় আমিও যেন পরেছি—আমিই যেন enjoy (উপভোগ) করি। নিজের পরতে ভাল লাগে না। নিজে প'রে সে সুখ পাই না। আমার মনে হয় নানা দেহ নিয়ে আমিই আছি। সকলের মধ্যে দিয়েই তাই enjoy (উপভোগ) করি। কারও কোনরকম উপভোগ দেখলে মনে হয়, সে যেন আমারই উপভোগ। বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্র যখন হ'ল, তখন ওটাকে মনে হ'তো যেন একটা ভালবাসার মান্ষ—যন্ত্রপাতিগ্নলিকে প্রিয়জনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতই আনন্দদায়ক মনে হ'তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর যতি-আশ্রমে আছেন।

কেষ্টদা, কবিরাজ-মহাশয়, শরৎদা, চুনীদা, প্রবোধদা, হরিপদদা (সাহা) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে একটা জৈবী-সংস্থিতি হয়। সেইটেই মান্ষের আয়ু, বুদ্ধি, বল প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। আগে বিয়ে-থাওয়া, গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কার এমন ক'রে করতো যাতে দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য, সদ্গুণ প্রভৃতি সহজ হ'য়ে উঠতো। এখন সদ্গুণসম্পন্ন মান্ষের জন্মই হচ্ছে বিরল। আজকাল আবার প্রতিলোমের দিকে ঝোঁক গেছে। তাতে কখনও ভাল মান্ষের আবির্ভাব হতে পারে না। ওতে অসঙ্গতি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবেই।

৫ই আষাঢ়, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ২০।৬।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

পূজনীয় বড়দা, হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), প্রবোধদা (মিত্র), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ আছেন।

নন্তুসের অসুখ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল

কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন এবং কয়েকটি বাণী দিলেন।

৭ই আষাঢ়, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২২।৬।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

প্রফুল্ল—মান্ষ ইষ্ট বা শ্রেষ্ঠ অন্রাগ ছাড়াও তো বাহ্যতঃ গরীয়ান হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মান্ষ সেখানে একটা প্রবৃত্তিকে পূরণ করার জন্য আক্রোশী আগ্রহে

আকাশ-পাতাল ঢোঁড়ে তার বৈশিষ্ট্য নিহিত গুণকে অস্ত্র ক'রে নিয়ে। এইভাবে অনেক কিছু করে।

শরৎদা—আমার মনে হয়, মহাপুরুষরা সব কথা বলেন না এবং আমরাও সবটা বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন যেটা প্রয়োজন সেইটার উপর জোর দেন। আপনাদের কোনটা না-বোঝা বা না-জানা থাকে সেটা কিন্তু আমি চাই না। তা' আমাকে profitable (লাভবান) করে না। আপনাদের জানানোই আমার interest (স্বার্থ)। যত করা যায় তত জানা যায়। না করলে জানা যায় না, বুঝের খাঁকতি থাকে। আমার বুদ্ধি হ'ল, আপনাদের জানার আকাশে বা জানার সমুদ্রে ফেলে দেওয়া। তখন ঐ স্রোতই টেনে নিয়ে চলবে। তখন জানার ইতিও থাকবে না, নেতিও থাকবে না। ভক্তি-অনুস্যূত করার ভিতর-দিয়ে নিত্যদাস জ্ঞানটা যেই হ'ল, সেই জানার স্রোতে পড়লেন। ভক্তি কিন্তু আবার চিরকালই উর্জ্জী—তা' মানুষকে বড় ক'রে তোলেই।

প্রফুল্ল—মানুষ প্রবৃত্তি থেকেও যদি কোন জনহিতকর কাজ করে, তার সুযোগ তো লোকে পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' পাবে না কেন? কিন্তু তাতে তার নিজের কী হ'ল। আর তার পরোপকারের সুযোগ যেমন পায়, আবার তার ভ্রান্ত জীবনদর্শন প্রভৃতি বিষ সঞ্চারিত ক'রে লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে থাকে।

শরৎদা—ছেলেপেলেদের সংস্কার কিভাবে বোঝা যায়,—তার কতকগুলি তুক যদি ব'লে দিতেন ভাল হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আগে কত বলেছি, আমার তো মুখস্থ বিদ্যে নয়। আবার সেইরকম পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে তবে আসে। আমি আগে বলেছিলাম ছেলেদের সামনে নানা খেলার সরঞ্জাম থাকবে। কাউকে কিছু বলা হবে না। কোন্ ছেলে কোন্‌টা নিয়ে কী করে দেখতে হবে। তখন দেখা যাবে, কতকগুলি আলাদা-আলাদা দলে ভাগ হ'য়ে যাচ্ছে। একদল হয়তো ইট দিয়ে বাড়ী তৈরী করবে, একদল পি-পি ক'রে হুইসেল দিয়ে গাড়ী-গাড়ী খেলবে, একদল হয়তো ওষুধ তৈরী করবে—এইরকম নানা ধরনের প্রবণতা দেখা যাবে। সেই প্রবণতা-অনুযায়ী তাদের সেইভাবে পরিচালিত করতে হবে। আগে এইভাবের অনেককিছু বলেছিলাম। জীবনভোর কি কম বললাম? ওরে বাবা!

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। একজন টলস্টয়ের ছোটগল্পের বঙ্গানুবাদ

শ্রীশ্রীঠাকুরকে পাঠিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে বইটা রাখতে দিয়ে বললেন—আমাকে ফাঁকমতো প'ড়ে শোনাবেন। যদি কিছু মনে হয় বলব।

৮ই আষাঢ়, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ২৩।৬।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। আজ সকাল থেকে টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছে। শরৎদা (হালদার), বাণীদা (চৌধুরী) প্রমুখ আছেন।

অশ্বত্থগাছের পাশ দিয়ে অজয়দাকে আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—অজয় বোধহয় খুব নাম-টাম করছে, একটু শীর্ণ হ'য়ে গেছে।

অজয়দা (গাঙ্গুলী) এসে যতি-আশ্রমের ঘেরার বাইরে থেকে প্রণাম করলেন। প্রণাম ক'রে ওঠার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে অজয়, কেমন লাগছে ?

অজয়দা এগিয়ে এসে বললেন—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালই লাগে। যারা করে না, তারা বুঝতে পারে না, কত ভাল লাগে। নাম-ধ্যান করার সঙ্গে-সঙ্গে যেমন-যেমন অনুভব হয়, প্রতিদিন একটা রেকর্ড রাখতে পারলে ভাল হয়। এটা একটা প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা তো! আমি অনেককে বলেছি, কেউ রাখে না। এই নোট রাখার মধ্যে দিয়ে আত্মানুসন্ধিৎসা জিনিসটাও বাড়ে। এইসব রীতিমত করার ফলই আলাদা।

যারা প্রাজাপত্য ক'রে পৈতে-টৈতে নেয়, তাদের প্রায় জনের কাছেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি, প্রত্যেকেই বলে—ওর ভিতর-দিয়ে যেন একটা নতুন জীবনের অনুভূতি লাভ করে। আমি প্রায় সকলের কাছেই জিজ্ঞাসা করি।

কথাপ্রসঙ্গে অজয়দা বললেন—ছাতা তৈরির ব্যবসা খুব সহজেই করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোট-ছোট পারিবারিক শিল্প যত রকম হতে পারে সব নোট ক'রে ফেল। কলোনী হলে তখন এক-এক গ্রুপের মধ্যে এক-একটা ঢুকিয়ে দেবে। পাবনায় আগে চেষ্টা করেছিলাম। দেখতাম, জিনিসগুলি বিক্রির ব্যাপারে একটা অসুবিধা হয়। রানাঘাটে সেদিক দিয়ে সুবিধে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। শ্রীকণ্ঠদা (মাইতি), গঙ্গাদা (মাইতি) প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে পারিবারিক সমস্যার কথা বলছিলেন।

প্রসঙ্গত শ্রীকণ্ঠদা বললেন—গঙ্গা যদি মেজ ভাইয়ের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করে তাহ'লে ভাল হয়।

গঙ্গাদা—সে যে আগুন হ'য়ে থাকে সব সময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হোক্ না আগুন, না হয় একটু ফোসকাই প'ড়ে যাবে গায়, তাতে

কী হল? যেখানে যার সঙ্গে যে-ব্যবহার করবি, হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার হওয়া চাই। বুক ভিজিয়ে দিতে যদি না পারলি তবে চামড়া ভিজিয়ে কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

শরৎদা, কাশীদা (রায়চৌধুরী), অমূল্যদা (ঘোষ) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার ইচ্ছা করে যে নূতন কলোনীতে ছোটখাট-ভাবে একটা সুসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় গ'ড়ে ওঠে।

৯ই আষাঢ়, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ২৪।৬।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

আপন মনে নিজেই গুণগুণ করতে লাগলেন—

"এবার ভবে ভাল ভেবেছি,
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি,
যে দেশে রজনী নাই
সে দেশের এক লোক পেয়েছি,
আমার কিবা দিবা কিবা রাত্র
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি,
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই
যোগে-যাগে জেগে আছি,
এখন যার ঘুম তাকে দিয়ে
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি,
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে
সোনাতে রং ধরায়েছি,
মণিমন্দির সেজে দেব
মনে এই আশা করেছি,
প্রসাদ বলে ভক্তিমুক্তি
উভয়কেই সাথে ধরেছি,
আমি কালীর নাম ব্রহ্ম জেনে
ধর্ম্মকর্ম্ম সব ছেড়েছি।"

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানের সময় বললেন—খ্যাপা আজ কথাপ্রসঙ্গে বলল allurement (প্রলোভন)-ই আমাদের নষ্ট করেছে। আমার কিংবা আমাদের central worker

(কেন্দ্রীয় কর্ম্মী) হিসেবে দঙ্গল বেঁধে আমরা যারা এখানে আছি, তাদের যেন কা'রো কিছু করবার সাধ্য নেই। না ক'রে পাওয়ার আমাদের হয়েছে আফিংখোরের মতো অবস্থা—কল্পনা ও কথায় আছে খুব, করায় নেই। এযাবৎ যা' করেছ, তুমি একাই করেছ, আমরা কিছু করিনি, বরং তোমার করার উপর দাঁড়িয়ে ছড়িদারী করেছি—তোমার কাজ তাতে না এগিয়ে অনেক সময় ক্ষতিই হয়েছে। আমরা যে অনেক সময় মতানৈক্যের দোহাই দিই, সে কিছু নয়। নিজেদের অক্ষমতা ও অকর্ম্মণ্যতা ঢাকবার জন্য ও একটা অজুহাত ছাড়া কিছু নয়। এখন হতে পারে, এক তোমার শরীর যদি ভাল হয়, তুমি নিজে যদি কর—তা' তোমার শরীরও ভাল হচ্ছে না, কাজও হচ্ছে না।

পরে আবার স্নানের পর শ্রীশ্রীঠাকুর সামনের বারান্দায় এসে পূজনীয় খেপুদাকে বললেন—তুই যা' বলেছিলি—সেই কথাগুলি প্রফুল্লকে বললাম—আফিংখোরের কথাটা যে বলেছিলি কথাটা একটা লেখার সঙ্গে জুড়ে দিলাম—খুব খাঁটি উপমা দিয়েছিস। আফিংখোরের উপমা দেওয়া লেখাটা শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় খেপুদাকে প'ড়ে শোনাতে বললেন।

পূজনীয় খেপুদাকে লেখাটা প'ড়ে শোনান হ'ল।

১১ই আষাঢ়, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ২৬।৬।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট।

সুকুমারদার (রায়) দাদা বলছিলেন—সুকুমারের মেজাজটা ভাল না, অল্পেতেই চ'টে গিয়ে দাদাকে যা'-তা' ব'লে ফেলে। তাতে পারিবারিক জীবনে অসুবিধা ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Family unity (পারিবারিক একতা) ও family integrity (পারিবারিক সংহতি)-ই তো প্রধান কথা। Family integrity (পারিবারিক সংহতি) যদি আনতে না পার, উন্নতি করবে কিভাবে? মানুষের principle-এ (আদর্শে) আগ্রহ যত ক'মে যায়, তত তার inferiority complex (হীনম্মন্যতা) খেলা করে—সে অল্পেতেই চ'টে যায়, তার অল্পেতেই মান অভিমান হয়, অল্পেতেই কাজ পণ্ড করে। কিন্তু principle-এ (আদর্শে) আগ্রহ যত বাড়ে, ততই complex (বৃত্তি)-গুলি আয়ত্তে আসে, সে অযথা চ'টে বা মানুষকে চটিয়ে কাজ নষ্ট করে না। উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় যাতে সেইভাবেই চলে, unprofitably temper lose (ক্ষতিকরভাবে মেজাজ খারাপ) করে না। কাজহাসিলী মেজাজ বাদে সব মেজাজই বরবাদ, কোন কাজে লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে তামাক খাচ্ছেন। সুধাপানিমা আসলেন। সুধাপানিমার রান্নাবাড়া সম্বন্ধে কথা উঠলো। তিনি বড়মাকে এই ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেন।

প্রফুল্ল—উনি এ-কাজে খুব আনন্দ পান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অকাজে আনন্দ, কাজে নিরানন্দ, এই হ'লে মুশকিল।

এরপরই রমণীদা (সরকার) এসে বললেন—রাণাঘাটের কাছে বহু লোক দীক্ষা নিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবাইকে দীক্ষিত ক'রে সংহত ক'রে তোল। একটা টিকটিকিও যেন বাদ না থাকে। আর, সবার ইষ্টপ্রাণতা যেন হয় অচ্যুত, অটুট।

রমণীদা—অনেকের অবস্থা এমন যে প্রণামী বা ইষ্টভৃতি ঠিকমত দিতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যথাসাধ্য যা' পারে তা' দিয়েই করা ভাল। প্রাণ উছলিয়ে যা' আসে তাই দিয়েই যেন করে। ইষ্টের জন্য করার বুদ্ধি যত হয়, ততই মানুষের যোগ্যতা বাড়ে। চেষ্টা কর, প্রত্যেকের কর্ম্মশক্তি যাতে বেড়ে ওঠে। শ্রমকাতর যেন না হয় কেউ। সাথে-সাথে দেখ, পারিবারিক শিল্প কী কী হতে পারে। যে যেদিক দিয়ে পারগ আছে, তাকে সেইদিক দিয়েই লাগাবে। আর, তোমার কাজ হবে রাখালি। রাখালির উপর দাঁড়িয়ে প্রীতি-অবদান যা' আসে, তা' দিয়েই সংসার চালিও। এটাই বামুনের উপার্জ্জন।

খাঁটি পারশব যারা তাদের অবিলম্বে প্রাজাপত্য ক'রে উপনয়ন নেওয়া দরকার। পারশবের মধ্যে অনেক বাজে মালও ঢুকে গেছে। তাদের কাছে তোমাদের মেয়ে যেন না যায়।······হিন্দী আর ইংরাজী বক্তৃতাটা অভ্যাস ক'রে ফেল।

রমণীদা—মনের শৈথিল্য ঘুচিয়ে তরতরে যদি ক'রে দেন, তবে পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তরতরে হ'লেই তরতরে হওয়া যায়। থিয়েটার করে কেমনভাবে? Mood (ভাব) এনে যা' খুশি করা যায়। ভবরঙ্গমঞ্চ-মাঝে নটরাজ হ'য়ে চল। আর, বেতালে যেন পা না পড়ে, কথায়-কাজে যেন মিল থাকে।

এরপর একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ আসলেন। তিনি আশ্রমের নতুন পরিকল্পনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জমি কেনা হয়েছে বটে, কিন্তু আমার তো টাকার জোর নেই যে তাড়াতাড়ি করব। আমার যা'-কিছু সম্বল আপনারা।

কথাপ্রসঙ্গে ভদ্রলোক বললেন—আমি তো দিনরাত মিথ্যা কথা ব'লে ওষুধ বেচি, আমার জীবনে ধর্ম্ম কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু কি মিথ্যার উপরই দাঁড়িয়ে আছেন? সত্যও আছে। মানুষের

জীবনীয় সেবাও আপনি দেন, নচেৎ কি বাঁচতে পারতেন? মানুষ আপনার কথা কি শুনতো?

উক্ত ভদ্রলোক—আমার মনে হয় রাজনীতি ও ধর্ম্ম মিলাতে গেলে সর্ব্বনাশ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের হিন্দুদের মধ্যে রাষ্ট্রনীতি আলাদা নয়। আছে পূর্ত্তনীতি, পূরণনীতি। ধর্ম্মকে যা' পূরণ করে তাই পূরণ-নীতি।

উক্ত ভদ্রলোক—বিংশ শতাব্দীর রাজনীতি তা' নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনের জন্য যে রাজনীতি সেই রাজনীতিই চিরকালীন রাজনীতি। নিজের কৃষ্টি, নিজের সত্তা যাতে অপমানিত হয় সে-রাজনীতির মূল্য কী?

উক্ত ভদ্রলোক—আমার নাস্তিকতা যায় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাস্তিকতার মানে কী, বুঝতে পারি না।

উক্ত ভদ্রলোক—ধর্ম্মের দিকে টান নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করলেই হয়। আছি, থাকতে চাই, বাড়তে চাই,—এ আস্তিকতা আছেই।—এই যাতে পরিপূরিত হয় তাই ধর্ম্ম। আমরা না-জানার বাহাদুরী বেশী করি, অনুসন্ধিৎসা নেই। জাঁকজমকওয়ালা কিছু দেখলেই অভিভূত হ'য়ে পড়ি, তাতে সুবিধা কী দেখি না। Cultural conquest (কৃষ্টিগত পরাভব)-এর ফলেই এমন হয়। আমরা বাঁচতে চাই। একলা বাঁচা যায় না। জন্ম নিতেই লাগে মা-বাপ। বাড়তে লাগে পরিবার, পরিবেশ। এদের সকলকে নিয়ে সবৈশিষ্ট্যে উদ্বর্দ্ধনে চলাই আমাদের স্বার্থ। তারই সূত্রটা মেলে ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টির ভিতর।

উক্ত ভদ্রলোক—আমি ধর্ম্মস্থানে এসেছি, এখানকার আদব-কায়দা কিছু জানি না, কিছু মনে করবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদব-কায়দা আবার কী? মানুষ তার প্রকৃতি নিয়ে চলে, তার মধ্যে আবার আলাদা আদব-কায়দা কী? ধর্ম্মস্থানে না গেলেও আপনি মানুষের কাছে যান তো? এখানে সেই, তাছাড়া তো কিছু নয়।

উক্ত ভদ্রলোক—কোটিপতি, গরীব—দুনিয়ার এই যে বৈষম্য, এ তো ভগবানই করেন—এ কেমন ভগবান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনিই করেন কি আমিই করি, তাই তো বুঝতে হয়।

উক্ত ভদ্রলোক—পুরুষকারকে নতি স্বীকার করতে হয় দৈবের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দৈবও পুরুষকার, করাটাই দৈব হ'য়ে ওঠে।

উক্ত ভদ্রলোক—আমি এত চেষ্টা করি, কিন্তু যা' চাই তা' পাই না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাওয়া-অনুপাতিক করা হয় না। আগে করা, তারপর পাওয়া বা হওয়া।

উক্ত ভদ্রলোক—ভগবান খুব পক্ষপাতী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা পক্ষপাতী কিনা, তাই ভগবানকে খুব পক্ষপাতী ভাবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইদানীং খুব কাশি হয়েছে। সেই সম্পর্কে তিনি বললেন—কুকুরটা যখন এইভাবে কাশত আমি তখন তার সঙ্গে যেন একীভূত হ'য়ে যেতাম। কষ্টবোধ হ'ত আর ভাবতাম, আমার যদি ঐ-রকম অবস্থা হয়, তাহ'লে না জানি কী অবস্থা হবে। সে কুকুরটা বাঁচল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

প্রফুল্ল—আপনি যা' বলেন, তা' অনেকখানি বোঝা যায়, কিন্তু নিজেদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি না থাকায় ধ'রে রাখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন—সে করায়ে দেওয়া যায়। তোমরা তো অনেকখানি ঠিকও পাও। আমার যা' বলা—সে তো ঘটনার বিবরণ—ন্যাংটা কথায় বলা। এতে যা' ধরতে পারছ, যে বোধ হচ্ছে, সে কমখানি না। এর ফল আছেই। লাখো পড়াশুনার ভিতর-দিয়েও এ হ'তো না। বরং অন্য ছাপ মাথায় বেশী থাকলে যা' বুঝছ তাও বুঝতে পারতে না।

১৩ই আষাঢ়, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ২৮।৬।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। শরৎদা (হালদার) জিজ্ঞাসা করলেন—Absolutely positive or negative (চূড়ান্ত ঋজী এবং রিচী) দুনিয়ায় কিছু আছে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Negative-prominent, positive-prominent (রিচী-প্রধান, ঋজী-প্রধান) এইরকম হ'তে পারে—positive pole (ঋজী মেরু) ছাড়া negative pole (রিচী মেরু) থাকে না—negative pole ছাড়া positive pole থাকে না।

শরৎদা—মেয়েদের নাড়ী দেখার সময় বা হাত দেখার সময় বাম হাত দেখে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি মেয়েদের বাম পা আগে চলে। তা' যদি ঠিক হয়, তার মানে ওদের বাম দিকটা impulse carry করে (সাড়া বহন করে) বেশী। ওদের nervous system (স্নায়ুতন্ত্র) বামদিকটায় হয়তো active (সক্রিয়) বেশী—তাই বোধ হয় অমনি করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনেক সময়

অনেকে যে বলে কর্ম্মে নেই, ভাগ্যে নেই, কপালে নেই—কথাগুলি কিন্তু ঠিক। ভাগ্যে নেই মানে ভজন নেই, কপালে নেই মানে brain (মস্তিষ্ক)-এ নেই।

শরৎদা—আপনি তো অনেক সময় কোষ্ঠী দেখেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কী দেখি বলেন তো? আমি দেখি কতখানি কোন্‌টা কিসের দ্বারা obsessed (অভিভূত)। গ্রহ অর্থাৎ characteristics of complexes (বৃত্তির বৈশিষ্ট্য) দেখি। Destined (নির্দ্ধারিত) হিসাবে কিছু ভাবি না, বুঝি না।

শরৎদা—আমরা তো বলি—A leader is born—ঈশ্বরকোটি পুরুষ ছাড়া এ কাজ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বরকোটি প্রত্যেকেই হ'য়ে উঠতে পারে।—এইটেই তো আমি মানি। Destined (নির্দ্ধারিত) কিছু নয়। যেমন Bio Motor আনতে চেয়েছিলাম। একজন দেবে বলে দিলো না, তাইতো আনা আর হ'য়ে উঠল না। পারলাম না আর হলো না এক কথা নয়। Bio Motor যে আনতে পারতাম না তা' নয়—আনা হয়নি। আপনারা যেমন জেনে-শুনে-বুঝেও করলেন না—আপনারা যে পারতেন না তা' নয়, করলেন না। তা' না হ'লে বাংলার এই দশা হয়?

শরৎদা—বায়ো-মটর আনার ব্যাপারে আপনার করার তো ত্রুটি ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার করা তো শুধু আমার একার উপর নির্ভর করে না, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আমি তো জড়ান। তবে অন্য সব কাজ ফেলে দিয়ে ঐ নিয়ে যদি লেগে থাকতে পারতাম, তাহ'লে হয়তো বা হত, তাও তো সম্ভব হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বাইরের তাঁবুতে এসে বসেছেন। অনেকেই আছেন।

মেন্টুভাইয়ের (বসু) সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মন্দের জন্য ভাল আবার ভালর জন্য মন্দ—এই দুরকম আছে। যেমন তোমার স্ত্রীর সঙ্গে ভাব করতে চায় বলে কেউ হয়তো খুব service (সেবা) দিচ্ছে। তার সব service (সেবা), sympathy (সহানুভূতি) ও sweetness (মিষ্টতা)-এর ভিত্তি ঐ কু-মতলব। আবার, হনুমান যেমন চুরি করল রামচন্দ্রের জন্য, তার এ মন্দটা কিন্তু ভালর জন্য।

মেন্টুভাই—ভগবানের কাছে ভালমন্দ তো সমানই প্রিয়। শয়তানও তাঁর প্রীতি থেকে বঞ্চিত হয় না। কারণ, সেও তো তাঁর থেকে আলাদা নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কী! শয়তান মানে যে কিনা ভগবানের বিরোধী, তাঁকে বাধা দিতে ও উচ্ছেদ করতে চায়। তাই, ভগবানের কাছে ইষ্টমুখী সৎলোক ও শয়তানী চরিত্র সমান হতে পারে না। ভগবান কি শয়তানীর তারিফ করেন? তিনি খারাপকে খারাপই বলেন এবং ভালকে উৎসাহ দেন। কেননা, সেটা সত্তাসম্বর্দ্ধনার অনুকূল,

আর খারাপকে resist (প্রতিরোধ) করাই দরকার। তুমি যদি আমাকে ভালবাস আর আমার এই কাশিটা যদি আমার সত্তার পরিপন্থী হয় তাহ'লে এই কাশিটাকেও কি ভালবেসে জীইয়ে রাখতে চাইবে? এই কাশিটার নিরসনই তো তুমি চাইবে।

রাঙামা (ভূষণী মা)—ঠাকুর ভালমন্দ সকলকে ভালবাসেন ও সহ্য করেন ব'লে আমাদের তো তা' অনুকরণ করা চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি খারাপ লোককে ভালবেসে তার সংশোধনের জন্য কিভাবে কী করি তা' আবার বোঝা লাগে, এবং তেমন লোককে ভালবাসতে গেলে যেখানে যার ভালর জন্য যেমনতর ভাবে যা'-যা' করতে হয়, তার সবখানেই তেমনভাবে করা লাগে। নচেৎ শুধু উপর-উপর ভাল ব্যবহার করলেই কাজ হয় না।

১৬ই আষাঢ়, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ১।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। অনেকেই কাছে আছেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জৈবী-সংস্থিতি vital current-এর (জীবনীয় তরঙ্গের) উপর যে electricity-র (বিদ্যুতের) সৃষ্টি করে তার যে তরঙ্গ তাকেই কইতে পারি মন। আমাদের এই মনের পিছনে আবার universal mind (সার্ব্বজনীন মন) আছে—নচেৎ ঐখানে বাঁধা প'ড়ে যেতে হ'ত—ঐটে আছে ব'লেই পুরুষকার আছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যদার (দে) মার কাছে একটা চিঠি লেখালেন।

মা,

তোমার চিঠি পেলাম।

সত্য এখানে এসে প্রথমটা স্যাভয় হোটেলে উঠেছিল—কালই তাকে এখানে আনাবার ব্যবস্থা করেছি। সে এখন রঙ্গিনভিলায় আছে। তার খাওয়া-দাওয়া, সেবা-শুশ্রূষা, দেখা-শুনা ও তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে বীরেনদা দায়িত্ব নিয়ে কতিপয়ের সাহায্যে যা'-যা' করণীয় বিশেষ যত্নসহকারে করছেন। আমিও সদাসর্ব্বদা খোঁজ-খবর নিচ্ছি—আমার শক্তি ও সাধ্যমত যা' করার করছি এবং যে-ক'দিন থাকে—তাতে ত্রুটি হবে না আশা করি।

কাল সত্যর সামান্য temperature (তাপমাত্রা) হ'য়েছিল—ডাক্তার লক্ষ্য রাখছে এবং যা' করার করছে। কাল আসার দিন station থেকে হোটেলে যাবার সময় জলে ভিজেছিল ও নাকি খুব—সে কারণেও জ্বর হতে পারে।

তোমরা সবাই কেমন আছ? প্রার্থনা তাঁর চরণে তোমরা সুস্থদেহে, সুখে সম্বৃদ্ধ অন্তরে, সানন্দে সুদীর্ঘ জীবন উপভোগ কর।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো ও যারা চায় তাদিগকে দিও।

ইতি
মা
তোমারই
দীন
সন্তান
"আমি"

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন। বাণী দেওয়া শেষ হ'য়ে যাবার পর-পরই পূজনীয় কাজলভাই এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন—আমার মাথা ও চোখের ব্যথাটা এখনও সারেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমন একটা tactics (কৌশল) শেখা লাগে যাতে সেরে যায়। রোজ ভোরে উঠে দোতালার উপর দাঁড়িয়ে দূর-দিগন্তে সবুজ রেখার দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ভাল হয়। তুমি ভোরে ওঠ তো?

কাজল—রাত্রে শুতে দেরী হয়, তাই ভোরে উঠতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভোরে ওঠা খুব ভাল! আমি বরাবর খুব ভোরে উঠি। ভোরে উঠে নামটাম ক'রো—দেখো কেমন লাগবে—মনে হবে সূর্য্যের সোনালী কিরণগুলি যেন নূতন জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে সবার মধ্যে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

পূজনীয় বড়দা, শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), খগেনদা (তপাদার) প্রমুখ আছেন।

একটি পাঞ্জাবী দাদা আসলেন। তাঁর বাড়ী পশ্চিম পাঞ্জাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ী কোথায়?

উক্ত দাদা—মুলতান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাংলা বোঝা যায়?

উক্ত দাদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে?

উক্ত-দাদা—হ্যাঁ! আগের থেকে একটু খারাপ হয়েছে।

বর্ত্তমানকালে leader (নেতা)-দের অদূরদর্শিতা সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়নি, led (চালিত) হয়নি, তারা leader (নেতা) হলে বিপর্য্যয়ই হয়। আমাদের শরীরের চামড়া না থাকলে

যেমন শরীরে বাঁধন থাকে না, তেমনি কৃষ্টিকে আঁকড়ে না ধরলে আমাদের সত্তা টেকে না।

শরৎদা—করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের প্রধান করণীয় হ'ল কৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করা, পরিপালন করা, তাকে পরিবেশন করা এবং পরিপূরণী আদর্শে সংহত হওয়া।

শরৎদা—দুর্গাশক্তি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেবতারা অসুরদের দ্বারা নিপীড়িত হ'য়ে ক্ষীরোদ সমুদ্রের কাছে সমবেত হ'য়ে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং তাঁদের দেহ থেকেই এক-একটা শক্তির রশ্মি নির্গত হ'য়ে নাকি দুর্গায় রূপায়িত হ'য়ে উঠল। এখনও আমাদের প্রাণ যদি আবার তেমন আকুল-উদ্বেল হ'য়ে ওঠে, আমরা দুর্গাশক্তির সন্ধান পাব।

শরৎদা—শুধু চণ্ডীপাঠে কি কিছু লাভ হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম জিনিস আদর্শ। আদর্শে যতই সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠব, ততই সব-কিছু সার্থক হ'য়ে উঠবে।

শরৎদা—মন্ত্র মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্ত্র কথার মানে যার মনন করলে, সাধন করলে আমাদের মনের knot (গ্রন্থি) কেটে যায়।

এরপর concentration (একাগ্রতা) সম্বন্ধে কথা উঠল।

পাঞ্জাবী দাদা—Concentration (একাগ্রতা) কিভাবে আসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁতে অচ্যুত ও সুনিষ্ঠ যত হই, ততই normal concentration (সহজ একাগ্রতা) আসে। তাঁর প্রতি ভালবাসায় complex (প্রবৃত্তি)-গুলির meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হয়। আমার যদি টান থাকে তবে মন যেদিকেই থাক না কেন, তাতে কিছু আসে-যায় না। কারণ, ঐ টানের ফলে মন আপনা থেকেই বাগে আসে এবং তাঁর interest (স্বার্থ) যাতে fulfilled (পরিপূরিত) হয় তাই করে।

পাঞ্জাবী দাদা—আমরা পশ্চিম পাঞ্জাবে কেন এত কষ্ট পেলাম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আমরা ভগবানের পথে চলি না, আমরা সংহত নই। তা' যদি হ'ত, তাহ'লে কী হ'ত বলা যায় না। আমরা জীবনের মৌলিক বিষয়গুলি যখন উপেক্ষা করি, তখন তার প্রতিক্রিয়া একটা বিপর্য্যয়ের ভিতর-দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। আমরা নানা আন্দোলনের ভিতর-দিয়ে এটা আমন্ত্রণ করেছি। আমরা কৃষ্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, সংহতি হারিয়ে ফেলেছি। অশোকের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম ভেঙে দিয়ে মেরুদণ্ডটা ভেঙ্গে দিয়েছিল। আমাদের নেতারাও সব

দিক দিয়ে আমাদের কৃষ্টির মূল সূত্রকে অবজ্ঞা করেছেন। আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে আমাদের এভাবে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি তো মানুষই চাই। চল্লিশজন মানুষ তেমন যদি পেতাম, তাহ'লে হয়তো দেশের চেহারা বদলে যেত। আমি সবার কাছেই মানুষ ভিক্ষা করি। কিন্তু তেমন মানুষ আমি এখনও পাইনি।

শরৎদা উক্ত পাঞ্জাবী দাদাকে আত্মসমর্পণের কথা বলছিলেন।

উক্ত দাদা—আত্মসমর্পণ তো সমগ্র মন দিয়ে করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন দিয়ে করার চাইতে প্রীতি দিয়ে করা যায় ভাল। আত্মসমর্পণ মানে কাউকে আমার জীবনে সর্ব্বতোভাবে প্রধান ক'রে তোলা।

উক্ত দাদা—আমার তো বহু selfish desire (স্বার্থপর ইচ্ছা) আছে, সেগুলি তো বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Desire (কামনা) আছে ব'লেই তো সুবিধা আছে। সমস্ত কামনার মধ্যে যদি তিনি থাকেন তাহ'লেই ল্যাঠা চুকে যায়। আর, কামনাগুলি কারও প্রীতি ও প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য ক'রে যদি না হয় তবে সে কামনার পূরণ আমাদের সুখী করে না। হনুমানের কথাই চিন্তা ক'রে দেখ না। তার তো কত desire (কামনা) ছিল। কিন্তু রামচন্দ্রের সংস্পর্শে যখন আসল, তখন তাঁর প্রতি তার এমন অকাট্য টান হ'ল যে, সব স্পৃহা তুচ্ছ হ'য়ে গেল। রামচন্দ্রের সুখশান্তিই তার একমাত্র কাম্য হ'য়ে দাঁড়াল।

১৭ই আষাঢ়, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ২।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

মন্মথদা (ব্যানার্জী) এক নবদীক্ষিত পার্শী দাদা সহ আসলেন।

উভয়ে প্রণাম করবার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত পার্শী দাদার নানা প্রকার খবরাখবর নিলেন এবং রাণীমার কাছে তার খাবার ব্যবস্থা করলেন

১৮ই আষাঢ়, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ৩।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন।

একটি বাণী দিলেন।

এরপর শরৎদা প্রশ্ন করলেন—লোকচরিত্র আপনি তো খুব ভাল বোঝেন, অথচ আপনি মানুষের দ্বারা deceived (প্রতারিত) হন কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের খারাপের সম্বন্ধে মনে হ'লেও নিজেকে সন্দেহ করি, উল্টোটা ভাবি। ভাবি শুধরেও তো যেতে পারে, ভালও তো হ'তে পারে, এইরকম ভাবতে না পারলে toleration (সহনশীলতা) আসতো না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার কয়েকটি বাণী দিলেন।

২১শে আষাঢ়, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ৬।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানের আগে বড়াল-বাংলোর পিছনের বারান্দায় ব'সে তেল মাখছিলেন।

প্রফুল্ল কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন—দেখতে হয় কাকে আমি সব চাইতে বেশী ঘৃণা করি, বা অপছন্দ করি। সেই বুঝে তার সঙ্গে প্রীতি ও সমবেদনার সঙ্গে মিলে-মিশে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারে ঐ ঘৃণার নিরসনে তার প্রতি ধীরে-ধীরে স্নেহল হ'য়ে উঠতে হয়। তার প্রতি যতখানি স্নেহল হওয়া যায়, সব ব্যাপারেই সবার প্রতি মানুষ অতোখানি স্নেহল হ'য়ে ওঠে স্বভাবতঃই। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে তাহ'লে কি বাঘের কাছে যাব প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার নিয়ে? হ্যাঁ—তার কাছেও যাওয়া চলে অবশ্য উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন ক'রে।

২২শে আষাঢ়, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ৭।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে কয়েকটা বাণী দিলেন।

এরপর অরুণ (জোয়ারদার) বলছিল—অনেকে ফেল করার দরুন খুব দুঃখ করে, আত্মহত্যা করতে চায়। তাদের আমি বোঝাই, কিন্তু তারা চ'লে গেলে নিজের কথা ভেবে আমি বিমর্ষ হ'য়ে পড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ও-জাতীয় হয় না। আমার মনে হয় কী করলাম, কী করিনি, কী করা হয়নি, কেন এটা হ'ল এবং কী করলে এর প্রতিকার হয়। যা' করবি thoroughly (নিখুঁতভাবে) করবি। সেইজন্য আমি তো বলেছিলাম Mathematics (অঙ্ক) কষবি, এম-এ-র Mathematics (অঙ্ক) ক'ষে ফেলবি। ইংরেজী লিখবি তো এমন সব word (শব্দ) use (ব্যবহার) করবি যে তার construction (গঠন) দেখে মানুষ অবাক হ'য়ে যায়। আমার ঐ-রকম একটা ঝোঁক আছে ব'লে বোধহয় ইংরাজী কিছু না জানলেও যা' বলি তা' ফেলনা হয় না। বাংলায় যা' বলি, তা' কতদূর কোন্ মেকদারের বলতে পারি না, তবে একটা নূতন pose (ধরণ) হয়েছে। আমার ঐরকম ঝোঁক আছে, তারপর কেষ্টদাই বোধহয় উসকিয়ে দিয়ে অমনতর আদায় ক'রে নিয়েছে।

শরৎদা—আজকাল কেষ্টদা তো অনেক সময় উপস্থিত থাকেন না তাও কত সুন্দর-সুন্দর লেখা বেরোয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদাও সেই কথা বলে।

২৩শে আষাঢ়, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ৮। ৭। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। পরশুরামদা, শরৎদা (হালদার), হরিপদদা (সাহা) আছেন।

পরশুরামদা—উপবাসে কি self development (আত্মোন্নয়ন)-এর সহায়তা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপবাসে প্রবৃত্তিগুলি দুর্ব্বল হয়, তাই devotion (ভক্তি) develop করে (বাড়ে) সে পরিমাণে। অবশ্য, কোনটাই বেশী ভাল না। যুক্তাহার বিহারের কথা তাই অতো জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

২৪শে আষাঢ়, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ৯। ৭। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন।

শরৎদা (হালদার) জিজ্ঞাসা করলেন—Individual atom ও electron-এর মধ্যে কি free will আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুনিয়ার মধ্যে যে free will নেই কোথায় ভেবে পাই না। আর free will work (কাজ) করে affinity (আগ্রহ) দিয়ে।

শরৎদা—সেই মূল fiee will (স্বাধীন ইচ্ছা) একজনের তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই fiee will (স্বাধীন ইচ্ছা) তো সবারই। এক-একটা constitition (গঠন)-এর মধ্যে এক-এক রকম। যার যেমন constitition (গঠন) তার fiee will (স্বাধীন ইচ্ছা) তেমন।

২৫শে আষাঢ়, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ১০। ৭। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসেছেন।

সন্তোষদা (দত্ত) এসেছেন। তাঁদের বাড়ীতে খুব আম-কাঁঠাল হয়, সে-কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আম-কাঁঠাল খেয়ে হজম করতে পারলে খুবই ভাল। ওতে সারা বছরের রসায়ন হয়ে যায়। আর পুদিনা, শুলপো শাক, ধনেপাতা, আমলকী ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে যদি চাটনী করে খাও, তাতে normal (স্বাভাবিক)

ভিটামিন 'A' ও 'C' খুব থাকে। এতে শরীরের সমস্ত function (ক্রিয়া) গুলি toneup (উজ্জীবিত) করে, resistance power (প্রতিরোধ ক্ষমতা) বাড়িয়ে দেয়, সহজে কোন অসুখ হতে পারে না, হঠাৎ সর্দ্দি-কাশী-জ্বর, পেটের অসুখ বা ক্ষয়রোগ ইত্যাদি আক্রমণ করতে পারে না। আর, আমানির জল যদি কালী কলাইয়ের জুসের সঙ্গে (এক টাম্বলার গ্লাসের মধ্যে দুই আউন্স আন্দাজ) খাওয়া যায় নুন, লেবু, আদা ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে, তাহ'লে শরীরের পক্ষে খুব ভাল হয়। স্নায়ু পুষ্ট হ'য়ে ওঠে। কালী কলাইয়ের অনেক গুণ। তবে একটু বায়ু হয়। আদা দিলে তা' নষ্ট করে। রোজ সকালে শটির বরফি খেতে পারলেও খুব বেশ হয়। ওটা পেটের পক্ষে ভাল, আবার সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়রোগ-নিবারক।

২৭শে আষাঢ়, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ১২।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। দিনটা মেঘলা। থেকে-থেকে, বারবার ঝুপঝুপ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছে। শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), তারকদা (ব্যানার্জী), হাউজারম্যানদা প্রমুখ আছেন।

বড়াল-বাংলোর দেওয়ালের বাইরে একটা মহিষের বাচ্চা আর্ত্তস্বরে ডাকছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে বললেন—বোধহয় ওর মা হারিয়ে গেছে।

একটু পরে ওর মা ডেকে উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ওর মা বলছে ভয় নেই, আমি আছি। এই বাচ্চাই পরে বড় হ'য়ে হয়তো passionate (প্রবৃত্তিপরায়ণ) ও selfish (স্বার্থপর) হ'য়ে উঠবে, মার ধার আর ধারবে না।

হাউজারম্যানদা—বড় হওয়াটা তাহ'লে খারাপ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই বড় হওয়াটাই ভাল, concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে যে বড় হয়। Complex-এর (প্রবৃত্তির) থেকে যে বড় হওয়া তাকে সত্যিকার বড় হওয়া বলে না। সে একটা টিউমারের মতো বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু নয়।

২৮শে আষাঢ়, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ১৩।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে একটা বাণী দিয়ে সেই প্রসঙ্গে বললেন—একটা সিদ্ধান্ত করলাম। কিন্তু হাত, পা, নাক, কান যা' দিয়ে সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত হবে, সেগুলি যদি নিথর হ'য়ে থাকে আর মাথাটা তাজা থাকে, তবে ওরাই ঐ তাজা মাথার কাম সেরে দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যদি শ্রেয় কারও প্রতি বিশেষ টান থাকে ও সেইসঙ্গে প্রবৃত্তির টান থাকে, তখন যে ঠোক্কর লাগে, তাতে বোঝা যায় ঠাকুর কাকে বলে—ঠাকুর কী জিনিস। ওতে নিদারুণ কষ্ট হয়। আর, শ্রেষ্ঠকে খুশি করতে গিয়ে তখন ঐ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতেই হয়। ভালবাসাই মানুষকে সুকেন্দ্রিক করতে পারে। অবশ্য, চেষ্টা যে একেবারে কিছু নয়, তা' নয়। চেষ্টার ভিতর-দিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

২৯শে আষাঢ়, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১৪।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), কালিদাসদা (মজুমদার) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কোন একটা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারলে আমাদের ক্ষমতা বাড়ে। সেইটের উপর দাঁড়িয়ে আরও কাজ করতে পারা যায়। কিন্তু একটাও না পারলে পারার পথ খোলে না।

তারপর অন্য কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অভাব যদি থাকে এবং তা' অতিক্রম ক'রে আদর্শকে পরিপূরণ করার উদগ্র সক্রিয় আবেগও যদি থাকে, তাহ'লে অভাবের ভিতর-দিয়েও মানুষ বড় হ'য়ে ওঠে। তবে কেন্দ্রায়িত হওয়া চাই। নচেৎ এটা ধরলাম, ওটা ছাড়লাম, তাতে কোন কাজ হয় না। Chaste achivement (সাধু সাফল্য) যেখানেই আছে, সেখানে concentric urge (সুকেন্দ্রিক আকুতি) আছেই।

কেষ্টদা—Concentric (সুকেন্দ্রিক) তো তাঁর দয়ায় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর দয়ায় হয় এই কথাই বলা ভাল। কারণ, তাতে তাঁর দয়ার উপর নজর থাকে—'তিনি' 'তিনি' ক'রে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিয়ে বললেন—ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন না হ'লে মানুষের নিজের এবং অপরের উপর আধিপত্য আসে না। অকাট্য ইষ্টানুরাগে লক্ষ্য থাকে যে আমি কখনও প্রবৃত্তির বশীভূত হব না, বা কারোর হাতের ক্রীড়ণক হব না। তাতে মানুষের চৌম্বক শক্তি বাড়ে। মানুষের আগ্রহকে উদ্দীপ্ত ক'রে তাকে সুকেন্দ্রিক ক'রে দিতে না পারলে তার বা আমার কারও কিছু হয় না। মানুষকে টাকা-পয়সা যতই দেওনা কেন, তাতে তার কিছু হয় না।

কর্ম্মক্ষেত্রে অসুবিধা-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেথরগিরি করতে গেলে গু-র গন্ধে কাবু হ'লে কি চলে? মানুষের চরিত্র যতই খারাপ হোক না কেন, কাউকে ঘৃণা করলে চলবে না। প্রত্যেককে সুস্থ-স্বস্থ করা লাগবে। আগে আমার নিজের শক্তি ছিল। সবাইকে সব সময় চোখে-চোখে রাখতে পারতাম, সকলের পিছনে ছুটে-ছুটে বেড়াতাম, কেউ কোন অকাম করতে গেলেই চোখে পড়ত। তখন চলতও সবাই সেইভাবে—রোগ ছিল না, মৃত্যু ছিল না, খেতে পায়নি তবু কষ্টকে কষ্ট ব'লে বোধ করেনি। সে ফুরসুত তাদের ছিল না, আনন্দে দিন কেটে গেছে। অনুরাগের আনন্দ আছে, কিন্তু অভাবের ব্যাপারীদের আনন্দ নেই—যতই পাক তারা।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—তাড়াতাড়ি যদি বিছিয়ে যেতে পারতাম, বেশীরভাগ লোকের মধ্যে যদি ইষ্টকৃষ্টিমূলক ভাবগুলি ঢুকত, তাহ'লে বোধহয় জাতটাকে বাঁচান যেত।

নানাপ্রকার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বেশী লেখাপড়া শিখলে বিপদ হ'ত। কোথায় যে তল মেরে যেতাম ঠিক ছিল না। বহুকে আর ভেদ করতে পারতাম না।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার কথাগুলি scientific (বৈজ্ঞানিক) ও rational (যুক্তিযুক্ত) মনে হয় না?

কেষ্টদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fact-এর (তথ্যের) উপর দাঁড়িয়ে বলা, তাই বোধহয় মেলে সকলের সঙ্গে।

৩০শে আষাঢ়, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ১৫।৭।১৯৫০)

আজ থেকে ঋত্বিক-অধিবেশন শুরু হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। বাইরে অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন।

শরৎদা—আমরা যেমন জৈবী-সংস্থিতির উপর জোর দিই, Marx সেরকম পরিবেশের উপর খুব জোর দিয়েছেন। সেটাও তো সমর্থন করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আছি ব'লে পরিবেশ থেকে খাদ্য নিই। আমি না থাকলে নিতে পারতাম না। কত জন্তু নাশ পেয়ে গেছে পরিবেশ থেকে পোষণ নিতে পারল না ব'লে। পরিবেশ আমাদের জৈবী সংস্থিতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হ'লে আমরা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে বাধ্য হব। সমগ্র পরিবেশ যদি অসৎ হয় আর তার অনুচর্য্যা যদি করা লাগে তবে আমাদের নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে।

মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কালের ও পরিবেশের প্রয়োজন না হ'লে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় না।

১লা শ্রাবণ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ১৭।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। অনেকে আছেন। একটি নবদীক্ষিত দাদার সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলছেন।

Exploitation (শোষণ)-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের সাহায্য মানুষকে নিতেই হবে, আর সেটা তখনই exploitation (শোষণ) হয়, যখন service (সেবা) না দিয়ে নেওয়ার বুদ্ধি হয়। যে মুহূর্ত্তে আমি জন্মেছি সে মুহূর্ত্ত থেকেই তুমি আমার জন্য দায়ী। তুমি যে মুহূর্ত্তে জন্মেছ আমিও তখন থেকে তোমার জন্য দায়ী। পরস্পর এই দায়দায়িত্ব ও সেবা দেওয়া-নেওয়ার ভিতর মানুষ বাঁচে। মানুষ interdependent (পরস্পর নির্ভরশীল)। কারো সাহায্য ছাড়া কেউ বাঁচে না।

এই প্রসঙ্গে একটা বাণী পাঠ হ'ল।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়)—মানুষের জীবন effective (ক্ষমতাশালী) হয় কিসের ভিতর-দিয়ে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে যে-জীবন sublimated (উন্নীত) হয়, তাই-ই effective (ক্ষমতাশালী) হয়। সূর্য্যের কিরণ যে মানুষকে enliven করে (সজীব করে), সে যদি সূর্য্যে concentric (সুকেন্দ্রিক) না থাকতো তাহ'লে পারতো না। আবার, সূর্য্যের কিরণ আতস কাচে concentrate (কেন্দ্রীভূত) ক'রে আগুন ধরানো যায়।

জনার্দ্দনদা—মহৎ লোকের ছেলেরা তাদের মতো হয় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক সময় তাদের wife (স্ত্রী) তাদের reach করতে (পৌঁছতে) পারে না। Soil (মাটি) যদি ঠিক হয় তবে বীজ-অনুপাতিকই গাছ হবার কথা। সাধারণতঃ বাপের উপর টান যদি থাকে, বাপের জন্য করা যদি কিছু থাকে, দেওয়া যদি কিছু থাকে, তাহ'লে বাবার চরিত্রগত গুণগুলিকে ভালবাসার ভিতর-দিয়ে সন্তানের আয়ত্ত হয়। কারণ, টানের লক্ষ্য হ'ল সেবা। তা না হ'লে বাপের কাছ থেকে যদি শুধু পায়, তার জন্য কিছু করা না থাকে, তাতে ভালবাসা গজায় না। তার সদ্‌গুণ imbibe (গ্রহণ)ও করে কম। সাধারণতঃ যারা শুধু পায়, করে না, তাদের মমত্ব জাগে না। দেওয়ার ভিতর-দিয়ে মানুষ concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়। নিয়ে কিন্তু তা' হয় না। ওর ভিতর-দিয়েই তাদের ingrati-

tude (অকৃতজ্ঞতা) আসে। They become the first to deny (তারাই সর্ব্বপ্রথম অস্বীকার করে)।

জনার্দ্দনদা—দীক্ষা নিয়েছি, কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি প্রার্থনা করি বা demand (দাবী) করি, আমাদের বাঁচায়ে দেও। চল্লিশজন leader (নেতা) জোগাড় ক'রে দাও। যদি দেখি তেমন ধ'রে গেছে—তখন যদি নাও বাঁচি দুঃখ নেই—জানব তোমাদের মধ্যে বেঁচে থাকব। বাংলার মানুষের শরীর বেশী দিন টেকে না। আমার তো ষাট বৎসরের উপরে বয়স হ'য়ে গেলো—আর কতদিনই বা বাঁচবো, তবু আমার লোভ আছে আমার জাতটাকে, সমাজটাকে, জগৎটাকে তেমনতর দেখে যাব। তোমরা লাগ তো হয়।

জনার্দ্দনদা whole time work করা (সর্ব্বসময় কাজ করা) সম্বন্ধে বলছিলেন —সংসার কিভাবে চলবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার চালকই চালিয়ে নেন আমাকে। এ কাজ যদি করতে হয়, তাহ'লে সকলের সংসারের কথাই ভাবতে হবে। শুধু নিজের ঘরের কথা ভাবলে হবে না। বামুনের আয় love offer (ভালবাসার দান)—একটা চোরও প্রীত অন্তরে দেয়। লোভ আছে, আবার বামুনকে বামুন ক'রে তুলি, ক্ষত্রিয়কে ক্ষত্রিয় ক'রে তুলি, বৈশ্যকে বৈশ্য ক'রে তুলি, শূদ্রকে শূদ্র ক'রে তুলি, তাতে প্রত্যেকে চাইবে প্রত্যেকে বাঁচুক। প্রত্যেকে প্রত্যেকের interest (স্বার্থ) হ'য়ে উঠবে। জুতো যে তৈরী করবে সে হাঁড়ি বানাবে না। পরস্পরের পরস্পরকে দরকার। তাতে বেকার সমস্যা থাকে না। ঢাকাই মসলিন যারা করত, rustless steel (মরচেহীন ইস্পাত) যারা করেছিল, উজিরপুরের কামার যারা ছিল তাদের দক্ষতা তো অসম্ভব ব্যাপার।

জনার্দ্দনদা—একটা মুচির ছেলে, সে যদি প্রতিভাবান হয়, সে কেন মুচির কাজ করবে, ছোট হয়ে থাকবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার প্রতিভা দিয়ে সেবা করুক। কিন্তু জীবিকা ঐ। বৃত্তিহরণ মহাপাপ, ওতে unemployment (বেকারী) আসে। প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ হতে পার বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে। Education (শিক্ষা) হয় ভাল বৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়ে। জেলের ছেলেকে তার পরিচিত উপমার ভিতর-দিয়ে বোঝাও, সে সহজে সাড়া দেবে।

২রা শ্রাবণ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ১৮।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে বেলা দশটা নাগাদ একটি বাণী দিলেন।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী), লালমোহনদা (দাস), অনিলদা (সরকার), দেবেনদা (রায়চৌধুরী), সুধীরদা (সাহা) প্রমুখ আরও অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলেনদাকে 'ফিরে চল আপন ঘরে' গানটি উদাত্ত স্বরে গাইতে বললেন।

শৈলেনদা গাইলেন।

লালমোহনদা—ঠাকুর! আপনি সুস্থ থাকেন কিসে? আমরা আরও ভাল ক'রে কাজ করলে? তা তো করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরও কর।

লালমোহনদা—আপনার অসুস্থতার কথা শুনলে ভয় করে, মন খারাপ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' চাই সেটা কাজে কর।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার একটি বাণী দিলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে।

অনেকে আছেন।

নগেনদার (সেন) এক দাদা শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে আসলেন।

তিনি বললেন—আমি এত শুনি-মিলি, কিন্তু এতে আগ্রহ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুনিয়াদারী করতে-করতে এ ভাল লাগে না—যেমন পিত্তের রোগীর মিশ্রী ভাল লাগে না।

উক্ত দাদা—তা' কী করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খেতে হয়। প্রথমে ভাল লাগে না—পরে খেতে-খেতে ভাল লাগা জাগে। আবেগ জাগাতে হ'লে করতে হয়। না করলে আবেগ আসে না—না করতে-করতে আবেগ শ্লথ হ'য়ে গেছে। বহু আবেগ আছে—এ আবেগ হবে না কেন? করার ভিতর-দিয়েই জাগবে। পিপুলিয়া হরিদাসের কথা শুনেছেন তো—শেষটা চোখে পিপুল দিয়ে ভগবানের জন্য কাঁদত। ওর ভিতর-দিয়ে ভাবের আবির্ভাব হ'ল।

এই যেমন ভাত খান, শুধু দুধ খেয়ে থাকার রুচি হবে না। কিন্তু একবার যদি ঐভাবে অভ্যস্ত হন, তখন আবার দুধ ছেড়ে ভাত খেতে ইচ্ছে করবে না।

নগেনদা—ইষ্টভৃতি অন্তত আহার্য্যানুপাতিক করতে হয়, কিন্তু তা'তো পারে না সবাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' পারে তা' দিয়ে করলেই হয়, সামর্থ্যকে ফাঁকি না দিয়ে। তেমনক্ষেত্রে একটা ফুল দিয়ে করলেও হয়।

নগেনদা—নিজের আহার্য্যানুপাতিক না করলে তো insincerity (কপটতা) এসে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sincerity-র (আন্তরিকতার) বৃদ্ধি যত বাড়ে, মানুষ করেও তত, যোগ্যতাও বাড়ে। ধর্ম্মের ভানও ভাল। ইষ্টভৃতি আমরা করতাম বটে, কিন্তু এর ফলে যে কী হয় জানতাম না। কিন্তু জেম্‌সের কথার মধ্যে এ জাতীয় অনুষ্ঠানের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া গেল। আর, বাস্তবে তার অজস্র নজিরও আছে। ইষ্টভৃতি donation (দান) মতো দিতে হয় না, নিত্য নিবেদন করতে হয়। আগ্রহ থাকা চাই—তা দৈনন্দিন সমস্ত কাজগুলির মধ্যে অজানিতে অনুস্যূত হয়, আর সেগুলিকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করে। ওর ক্ষমতা যে কী, সেটা বিপদ-আপদের সময় বোঝা যায়। কত যে এর ঘটনা আছে, তার ইয়ত্তা নেই।

৩রা শ্রাবণ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ১৯।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী) বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ভিতর একটা জৈবী-সংস্থিতি আছে। যেমন কুকুর—গ্রে হাউণ্ড, এ্যালসেশিয়ান। বর্ণও তেমনি—grouping of the varieties of similar instincts (সমজাতীয় বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্যের বিভাগ), এর মধ্যে matching (মিলন) আছে। তাতে জৈবী-সংস্থিতি আরো সুষ্ঠু ও শক্তিমান হ'য়ে ওঠে। প্রত্যেক বর্ণেরই কর্ম্মশক্তি বিভিন্ন। কিন্তু পরস্পর-পরস্পরের পরিপূরক। গীতায় আছে 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ' (গুণকর্ম্মের বিভাগ অনুযায়ী চাতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে।) universal 'I'-এর (বিশ্বজনীন 'আমি'র) সৃষ্টির একটা ছন্দ আছে। রেডিওর যেমন বিভিন্ন wave (তরঙ্গ) আছে। কোন্ ছন্দে কোন্‌টা match (মিলন) করলে ভাল হয়, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য উৎকর্ষ লাভ করে দেখতে হয়। জনন-ব্যাপারে newer blood (নতুনতর রক্ত) ভাল না হ'লে জৈবী-সংস্থিতি nurtured (পরিপোষিত) হয় না, dwarf (খর্ব্ব) হ'য়ে যায়, intelligence (বুদ্ধি) ক'মে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), যতীনদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ আছেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষকে দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। আশ্রয় থেকেও যেন নিরাশ্রয়। বাড়ী-ঘর আছে, লোকজন আছে—কিন্তু সব থেকেও যেন কিছু নেই। কী করবে ঠিক পায় না। বোধ এতই ক্ষীণ যেন কোন সিদ্ধান্তই করতে পারে না।

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং। ২০। ৭। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার) প্রমুখের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম্ম সম্পর্কে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—যে-মুহূর্ত্তেই পূর্ব্বতনকে অস্বীকার করা হয়, সেই মুহূর্ত্তেই ধর্ম্মের প্রাণসত্তাতে অপঘাত হানা হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন এবং কয়েকটি বাণী দিলেন।

একটি উদ্বাস্তু দাদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানিয়েছেন যে, তিনি যে Camp-এ (শিবিরে) আছেন, তার থেকে ৩০০ মাইল দূরে তাকে remove করা (সরান) হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—কথাটা শোনামাত্র আমার বুকের মধ্যে যেন ঝমৃ করে উঠলো। আমাদের মতো এতখানি সম্পদ খুব কমেরই আছে—কিন্তু আমরা করলাম না কিছু। আমাদের মতো এমন মূঢ় আর কোথায় আছে? ওদের ক্ষুদ-কুড়ো যা ছিল কেড়ে নিয়েও যদি ওদের জন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারতাম তাও বলতে পারতাম—ভগবান! তোমার বাচ্চার জন্য একটা ব্যবস্থা যা'-হোক করেছি তো, তোমার নিদেশ আমরা অবহেলা করিনি। অনেকে করে কিন্তু পারে না, তার কারণ ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নয়। আমরা ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন দার্শনিক ভাব-বিলাসিতায়, কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতায় নয়। তাই কোন কাজকেই আমরা বাস্তবে রূপ দিতে পারি না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন।

৫ই শ্রাবণ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ২১। ৭। ১৯৫০)

কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের ওজঃসংস্থিতি অনুপাতিক mental flow (মানসিক প্রভাব) ক্রিয়াশীল থাকে। Chastity (পবিত্রতা) যদি থাকে, তাহ'লে তার বুকে একটা জোর থাকে। তার চলন-বলনে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী থাকে। ওর ব্যত্যয়ে সেটা নষ্ট হ'য়ে যায়। আগে যে ঝমৃ ক'রে উঠে পড়ত,

সে হয়ত কেঁকায়ে-কেঁকায়ে উঠে দাঁড়ায়। একদিনে তফাৎ হ'য়ে যায় ঢের। আগের দিন যে-মানুষ ছিল পরের দিন আর সে-মানুষ থাকে না। যে অন্যায়ে বৈশিষ্ট্যের ব্যত্যয় যত হয়, তাতে মানুষ তত দুর্ব্বল হয়। এক পেগ মদও যদি খেয়ে থাকেন তাও আপনাকে ততখানি দুর্ব্বল ক'রে দেয়।

কেষ্টদা—'সীমার মাঝে অসীম তুমি'—এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সীমার মধ্যে অসীম তুমি মানে, অসীম আর একজন কেউ নয়—সীমারই অসীম।

ইতিমধ্যে চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (পাণ্ডে), বীরেনদা (মিত্র), নিরাপদদা (পাণ্ডে), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), যোগেনদা (হালদার), গুরুদাসদা (ব্যানার্জ্জী), নীরদদা (মজুমদার), হেমদা (মুখার্জ্জী), কান্তিদা (বিশ্বাস) প্রমুখ এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রানাঘাটে লোক বসাতে একটু হিসাব ক'রে বসিও। চারবর্ণের সুষ্ঠু সমাবেশ যেন হয়। Nurturing inter-interested groups (পরিপোষণী পরস্পর স্বার্থান্বিত গুচ্ছ) থাকা চাই। সব হয়তো থাকল, কিন্তু বিপ্র থাকল না, তাতে ব্রাহ্মণের অদর্শনে পাতিত্য ঘটার মত অবস্থা হয়। বিভিন্ন বর্ণ পাশাপাশি থাকলে educated (শিক্ষিত) হবার scope (সুযোগ) পায়। একটা কৃষ্টির আবহাওয়া থাকা চাই। পারস্পরিকতা না থাকলে হয় না। একঢালা হ'লে কাজ হয় না। পারস্পরিকতা না থাকলে educated (শিক্ষিত) হবে না। প্রত্যেক বর্ণের কাছ থেকে পরস্পরের শিখবার আছে। ক-খ পড়লে কি শিক্ষা হয়? আচার-ব্যবহার, চাল-চলন—এই তো শিক্ষা। বই বাঁধতে কোথাকার পাতা কোথায় দেয়, তার ঠিক থাকে না, যদি কিনা বোধ না থাকে।

শুধু একবর্ণ এক জায়গায় সমাবেশ হলে ভাল হয় না। কেবলমাত্র বামুন দিয়ে একটা গ্রাম ভাল হয় না। দশ ঘর হয়তো কায়স্থ, দশ ঘর বৈশ্য, এবং অন্যান্য বর্ণ যথাযথভাবে সমাবেশ করা চাই। এমন ব্যবস্থা চাই যে আচারে, নিয়মে, চলায়, ফেরায়, সেবায় পরস্পর profitable (উপচয়ী) হ'তে পারে। দশ ঘর কায়স্থ, পাশে দশ ঘর বৈশ্য—তা' ভাল না। তবে ঐ গরিষ্ঠ সংখ্যার প্রভাবে এরা নিজত্ব হারাবার পথে চলে। ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে চ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন।

বীরভূমের কলোনীর একটি দাদা বলছিলেন—আমাদের ওখানে ধীরে-ধীরে দুটি দল হ'য়ে উঠছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশী দল হওয়া ভাল না। সব মানুষই দোষেগুণে থাকে—দোষটাকে বাদ দিয়ে গুণটাকে ধ'রে যত একগাট্টা থাকা যায় ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে, ততই ভাল।

৭ই শ্রাবণ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ২৩।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। আজ বেশ সুন্দর রোদ উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দের সঙ্গে হাসিখুশিভাবে নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন।

মুর্শিদাবাদের জনৈক ব্যবসায়ী দাদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্যবসায়ে উন্নতি করতে গেলে প্রধান জিনিস হ'লো সেবাবুদ্ধি। তুমি যদি কেবল নিজের লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে চল, তাতে কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারবে না। তোমার সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে মানুষের প্রয়োজন পরিপূরণ ক'রে তার ভিতর-দিয়ে তুমি লাভবান হ'তে পার। আর, আমি যে বলেছি 'মানুষ আপন, টাকা পর/যত পারিস মানুষ ধর'—ব্যবসায়ীদের এই জিনিসটা খুব রপ্ত করা দরকার। তোমার কাছে এসে মানুষ যদি আপনজনের মতো ব্যবহার পায়, তাহ'লে কিন্তু খরিদ্দাররা আপনার থেকে তোমার দোকানে ছুটে আসবে। মানুষ যদি মানুষ হয়, তাহ'লে তার কোনদিন পয়সার অভাব হয় না। আমি বলি—"দেখিবে কর্ত্তব্য যাহা জ্ঞানের আলোকে/সেই ধর্ম্ম সেই পুণ্য, চল লক্ষ্য করি সেই পথ।"

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—খুলনায় বিনোদ সাধুখাঁ ছিল। সে শুনেছি নাকি কেরোসিন তেল বিক্রী করত। তার ওখানে সবাই বোতল ও লণ্ঠন রেখে যেত। সে তার ছেলেকে দিয়ে যে-সব বোতলের দড়ি প'চে গেছে, সেগুলিতে ভাল পাটের দড়ি লাগিয়ে দিত, আর লণ্ঠনের চিমনী পরিষ্কার ক'রে পলতে ইত্যাদি ঠিক ক'রে রাখত। তাতে দিনের পর দিন খরিদ্দার বেড়ে যেত। সেবাবুদ্ধি যাদের থাকে, তারা বড় হয়ই। বিনোদ সাধুখাঁ তো পরে খুব নামকরা লোক হ'য়ে গেল।

এরপর হেমদা (মুখাৰ্জ্জী) ও রানাঘাটের অনাদিদা (সেন) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

অনাদিদার লিভার ভাল নয়। সেই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রোজ কুলেখাড়া খাওয়া ভাল। সিদ্ধ, ঝোল, বড়া, শুক্ত—যেভাবেই খাও তাতেই উপকার হয়। আমার মনে হয় করলার পাতা কিংবা থানকুনি পাতা দিয়ে শুক্ত খেলেও ভাল হয়। কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর সবগুলির সমাবেশ যদি প্রত্যেকটা আহারে

থাকে, তাহ'লে ভাল হয়। এটা অবশ্য সাধারণ সুস্থ লোকের পক্ষে। আর দৈ কিংবা ঘোল খাওয়া ভাল।

রানাঘাটে কলোনি করা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখন থেকে ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে সবকিছু ঠিকঠাক করা লাগে। ভাল ক'রে Plan (পরিকল্পনা) করতে হয়। মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, কর্ম্মকার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি নানাধরনের লোক আগে থেকে সংগ্রহ করা লাগে, যাতে দিনরাত কাজ চলতে পারে। খাবার সময় দুটো খেলো আর দিনরাত কাজ চলল—আমার এইরকম ভাল লাগে। যেমন পাবনার আশ্রমে হ'ত। কলোনির ভিতরকার জমি ছাড়া আলাদা হাজার দেড়েক বিঘা জমি আমার জন্য রেখে দেবে, যাতে সেখানে অনেকগুলি পরিবারকে স্থান দেওয়া যায়। এটা কলোনির যত কাছাকাছি হয়, তত ভাল।

আমার নিজের ৬০০ বিঘা জমি চাই। তার ভিতর থেকে ভাইদের কিছু দেব, আর বাদবাকি জমিতে scientific agriculture (বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি) করব। সব কাজের সঙ্গে উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করার কাজের দিকে নজর দেবে। এমন ক'রে তোলা চাই, যাতে লোকগুলি নিজেরাই কিছু ক'রে-কম্মে পেটের ভাত যোগাড় করতে পারে।

হেমদা—আপনার কাজ যেন ঠিকমত করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লেই হয়। ছেলেবেলায় পাড়াসুদ্ধ লোক আমার gurdian (অভিভাবক) ছিল। মারত-ধরত, যেমন খুশী ব্যবহার করত; কিন্তু আমি ভাবতাম দুনিয়ায় আমার বলতে কেউ না থাক, আমার মা তো আছে। মাকে খুশি করতে পারলেই হ'ল, আর চাই কী? আমি এমনভাবে চলব, যাতে সবাই মা'র কাছে আমার সুখ্যাতি করতে বাধ্য হয় এবং মা যেন তাতে খুশি হয়। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, মা'র খুশি, মার সন্তোষ। তাছাড়া আমি যখন যেটা ধরি, তখন তাতে এমন absorbed (নিমগ্ন) হ'য়ে যাই যে আমার প্রত্যেকটি foot-step-ই (পদক্ষেপই) সেই তালে চলতে লাগে। সমগ্র সত্তা যেন একমুখী হ'য়ে ওঠে। তাই জীবনে অকৃতকার্য্যতা কাকে বলে আমি তা' জানি না। যখন যা' ধরতাম সেইটেকেই সার্থকতায় সুন্দর ক'রে তুলতাম।

এরপর থেকে পরিস্থিতি বদলে যেতে লাগল। সবার কাছেই adored (পূজিত) হ'তে লাগলাম। তাই concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লে যে কী হয়, সেটা আমার জানা আছে। যে নিজে বড় হ'তে চায়, নিজের কের্দ্দানি দেখাতে চায় তার ভিতরটা কিন্তু transformed (পরিবর্ত্তিত) হয় না। শ্রেয়স্বার্থী হওয়াটাই, উৎসমুখী হওয়াটাই মানুষের জীবনকে গ'ড়ে তোলে।

মানুষের ধৃতিতেই গোল থাকে, যার দরুন তারা self-centric (আত্মকেন্দ্রিক) হ'য়ে চলে। আমরা ভগবানকে utilise করি (কাজে লাগাই) নিজেদের জন্য, তাঁর জন্য নিজেকে utilise করতে পারি না (কাজে লাগাতে পারি না)। তাঁর স্বার্থকে নিজের স্বার্থ ব'লে নিতে পারি না। তাই আমরা যতই ধর্ম্মপথে চলার কায়দা-করণ করি না কেন, আমরা কিন্তু ধর্ম্মজগতে ঢুকতে পারি না। নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ঘুরপাক খাই। তুমি হয়তো পাঁচটা টাকার জন্য অনাদির পিছনে-পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তার সঙ্গে ব'সে-ব'সে গল্প করছ। এতে তোমারও লাভ নেই, অনাদিরও লাভ নেই। চাই তাঁতে unrepelling adherence (অচ্যুতনিষ্ঠা)। এতে মানুষ স-পরিবেশ উর্দ্ধমুখী হ'য়ে জেগে ওঠে। কয়েকটা লোক যদি তেমন হয়, তারাই পারে সবকিছু করতে।

কালো (জোয়ার্দ্দার) গুরুতর অসুস্থ হ'য়ে ৬৮নং মির্জ্জাপুর স্ট্রীটে আশুদার কাছে আছে জেনে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—আশুর কাছে চিঠি লিখে দে যাতে অতিসত্বর অন্যত্র কোনও উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরিত ক'রে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে। ওখানে থাকলে ওরও অসুবিধা হ'তে পারে এবং অন্যের মধ্যেও রোগ-সংক্রমণ হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর একটি বাণী দিলেন।

৮ই শ্রাবণ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ২৪।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় ব'সে আছেন। ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী) প্রণাম করতে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভূষণ! কুড়িটা টাকা দিতে পারিস?

ভূষণদা—হ্যাঁ, একটু পরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখিস! কাউকে মেরে দিস্ না। নিজেকেও মেরে নয়।

একটু বাদে শৈলেশদা (ব্যানার্জ্জী) প্রণাম ক'রে বসলেন। তিনি কথায়-কথায় বললেন—কেমনভাবে চললে ইষ্টের প্রতি অনুরাগ সহজভাবে জাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা যেমন সন্তানের জন্য করে, সন্তানেরই স্বার্থপ্রতিষ্ঠা নিজেরই স্বার্থপ্রতিষ্ঠা ক'রে নেয় এবং এই ব্যাপারে কোন দুঃখকষ্টকে দুঃখকষ্ট ব'লে মনে করে না, ঠিক এমনতর মনোভাব নিয়ে বাস্তবে করা-বলা-ভাবা নিয়মিতভাবে চালান লাগে। তার মানে আমার প্রত্যেকটা করা, প্রত্যেকটা ভাবা, প্রত্যেকটা বলা যেন ইষ্টের প্রীতি ও স্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্যই হয়। এইভাবে যদি কেউ চলতে শুরু করে—সক্রিয় পরিক্রমায়—তাহ'লে তার টান গজাবেই। ক্রাইস্ট বলেছেন—Take-up the cross

and follow me (ক্রুশটা হাতে তুলে নাও এবং আমাকে অনুসরণ কর)। Cross (ক্রুশ) কথার মানে আমি এই বুঝি যে, আমার complex (প্রবৃত্তি) যখন ইষ্টের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ায় এবং আমার will (ইচ্ছা) যখন তার প্রতিবন্ধকস্বরূপ সেই প্রবৃত্তিকে ভেদ ক'রে ঠেলে ওঠে, এই অবস্থাই হ'চ্ছে ক্রুশ। বেপরোয়া হ'য়ে এমনতর চলা লাগে।

ইষ্টার্থপূরণের পথে যখনই যে প্রবৃত্তিই বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়, সেই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেন-তেন-প্রকারেণ ইষ্টের ইচ্ছা পূরণ করাই হ'লো জীবনের তপস্যা। এই সংগ্রামই ক্রুশ। কিছুতেই কোন দুর্বলতাকে আমল দিতে নেই। মানুষের ইষ্টার্থী ইচ্ছাশক্তি যখন প্রতিটি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত হ'য়ে চলে, তখন তার সঙ্গে পারার জো নেই। এই সম্বেগ বাড়ানোর জন্যই বিধিবদ্ধভাবে যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি ক'রে চলা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকাল ন'টা পাঁচ মিনিটের সময় নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

প্রেষ্ঠচাহিদা-পরিপূরণে যারা দেয়—
আগ্রহ-উদ্দীপনায়,
তখন তারা শূন্য হ'লেও
অপর্যাপ্তই পায় তদনুপাতে,
বিবেচনা-বিধুর অন্তরে
ঐ আগ্রহকে যতই যারা সংযত করে,
ক্রমশঃ বঞ্চিতও হ'তে থাকে তারা তেমনি।'

প্রফুল্ল—অপর্যাপ্ত পাবার আশায় যদি কেউ দেয়, তাহ'লে কি সে পাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ প্রত্যাশাই তো তার পাওয়ার পথ রুদ্ধ ক'রে দেবে। পেয়ে ধন হারানোর মতো হবে।

কথামালার কাঠুরিয়ার গল্প শোননি?—এক কাঠুরিয়া জলাশয়ের পাশে একটা গাছ কাটছিল। তখন তার হাত ফ'সকে তার কুড়োলটা জলে প'ড়ে যায়। তখন সে হাতজোড় ক'রে জলদেবতাকে ডাকতে লাগল,—'হে জলদেবতা, তুমি আমার কুড়োলখানা আমাকে ফিরিয়ে দাও। তুমি দয়া না করলে এত গভীর জল থেকে আমি কুড়োল উদ্ধার করতে পারব না। আর, কুড়োল না থাকলে আমার কাচ্চা-বাচ্চাসহ উপোস ক'রে মরতে হবে।' তখন জলদেবতা একটা সোনার কুড়োল হাতে ক'রে জল থেকে উঠে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এই কুড়োল কি তোমার?' কাঠুরিয়া তখন বলল 'এ কুড়োল আমার নয়'। একটু পরে জলদেবতা একখানি রুপোর কুড়োল হাতে ক'রে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এই কুড়োল কি তোমার?'

কাঠুরিয়া এবারও বলল—'না'। এরপর জলদেবতা কাঠুরিয়ার নিজস্ব কুড়োল এবং ঐ সোনার ও রুপোর কুড়োল জল থেকে তুলে নিয়ে এসে তার নিজস্ব কুড়োলটা দেখিয়ে বললেন—'এই কুড়োল কি তোমার?' কাঠুরিয়া খুশী হ'য়ে বলল—'হ্যাঁ! এই কুড়োলই আমার।' তখন জলদেবতা খুশী হ'য়ে তাকে তিনখানি কুড়োলই দিয়ে দিলেন। সততা ও নির্লোভতার জন্যই কিন্তু সে এইভাবে পুরস্কৃত হ'লো।

তাই দেখে আর একজন কাঠুরিয়া কাঠ কাটতে-কাটতে ইচ্ছা ক'রে তার কুড়োলটা জলে ফেলে দিল। পরে সে জলদেবতাকে ডাকতে লাগল। জলদেবতা একখানি সোনার কুড়োল হাতে ক'রে জল থেকে উঠে এসে বললেন—'এই কুড়োল কি তোমার?' সে লোভ সামলাতে না পেরে বলল—'হ্যাঁ! এই কুড়োল আমার।' তখন জলদেবতা ঐ কুড়োলসহ অন্তর্ধান করলেন। আর উঠলেন না। সোনার কুড়োলের উপর লোভ করতে যেয়ে সে নিজের কুড়োলও হারাল।

তাই বলি, লোভপরবশ হ'য়ে ইষ্টকে কিছু দেওয়ার বুদ্ধি ভাল না। ওতে ইষ্টের প্রতি টানও বাড়ে না এবং মানুষের প্রাপ্তিও উচ্ছল হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বারান্দায় দক্ষিণমুখী হ'য়ে বসলেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী) তামাক, জল প্রভৃতি দিচ্ছিলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), নরেনদা (মিত্র), তারকদা (ব্যানার্জ্জী), হরিপদদা (মুখার্জ্জী), প্রফুল্ল প্রমুখের সঙ্গে গল্পচ্ছলে বললেন—আমার ইচ্ছা ছিল, আপনারা উদ্দেশ্যসাধনে successful (কৃতকার্য্য) হ'লে স্পেশাল ট্রেনে ক'রে সারাভারত ঘুরব।

৯ই শ্রাবণ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ২৫।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ, দুবেজী, প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—একটা শহরের সবগুলি বাড়ী, সবগুলি রাস্তা, সবগুলি গাছপালা যদি একরকম হয়, তাতে ক্রমাগত ঐ পরিবেশের মধ্যে থাকতে-থাকতে কিছুদিন বাদে মানুষগুলিও কিছুটা dull (নিরেট) হ'য়ে ওঠে। বৈচিত্র্যের সঙ্গে সংঘাত ও সংস্পর্শ যত বেশী হয়, তত মানুষের মাথা খোলে। আবার, নানাধরনের লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। যার চিন্তাধারা তোমার চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত, তার সঙ্গেও যদি তুমি মিলেমিশে হৃদ্য ব্যবহারে আপন ক'রে তুলতে পার—নিজের আদর্শে অটুট থেকে—তাহ'লে কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তি এবং লোকপরিচালনক্ষমতা ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পাবে।

প্রফুল্ল—কোন নূতন জায়গায় যাজন করতে গেলে কিভাবে কথাবার্ত্তা শুরু করা ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়াতেই যদি সৎসঙ্গ ও ঠাকুরের কথা বল, তাহ'লে সেটা হবে তোমার পক্ষে বোকামি। মানুষের বাস্তব স্বার্থের প্রসঙ্গ থেকে শুরু ক'রে এমনভাবে আলোচনা করতে হয়, যাতে তারা নিজের থেকেই তোমার ইষ্ট বা আদর্শ সম্বন্ধে আগ্রহশীল হ'য়ে ওঠে। বিজ্ঞান-মনোবিজ্ঞান, ঘর-সংসার, মানুষের ছেলেপেলে, বাজার-হাট, খাওয়া-দাওয়া—যে বিষয়েই কথা শুরু কর না কেন,—কথার adjustment (বিন্যাস) এমন হওয়া চাই, এমন দরদী রকমে কথা বলা চাই, যাতে মানুষ বোঝে যে তোমার মতন আপনজন তার আর পৃথিবীতে কেউ নেই। তোমার সঙ্গই যেন সে ছাড়তে না চায়। তোমার সম্বন্ধে আগ্রহ-বিধুর হ'য়ে ওঠে। এমন ক'রে মানুষের প্রাণে হাত দিয়ে যদি কথা বলতে পার, আমার স্বার্থে স্বার্থান্বিত, আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, এমনতর মানুষ তো দেখি না। তখন সে তোমার সম্বন্ধে আগ্রহশীল না হ'য়েই পারবে না। সেই সময় ফাঁক বুঝে, তার স্বার্থ সম্পূরণের দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে যা' বলা লাগে তাই বলতে হয়।

তুমি যতই স্থূল বাস্তবে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপরায়ণ হবে, ততই তোমার কথা বেরুবে, dealing (ব্যবহার) বেরুবে, চাউনি বেরুবে কায়দামতন।

আমি কখনও কারও সঙ্গে গোড়ায় ধর্ম্মকথা, নীতি-কথা বা দার্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কথা পাড়তাম না। আমি হয়তো পট ক'রে গান ধরলাম—'সে কেন চুরি ক'রে চায়।' মানুষ ভাবত—এ কি! এ দেখি পীরিতের গান! কিন্তু ওর ভিতর দিয়েই মানুষ ম'জে উঠতো।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পরপর চারটি বাণী দিলেন।

শেষে কথায়-কথায় বললেন—চাণক্য ও বুদ্ধদেবের সমাবেশ হ'য়ে যদি কেউ আজ আসে, তাহ'লে সে এইযুগে successful (কৃতকার্য্য) হ'তে পারে।

১০ই শ্রাবণ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ২৬।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), গোঁসাইদা, প্রফুল্ল, সরোজিনীমা প্রমুখ উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যে-কোন মৃতের প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। একজন খৃষ্টান যদি মারা যায় এবং তার শবানুগমনে যদি লোকের অভাব হয়, তাহ'লে হিন্দু-মুসলমান, যে কোন সম্প্রদায়েরই লোক থাকুক না কেন, তাদের ঐ মৃতের সৎকারে অনুগমন করা

ভাল। অবশ্য খৃষ্টানদের সংস্কার উল্লংঘন না ক'রে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির ব্যাপারে প্রত্যেকেরই যথা করণীয় করা উচিত।

কেষ্টদা—অন্য সম্প্রদায়ের কেউ যদি রোগগ্রস্ত হয় তাহ'লে সেখানেও তো আমাদের করণীয় আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বিপন্ন বা পীড়িতের কোন জাতি নেই। যে-কোন মানুষ অসুস্থ হলেই আমরা নিজের জনের জন্য যেমন করি, সেখানেও আমাদের তেমনি করা উচিত। আমি তো বলি সব প্রাণ এক। একটা পশু বা গাছপালা অসুস্থ হ'লে আমাদের সুস্থ ক'রে তুলতে চেষ্টা করা উচিত।

সুশীলদা কথায়-কথায় বললেন—এমন কোন-কোন মানুষ দেখা যায়, যে হয়তো খুব গরীব অবস্থা থেকে দশজনের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে বড় হয়েছে। কিন্তু বড় হওয়ার পর ঐ-সব সাহায্যকারীদের কৃতজ্ঞতা আর স্বীকার করে না। লোকের কাছে ব'লে বাহাদুরী নেয় যে, সে নিজের চেষ্টায়ই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মানে অকৃতজ্ঞতা, যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না, সে প্রকারান্তরে উৎসকেই অবজ্ঞা করে। তার মানে, ঈশ্বরকেও সে প্রকারান্তরে অস্বীকার করে। কৃতঘ্নতার মত অত বড় পাপ আর নেই। তার উন্নতিও বেশীদিন স্থায়ী হ'তে পারে না। অনেক গরীব বাপ-মার ছেলে বড় হ'য়ে তার বাপ-মার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভুলে যায়। তার মানে সে ধপাস ক'রে পড়ল ব'লে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ, গোঁসাইদা, প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

পরশুরামদা ব'লে এক পাঞ্জাবী ভাই এলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে একখানা গান গাইতে বললেন। পরশুরামদা সুরদাসের একখানা ভজন গাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—সুরদাস কতদিন আগেকার মানুষ ?

পরশুরামদা—তিন-চারশ' বছর আগেকার মানুষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সবার দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখেন। কবীর, দাদু, সুরদাস প্রমুখ কতদিন আগেকার, কিন্তু ভাষাটা যেন কত নূতন।

কিছুসময় চুপচাপ থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বিষন্নভাবে বললেন—মা চ'লে যাবার পর থেকে আমার যেন একটানা বিরহের পালা চলছে। সবই করি, করতে হয়, তাই করি। কোনটায় যেন রস পাই না। আগে মাকে খুশী করার ধান্দা মনটাকে যেন সবসময় চনমনে ক'রে রাখত।

১১ই শ্রাবণ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২৭।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বড় তাকিয়ায় হেলান দিয়ে দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসলেন। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। যতিবৃন্দ, সুশীলদা (বসু), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

প্রফুল্ল—আপনি personated decision (ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সিদ্ধান্ত)-এর কথা বলেন, সে জিনিসটা কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, তুমি আমাকে ভালবাস, এবং আমার কোন গুরুদায়িত্ব পালন করতে চাও। এই চাওয়াটা এবং সিদ্ধান্ত যদি আন্তরিক হয়, তাহ'লে তা' তোমার মধ্যে ব্যক্তিত্ব লাভ করবে জীয়ন্ত জীবন নিয়ে। তোমার কাছে তোমার কর্ম্ম-পদ্ধতি একটা পূর্ণাঙ্গ ছবির মতো রূপ নিয়ে ভেসে উঠবে। এটা হয় কিন্তু ধ্যানের ভিতর-দিয়ে। কিভাবে কী করতে হবে, তার জন্য কী প্রয়োজন, কোন্-কোন্ মানুষের সাহায্য তোমার প্রয়োজন হ'তে পারে এবং সেই সাহায্য লাভ করতে গেলে তাদের কাছে কেমনভাবে অগ্রসর হ'তে হবে, কোন্-কোন্ জিনিস তোমার যোগাড় করতে হবে এবং তা' কোথায় কিভাবে পাওয়া যাবে, কাজের পথে তোমার কী-কী অন্তরায় উপস্থিত হ'তে পারে এবং সে অন্তরায়ের নিরাকরণই বা কিভাবে করবে, অর্থাদি যা' লাগবে তা' কিভাবে সংগ্রহ করবে ইত্যাদি সম্বন্ধে তোমার মাথায় যদি একটা সুসঙ্গত, সুসম্পূর্ণ ছক এঁটে না ফেলতে পার, তাহ'লে এলোমেলো পদক্ষেপে চ'লে কাজে কৃতকার্য্য হওয়া তোমার পক্ষে কঠিনই হ'য়ে উঠবে। করা, চলা, বলা, ভাবা—সবগুলির মধ্যে একতানতা থাকা চাই। Personated decision (ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সিদ্ধান্ত) মানে এমনতর, এতখানি। তখন মানুষের চেহারাই অন্যরূপ ধরে। তাকে দেখলেই মনে হয় সে যেন একজন ব্রতধারী। মোটপর, পুরো সত্তাটা একমুখী ক'রে তুলতে হয়। শরীর, মন ও বাক্য এক খাতে প্রবাহিত হবে।

সুশীলদা—এই জিনিসের অভাবেই কি আমরা অকৃতকার্য্য হই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রধান জিনিস হ'চ্ছে interest (অনুরাগ)। তা' থাকলে আর সব-কিছু এসে পড়ে। আপনি কত অসম্ভব সম্ভব করেছেন। সে কিন্তু ঐ টানের দরুন। আমাদের কর্ম্মীদের সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে, এমন একটা সময় হয়তো আসবে, যখন তারা ঠিকভাবে না চ'লে ও না ক'রে পারবে না। সে অবস্থায় লহমায় এরা সবাই হয়তো উদগ্র হ'য়ে উঠবে। তাই, আমার আশা কখনও যায় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি বাণী দিলেন।

বিকেলেও শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। সুশীলদা (বসু), যতীনদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ উপস্থিত।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরলোক ও ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে মানুষ বিবর্ত্তনের পথে বেশীদূর এগুতে পারে না। বিশ্বাস ও ভালবাসা থাকলে অনায়ত্তকে আয়ত্ত করার একটা প্রচণ্ড আবেগ জন্মায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিলেন। তারপর সুশীলদা জিজ্ঞাসা করলেন—দুনিয়া কি বিবর্দ্ধনের পথে চলছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উৎসে আকর্ষণের মতো বিকর্ষণও আছে ব'লে মানুষ অনেক সময় নেমেও যায়। ব্যক্তি বা জাতি অধোগতির দিকে গেলেও বিবর্দ্ধনের আকূতি কারও খতম হ'য়ে যায় না, ওটা সুপ্ত থাকেই। মানুষ যতই concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়, ততই becoming (বৃদ্ধি)-এর পথে চলে।

সুশীলদা—দুনিয়ায় কি সুকেন্দ্রিকতা বাড়ছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়ায় একটা দোষ করেছে। আমাদের দেশে material (বস্তুতান্ত্রিক) ও spiritual (আধ্যাত্মিক)—জীবনের এই দুটো aspect (দিক)-কে আলাদা ক'রে ফেলেছে—যেন এদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। তার ফলে মানুষ কখনও-কখনও materially (বস্তুতান্ত্রিকভাবে) rich (সমৃদ্ধ) হ'তে গিয়ে spiritually (আধ্যাত্মিকভাবে) weak (দুর্ব্বল) হ'চ্ছে, আবার কখনও-কখনও spiritually rich (আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ) হ'তে গিয়ে materially affected (বস্তুতান্ত্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত) হ'চ্ছে, complete evolution (সামগ্রিকভাবে বিবর্ত্তন) হ'চ্ছে না। কিন্তু যতই materially advancement (জাগতিক উন্নতি) spiritual advancement-এ (আধ্যাত্মিক উন্নতিতে) সার্থক হ'য়ে উঠতে থাকে, ততই একটা integrated evolution (সংহত বিবর্ত্তন) হয়। দুনিয়ায় বহু species (প্রজাতি) যে extinct (নিশ্চিহ্ন) হ'য়ে গেছে, তার কারণ তারা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেনি। এটার পিছনেও আমার মনে হয় মূল কারণ সুকেন্দ্রিকতার অভাব।

প্রফুল্ল—মনুষ্যেতর জীবের পক্ষে সুকেন্দ্রিকতার কথা আসে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেক জীবের মধ্যে সুকেন্দ্রিকতা থাকে তার মতো ক'রে। কুকুর, বিড়াল, গরু ইত্যাদি বহু গৃহপালিত জীবের মধ্যে সুকেন্দ্রিকতা তো স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। আবার, এমন কোন জীব নেই যারা পিতা-মাতাকে আশ্রয় ক'রে না জন্মায়। পশুর বেলায় সবসময় হয়তো পৈতৃক সূত্র জানা যায় না। কিন্তু মায়ের পেটেই জন্মাতে হয় পশুগুলিকে। মায়ের প্রতি টান, সমজাতীয় অন্যান্যদের প্রতি ভালবাসা ও সহযোগিতার ভাব যাদের থাকে, আমার মনে হয়, তাদের মধ্যে কতকগুলি সদ্‌গুণের বিকাশ হয়ই এবং সেইগুলিই তাদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আরও অনেকগুলি বাণী দিলেন।

১২ই শ্রাবণ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ২৮।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা ১০টার পর বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

'বিধিকে যতই তাচ্ছিল্য ক'রে চলবে,
যোগ্যতা অবসন্ন হ'য়ে উঠবে ততই,
আর, ঐ পথেই বিধাতার অভিশাপ
নেমে আসবে ক্রমশঃই।'

প্রফুল্ল—বিধিকে তাচ্ছিল্য করা বলতে কী বুঝব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটা কাজে কৃতকার্য্য হ'তে গেলে তার একটা বিধি আছে। সেই বিধি-অনুযায়ী তা' করা চাই। আবার, তোমার নিজের দিক থেকে ঐ কাজ বিধিমাফিক করতে গেলে শরীর-মনের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, বিবেচনা, লোকের সঙ্গে সঙ্গতি ইত্যাদি ঠিক রাখা চাই। যে করবে অর্থাৎ কর্ত্তা, তার একটা নিজস্ব প্রস্তুতি চাই। আবার, যে-কর্ম্ম যে-যে ভাবে করতে হয়, সেই-সেই ভাবেই করতে হবে। তাছাড়া তুমি যে-কর্ম্ম করছ, সে-কর্ম্মের ফল, তোমাকে ও পরিবেশকে কিভাবে প্রভাবিত করে, তাও ভেবে দেখতে হবে। আমি ইষ্টানুরাগের কথা বলি, তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার যদি ইষ্টানুরাগ থাকে, তাহ'লে আমি এমন কাজ করতে পারি না, যাতে আমার ও পরিবেশের ক্ষতি হয় এবং ইষ্টের মনে ব্যথা লাগে। বিধির মধ্যে এই সবগুলি দিকই এসে পড়ে। কোন একটা দিক শুধু বিচ্ছিন্নভাবে ভাবলে চলে না। সংশ্লিষ্ট সবকিছু একযোগে সমগ্রভাবে ভাবতে হয়।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ৩০।৭।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। রাজেনদা (মজুমদার), স্পেন্সারদা, অমূল্যভাই (সেন), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গতঃ বললেন—আমি হয়তো এমন অনেক কাজের কথা তোমাদের বলতে পারি, যে-সম্বন্ধে তোমাদের তেমন কোন অভিজ্ঞতা নেই। অথচ তোমাদের ইচ্ছা আছে যে আমার কাজে সাধ্যমত সাহায্য করবে। সেখানে সেই কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামান্য কিছু ক'রে বাদবাকী সম্বন্ধে তোমরা যদি উদাসীন থাক, তাহ'লে কিন্তু তোমাদের অভিজ্ঞতা বা আমার প্রতি টান বিশেষ কিছু বৃদ্ধি পাবে না।

শৈলেনদা—আপনি হয়তো কারখানা করার কথা বললেন, আমি হয়তো তার জন্য জমি কিনে দিলাম, শুধু এইটুকু যদি করি, তাহ'লে কি তাতে কোন ফল হবে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছুই যে ফল হবে না, তা' নয়, কিন্তু ঐ কারখানার কথাটা যদি তোমাকে পেয়ে না বসে, তাহ'লে কিন্তু তোমার যথোপযুক্ত বিবর্ত্তন বা অভিজ্ঞতা হবে না। তোমার হয়তো জমি কিনে দেওয়ার সামর্থ্য আছে, তা' সহজে ক'রে দিলে। কিন্তু কারখানা করার ব্যাপারটা যতখানি জটিল, সে-সম্বন্ধে তোমার হয়তো কোন অভিজ্ঞতা নেই। তবু আমার খুশীর দিকে চেয়ে সে-ব্যাপারে যদি তুমি চিন্তা না কর, সে-কথাটা যদি তোমার মাথায় লেগে না থাকে এবং materialising effort (বাস্তবায়নী চেষ্টা) প্রয়োগ না কর সেদিকে, তাহ'লে ওদিক দিয়ে তোমার যতখানি বিবর্ত্তন হবার সম্ভাবনা ছিল, তা' কিন্তু হ'লো না।

তুমি হয়তো যাজনকাজ ভাল পার, আমার ঐ কারখানার ব্যাপারে কিছু না ক'রে, তুমি তোমার পছন্দমত যাজনকাজে যদি মেতে থাক, তাহ'লে তুমি কিন্তু তোমার complex-এর channel-এ (প্রবৃত্তির প্রবাহে) অনেকখানি আবদ্ধ হ'য়ে থাকলে। এও মন্দের ভাল। এও একটা stepping stone (ধাপ) হ'তে পারে towards concentric life (সুকেন্দ্রিক জীবনের দিকে)। কিন্তু আমার নির্দ্দেশ যদি পালন করতে—সবরকম দুঃখ-কষ্ট এবং অসুবিধাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে, তাহ'লে তোমার প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণের পথে এবং যোগ্যতাবৃদ্ধির দিক দিয়ে যে-কাজ হ'তো, তা' কিন্তু হবে না।

তবে একথা স্পষ্ট ক'রে বলছি, যাই কর, তা' যদি আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কর, তাহ'লে কিছু হবে না। সেখানে কিন্তু self (অহং)-ই তোমার pivot (কীলক)। যাকে যেটা বলা হয়, সেইটের ঝুন যদি তার মাথায় লেগে থাকে, সে যদি সেইটাই বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে চেষ্টা করে—ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে,—তাহ'লেই সর্ব্বাংশে ভাল হয়। স্পেন্সারকে যেমন Ligate পত্রিকা করার কথা বলেছি—ও যেমন আপ্রাণ হ'য়ে লেগেছে, এইভাবে লেগে যদি থাকে, তাহ'লে একদিন হয়তো একটা বিরাট কিছু হবে। তোমাকে যেমন বক্তৃতা শেখার কথা বলেছি, ঐটে নিয়ে তুমি যদি চেষ্টা কর, তাহ'লে একদিন হয়তো তোমার বলাগুলি চুম্বকের মত মানুষকে আকর্ষণ করবে। যেখানেই যাবে তুমি, মানুষ তোমার কথা শুনবার জন্য তোমার পিছু-পিছু ছুটবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে একটা বাণী দিলেন।

১৭ই শ্রাবণ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ২। ৮। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—পিতৃপুরুষের সাজ-সজ্জা ও সংস্কৃতিকে অবহেলা করা ঠিক নয়। কিন্তু যে-দেশে যখন যে-কাজের জন্য যেমনতর পোষাক-পরিচ্ছদ ও ভাবভঙ্গি প্রয়োজন, তা' কিন্তু করাই লাগে। ফলকথা, নিজেদের সাংস্কৃতিক আচার ঠিক রেখে দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী, যখন যেমন প্রয়োজন, তখন তেমন করা লাগে। তুমি হয়তো কোন শীতপ্রধান জায়গায় গেছ, সেখানে যদি হালকা পোষাক-পরিচ্ছদ পরে থাকতে চাও, তাহ'লে হয়তো অসুস্থ হ'য়ে পড়তে পার।

প্রফুল্ল—আমাদের দেশে হিন্দুসমাজে যে কৌলিন্য প্রথার উপর খুব জোর দেওয়া হয়, তার কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, মানুষ যাতে জন্মগতভাবে শুভসংস্কার লাভ করতে পারে, তার জন্যই এটার প্রয়োজন। সমাজের বিবর্ত্তনের জন্য প্রয়োজন মহত্তর গুণ ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ। কুলীনদের মধ্যে এইসব উচ্চতর গুণ ও যোগ্যতার বিকাশের দিকে ঝোঁক দেওয়া হ'তো বেশী ক'রে। বাহ্যিক ঐশ্বর্য্যের উপর তারা গুরুত্ব দিত কম। তারা চরিত্রের সম্পদ ও প্রজ্ঞার ঐশ্বর্য্যকেই কামনা করত মনপ্রাণ দিয়ে। এতে কিন্তু জীবন-চলনার জন্য যা' প্রয়োজন, তারও অভাব হ'তো না। যারা প্রবৃত্তি-অভিভূত হীনম্মন্য অহং দ্বারা পরিচালিত হয়, তারাই ধন-দৌলত, জুড়ি-গাড়ী ইত্যাদিকে ঐশ্বর্য্য ব'লে মনে করে এবং তা' বাদ দিয়ে নিজেদের নিঃস্ব ব'লে ভাবে। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথাই হ'লো, চারিত্রিক উৎকর্ষ-সাধন। আবার, চারিত্রিক উন্নতি যদি কারও হয়, বৈষয়িক উন্নতিও তার অল্প-বিস্তর হ'তে বাধ্য। তবে যাদের মনে সন্তোষ থাকে, তারা বাহ্যিক ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির দিকে বেশী নজর দেয় না।

১৮ই শ্রাবণ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ৩। ৮। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসেছেন। যতীনদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাদের মধ্যে দেওয়ার প্রবৃত্তি প্রবল, অবশ্য সততাকে বজায় রেখে, তাদের কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্য ভুগতে হয় কমই।

প্রফুল্ল—সততাকে বজায় রাখার কথা কেন বলছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, তোমার কাছে একজন কিছু টাকা গচ্ছিত রেখেছে। কোন লোক তোমার কাছে এসে চাইল, তুমি যদি সেই টাকা থেকে অপরের চাহিদা পূরণ কর, তাহ'লে কিন্তু ধীরে-ধীরে অবিশ্বাসী হ'য়ে পড়বে। আবার, এমনভাবে দান করা উচিত নয় যাতে তোমার অস্তিত্ব বিপন্ন হ'য়ে পড়ে। অনেকে নাম কেনার জন্য বদান্যতা দেখাতে যায়। তারা কিন্তু পরে বেকায়দায় প'ড়ে যায়।

আশ্রমের জনৈক ভাই ৫/৭ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা ক'রে প্রত্যহ দেড় টাকা, দুই টাকা আয় করে, সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি দিলে কিন্তু আর পারত না। সেইজন্য অনেকে যখন আমার কাছে এসে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করে, নাছোড়বান্দা হ'য়ে চায়, তখনও আমি দিতে চাই না—সে কিন্তু আমার নিজের কথা ভেবে নয়, তার কথা ভেবে, তার মঙ্গলের দিকে চেয়ে।

যতীনদা—নিলে অমন হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি আমাকে দেওয়ার বুদ্ধি থাকে—একটু ফল, জল, শাক-পাতা-লতা, যাই হোক,—ওর ভিতর দিয়ে যে effort (চেষ্টা) হয়, তাতে concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে ওঠে। তার ভিতর দিয়ে efficiency (দক্ষতা) বাড়ে। তা না ক'রে নেওয়ার বুদ্ধি হ'লে মাথা dull (নিরেট) হ'য়ে যায়, tension (টান)-ই নষ্ট হ'য়ে যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিলেন।

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ৪।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে। প্রফুল্ল এসে প্রণাম ক'রে বসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাড়াতাড়ি খাতা-কলম বের কর্। একটা কথা মনে আসছে, তাড়াতাড়ি লিখে ফেল্।

প্রফুল্ল খাতা-কলম বের করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বলা সুরু করলেন—

আরে! মনে যাই আসুক না
আর তা' যেমনই হোক,

লোকহিতী যা' তাই বল,
করও তাই অচ্যুত ইষ্টানুগ থেকে—
তেমনি তীব্র সম্বেগে;

অন্তরের কুৎসিত যা'—
এ-রকমের ভিতর-দিয়েই নিকেশ পেয়ে যাবে;

ঈশ্বর ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন,
ভাব কথার সৃষ্টি 'ভূ' হ'তে,
আর, ভূ মানে হওয়া ;
তিনি চান মানুষের বিবর্দ্ধন—
বাক্য ও কর্ম্মে যেমনতর যা' করবে,
তুমি তেমনতর হ'য়ে উঠবে,
আগে এই হওয়াটাকে তিনি গ্রহণ করেন,
শুধু চিন্তাকে নয়,
আর, এমনি ক'রেই তিনি
জন-অন্তরের আসুরিক যা'-কিছুকে,
কুৎসিত যা'-কিছুকে মর্দ্দিত ক'রে
নন্দনায় বর্দ্ধিত করতে চান,
তাই তিনি জনার্দ্দন। (৭-২০ মিঃ)

এই প্রসঙ্গে পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের অন্তরে খারাপ যা' কিছুই আসুক না কেন, সে যদি করায় ও বলায় তা' উপেক্ষা ক'রে চলে এবং কল্যাণকর যা'-কিছুকে করায় ও বলায় মূর্ত্ত করতে থাকে, তাহ'লে ধীরে-ধীরে সে ভাল হ'তে থাকবেই। আর, এই মন্দের প্রত্যাহার এবং সৎ-এর বাস্তবায়ন হওয়া চাই ইষ্টার্থে। মানুষ যা'-কিছু করুক, তা' ইষ্টার্থে হ'লে সে-করাটার একটা সার্থকতা হয়। নইলে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ভাল কাজও মানুষের ব্যক্তিত্বকে সুগঠিত করে তুলতে পারে না। আমি এই যে বাণীটা দিলাম, এইভাবে চললে মানুষ অনেক রক্ষা পেয়ে যেতে পারে। সে শুধু নিজেই উপকৃত হয় না, পরিবেশও লাভবান হ'তে থাকে। মনে কোন খারাপ চিন্তা আসলেই মানুষ প'চে যায় না। করা-বলায় সাবধান হ'লেই সৎ-এর সম্বর্দ্ধন হয়ই কি হয়, এবং খারাপ যা' তা' পোষণ-পুষ্টির অভাবে ধীরে-ধীরে দুর্ব্বল ও নিঃশেষ হ'তে থাকে।

২০শে শ্রাবণ, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ৫। ৮। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে। প্যারীদা (নন্দী), বঙ্কিমদা (রায়), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), যোগেনদা (হালদার), কালিদাসীমা, সরোজিনীমা, কুমিল্লার মা, দুলালীমা প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমরা সম্পদকে আসতে দিই না। সম্পদ

যে পথে আসে, তার বিরোধিতা ক'রে সম্পদকে চাই। বিধিমাফিক না করলে কিছুই পাওয়া যায় না। না ক'রে যারা পেতে চায়, তারা বঞ্চনারই উপাসনা করে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি টোটকা ওষুধ সম্পর্কে নির্দ্দেশের জন্য একখানি বই খুঁজছিলেন। কিন্তু যে বইয়ের মধ্যে তা' আছে, সেই বই পাওয়া গেল না। অন্যান্য বইও ঘেঁটে দেখলেন, তাতে ঐ বিষয়ে কিছু পাওয়া গেল না। শ্রীশ্রীঠাকুর নিরাশ হ'য়ে বললেন—যখন যেটা মনে হয়, তখন সেটা করতে না পারলে মনে খুব কষ্ট হয়। আমার এখানে লোক অনেক, কিন্তু সব-রকম দায়িত্ব নিয়ে আমার প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য প্রস্তুত থাকে, তেমনতর লোকের খুব অভাব। যারা সেবক হবে তাদের অনুসন্ধিৎসু দায়িত্ববোধ জিনিসটা থাকা চাই।

আজকাল কলকাতায় ৬৮নং মির্জ্জাপুর স্ট্রীটের সৎসঙ্গ কেন্দ্রের টেলিফোন বিল ক্রমাগত খুব বেড়ে যাচ্ছে, ঐ টেলিফোন বিলের টাকা এখান থেকেই দিতে হয়; সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—হরিদাসকে (ভদ্র) লিখে দেও, অবিলম্বে যেন টেলিফোনে তালাচাবির ব্যবস্থা করে এবং ডুপ্লিকেট চাবি রাখে। সৎসঙ্গের important, unavoidable work (প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য্য কাজ) ছাড়া অন্য প্রয়োজনে ফোন করতে গেলে, যিনিই হোন না কেন, তাঁর কাছ থেকে যেন উপযুক্ত চার্জ নেওয়া হয়, এবং সেগুলি যেন সংগ্রহ করে রাখা হয় বিলের টাকা দেবার জন্য। হরিদাস যখন ওখান থেকে বাইরে কোথাও যাবে, তখন যেন উপযুক্ত এমন কারও কাছে চাবি রেখে যায়, যে দায়িত্ব নিয়ে এই নির্দ্দেশ-অনুযায়ী কাজ করতে প্রস্তুত। নির্ভরযোগ্য ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে ছাড়া যেন চাবি না দেয়। হরিদাসকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে—তার বা তৎনিয়োজিত কারও স্বৈরী ঔদার্য্য বা তাচ্ছিল্যে যেন আমি বিপন্ন না হই। এই চিঠিখানা যেন সে সাবধানে রেখে দেয় এবং পারিপার্শ্বিক থেকে বিশেষ কোন অন্তরায় উপস্থিত হলে, প্রয়োজনমত আমার এ চিঠি যেন দেখায়। এই দুর্য্যোগের মধ্যে অনাহূত খরচ যদি বেড়ে যায়, খুবই মুশকিল। হরিদাস যদি ওখানকার এই অপব্যয়টা বাঁচিয়ে দিতে পারে, তাহ'লে খুব ভাল হয়।

২১শে শ্রাবণ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ৬।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতীনদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), স্পেন্সারদা, প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

মানুষের ভিতর অবদমন থাকলে, তার চরিত্র কেমন হয়, সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন প্রকারের অবদমন বড় বিশ্রী জিনিস। ওতে মানুষের সহজ চলা,

বলা, ভাবা, করা অনেকখানি বিকৃত হ'য়ে পড়ে। এমন একটা অবস্থা দাঁড়ায় যে সে নিজেই নিজেকে বুঝতে পারে না, কী সে চায় এবং কী বা তার গন্তব্য। একটা বিকৃতি তাকে পেয়ে বসে। যাকে সে পছন্দ করে, তার সম্বন্ধে হয়তো বলবে, আমি ওকে দেখতেই পারি না, আবার যাকে সে অপছন্দ করে, তাকেই হয়তো লোকের সামনে খুব সমাদর করে। এইভাবে একটা জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হয়। এর থেকে নানারকম শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিরও সৃষ্টি হয়। আমি কোন-কোন লোককে দেখেছি, যারা অবদমনের পাল্লায় পড়ে গেলেও আমার কাছে চাপা জিনিসগুলি খুলে বলতে চেষ্টা করে। এমনতর যারা, তাদের কিন্তু খুব বাঁচোয়া। শ্রেয়ের কাছে যারা খোলামেলা হ'তে পারে না, বুঝতে হবে তারা দুষ্কৃতি ও বিকৃতি পুষে রাখতে চায়। তার ফলে নিজেরাই বেঘোরে পড়ে যায়। যাদের মন খোলা অথচ বেকুব নয়, তাদের মনের শান্তি অনেক বেশী থাকে।

প্রফুল্ল—অনেক সময় দেখা যায় লোকের কাছে নিজের দুর্ব্বলতার কথা বললে, তারা সেইটের সুযোগ গ্রহণ ক'রে মানুষকে অপদস্থ করতে কসুর করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য সরলতা এবং বুদ্ধিমত্তা দুয়ের সমাবেশ লাগে। কার সঙ্গে কিভাবে চলতে হয়, সেটা জানা চাই। হিতাকাঙ্ক্ষী, শ্রেয় যারা, তাদের কাছে অকপট হ'লে ঐ ধরনের ভয় থাকে না। মনটাকে যত মুক্ত রাখা যায়, ততই ভাল। কোন প্রবৃত্তিকে বাস্তবে পোষণ না দিলেই সেটা স্তিমিত হ'তে থাকে। আর, সৎ প্রবৃত্তি যা'-কিছুকে এন্তার বাড়িয়ে তুলতে হয়। শুভ যা', তা' যদি আমাদের পেয়ে বসে, তখন অশুভ আমাদের ভিতর প্রভাব বিস্তার করার ফুরসুতই পায় কম।

এরপর অজয়দা (গাঙ্গুলী) সম্বন্ধে কথা উঠলো। তিনি মানুষকে নানাভাবে সেবা দেন, সেই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন—অজয় concentric (সুকেন্দ্রিক) কিনা, তাই প্রত্যাশাহীন হ'য়ে মানুষকে ঐভাবে সেবা দিতে পারে। সে যে পেন্সারকে ছাতা বা জুতো তৈরি করে দেয়, অমুকের স্টোভটা সেরে দেয়, তমুকের সিঙ্গার মেসিন বা সাইকেলটা ঠিক করে দেয়, এর পিছনে বুদ্ধি থাকে পরিবেশকে প্রীত ক'রে নিজের ইষ্টপ্রাণতাকে বাড়িয়ে তোলা এবং ইষ্টকে enjoy (উপভোগ) করা। যারা স্থবির হয়ে থাকে, সুকেন্দ্রিক সেবার ভিতর-দিয়ে যাদের জীবন ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে না, তারা কিন্তু আনন্দের অধিকারী হতে পারে কমই। তাই বলি, ইষ্টানুগ, প্রীতি-উচ্ছল লোকসেবার ভিতর-দিয়ে Beloved (প্রেষ্ঠ)-কেই সেবা করা হয়। তাঁকেই enjoy (উপভোগ) করা হয়। নামপরায়ণ হ'য়ে যারা এইসব করার তালে থাকে, তাদের যোগ্যতা এবং মানুষ-সম্পদ যুগপৎ বেড়ে চলে। তারা কখনও দরিদ্র থাকে না। পরিবেশের ইষ্টার্থী সেবা

ও নামপরায়ণতা যদি অব্যাহত থাকে, তাহ'লে ভক্তিভাবও উচ্ছল হ'তে থাকে। তারা নিজেরাও যেমন আনন্দে থাকে, পরিবেশও তাদের সান্নিধ্যে এসে প্রফুল্ল হ'য়ে ওঠে।

বেলা সাড়ে নটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে বললেন—ছোটখাট কোন ব্যাপার যদি উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্য করা যায় এবং তাতে যদি অকৃতকার্য্যতা আসে, তাহ'লে ঐ ঢিলেঢালা চলনের দরুন বড়-বড় কাজেও কৃতকার্য্যতা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। কোন কাজই ছোট নয়। প্রত্যেকটা ব্যাপারেই নিখুঁতভাবে চ'লে ও ক'রে কৃতকার্য্যতায় উপনীত হতে হয়। এই অভ্যাস ও চরিত্রই আমাদের বড় ক'রে তোলে। তাই ছোটখাট কাজ দেখেই বোঝা যায় একটা মানুষ কোন্ মেকদারের। আমি একজনের কথা জানি, লোকে তার কাছে টাকা ধার নিতে আসলে তিনি তাকে তামাক সাজতে দিতেন, হয়তো একটু বেশী তামাক তার হাতে দিতেন। যদি কেউ তামাক সাজার সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত তামাকটা তুলে রেখে দিত, তখন তিনি তাকে টাকা ধার দিতেন। তার কারণ হচ্ছে, ছোট-খাট ব্যাপারে একটা মানুষ যদি মিতব্যয়ী হয়, তাহ'লে বড় ব্যাপারেও সে মিতব্যয়ী হবে ব'লে আশা করা যায় এবং যারা মিতব্যয়ী তাদের অর্থনৈতিক জীবন অনেকখানি সুশৃংখল হ'তে পারে ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আরও কয়েকটি বাণী দিলেন।

২২শে শ্রাবণ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ৭।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ, খগেন মণ্ডল, প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—যারা অপরকে আপন ক'রে নিতে জানে না বা পারে না তাদের আমিত্ব কোনদিনই প্রসার লাভ করে না। আর, তাদের স্ত্রী-পুত্র-সন্তান-সন্ততি, যারা তাদের তত্বাবধানে থাকে, তারাও দিন-দিন সঙ্কীর্ণমনা হ'য়ে চলতে থাকে সাধারণতঃ। সাধারণতঃ বলছি এইজন্য যে উদারমনা সংস্কার নিয়ে যদি তার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে কিন্তু তার জন্মগত সংস্কার উক্ত পরিবেশের দরুন একদম হারাতে পারে না। সেইজন্য ঐ পরিবেশের মধ্যে সে শান্তি পায় না এবং ভিতরে-ভিতরে উদারমনা হ'য়ে চলার সম্বেগ থাকায় সে সেই সুযোগই খুঁজতে থাকে। তাছাড়া যারা সঙ্কীর্ণমনা হ'য়ে চলে, তারা মানসিক আনন্দ এবং শারীরিক স্ফূর্ত্তি থেকেও অনেকখানি বঞ্চিত হ'য়ে চলে। আমি যে ধর্ম্মাচরণের কথা বলি, তার মধ্যে আছে ইষ্টে সুনিষ্ঠ হ'য়ে বহুর স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে চলা।

প্রফুল্ল—ভক্ত ব'লে পরিচিত এমন অনেক লোকও স্বার্থপর সঙ্কীর্ণ জীবন যাপন করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা নামে ভক্ত, কাজে ভক্ত না। যে ভক্ত হয়, তার সর্ব্বদা চেষ্টা থাকে ইষ্টের প্রীণন-পোষণ। ইষ্টকে খুশী করতে চেষ্টা করে না, সে আবার কেমন ভক্ত? আমি দেখেছি, কোন স্ত্রীর হয়তো নজর ছোট, কিন্তু তার স্বামীর মন যদি উদার হয়, তবে সেই স্বামীকে ভালবাসতে গিয়ে সেই স্ত্রীও ধীরে-ধীরে অল্প-বিস্তর উদার হ'য়ে ওঠে। তবে ঐ স্ত্রীর জন্মগত সংস্কার যদি সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর হয়, তাহ'লে কিন্তু স্বামীর মহংভাব আরত্ত করতে রীতিমত বেগ পেতে হয় এবং সেভাবে চলতে তার কিছুটা কষ্টও হয়। মানুষ যে-ভাব জন্মসূত্রে পায়, তা' তার পক্ষে এড়ান কঠিন হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরপর কয়েকটি বাণী দিলেন। এরপর পূজনীয় খেপুদাকে নিম্নলিখিত চিঠিটি লেখালেন।

খেপু,

তোমার ২৭শে জুলাই তারিখে লিখিত চিঠি এখানে সময়মত আসা সত্ত্বেও আমি তা' পেলাম ৫ই আগষ্ট। অনেকগুলি চিঠি যতি-আশ্রমে মজুত হ'য়ে ছিল, তা' প্রফুল্ল বা অন্য কারও নজরে আসেনি। হঠাৎ ঐ পাঁচ তারিখে ননী তোমার চিঠি দেখতে পেল। তোমার চিঠি এত দেরীতে পেলাম বলে আপসোস হ'তে লাগল।

তোমার শরীর প্রায়ই খারাপ থাকে, এর মধ্যে কি touring trouble তোমার suit করবে? (নানা স্থানে ঘুরে বেড়ানর কষ্ট কি সহ্য হবে?)

এখানে নন্টুসের অসুখের জন্য উৎকণ্ঠ আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। তার প্রস্রাবে এ্যালবুমেনের আজকের রিপোর্ট 1%। একটু নড়াচড়া করলে pulserate (নাড়ীর গতি) বেড়ে যায়। কলকাতায় নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে বড়খোকা ইতস্ততঃ করছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে না কী করা যেতে পারে। এই উদ্বেগের দরুনই হোক আর যার দরুনই হোক, আমার বুকের ঐ রকম অবস্থা বেড়েই চলেছে। সোয়াস্তি পাই না—সব সময়ই গেলাম-গেলাম মনে হয়। এইরকম উদ্বেগ নিয়ে একা প্রত্যেকটি মানুষের প্রত্যেক রকম চাহিদার ভারবহন করা—কী যে কষ্টকর—ভুক্তভোগী আর পরমপিতা ছাড়া কেউ বুঝতে পারে কিনা জানি না।

ওদিকে সানুর মেয়ে নোটনের খবরও পাচ্ছি না। অশোক, কুথুন রে-র সঙ্গে কোলকাতায় গেছে কলেজে ভর্ত্তি হতে, তাদের খবরও কিছু পাই না। আমি যে কী কঠিন সংঘাতের ভিতর-দিয়ে দিন কাটাচ্ছি, তা' কে বুঝবে। ধরবার, করবার, ভরসা দেবার কেউ নাই।

অর্চ্চনার বিয়ের কিছু খবর পেয়েছ কি? হরিদাস আর বাদল হয়তো বুধবারে যেতে পারে শোভনার বিয়ের তদ্বিরের জন্য।

খুকী, শাস্তু, কানু, তোতা, মঞ্জু—এরা কেমন আছে? কল্পনার কি কোন খবর পেয়েছ? তোমার শরীর খারাপ লিখেছ, আজকাল কেমন?

আমার আন্তরিক রাধাস্বামী জেনো আর যারা চায় তাদিগকে দিও।

ইতি

তোমারই দীন

'দাদা'

২৩শে শ্রাবণ, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ৮।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায়। কলকাতা থেকে জনার্দ্দনদা (মুখার্জ্জী) তার কয়েকজন বন্ধু সহ এসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), যতিবৃন্দ, প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত। নানা বিষয়ে কথা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যদি করায় পটু হতাম, তাহ'লে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, শিখ, সবাইকেই আমাদের পরম আত্মীয় ক'রে তুলতে পারতাম। ধর্ম্মকে সবাই চায়। কারণ, ধর্ম্মের সঙ্গেই আছে সত্তা। এই সত্তার মধ্যে আছে self-preservation (আত্ম-সংরক্ষণ), self-nurture (আত্ম-পোষণ) ও self-procreation (আত্ম-সংসৃজন)-এর instinct (সংস্কার)। আমরা থাকতে চাই, আবার আত্মবিস্তারের পথে চলতে চাই। লতায়ে যাওয়াটাই আমাদের স্বভাব। প্রত্যেকে যে বিস্তারলাভ করে, সে কিন্তু তার মতন ক'রে। স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী নানাগুচ্ছের সৃষ্টি হয়। আবার বিভিন্ন গুচ্ছের মধ্যে আদান-প্রদান চলে তাদের মতো করে। আমার যেটা নেই, সেটা তোমার মধ্যে আছে, আবার তোমার যেটা নেই, সেটা আমার আছে। পারস্পরিকতা থাকলে আমরা পরস্পর পরস্পরের দ্বারা পরিপূরিত হই।

জনার্দ্দনদা—আজকাল তো অনেকে বলেন, আমাদের রক্তে বিভিন্ন রকমের সংমিশ্রণ হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি বিধিবিরুদ্ধ কোন সংমিশ্রণ না হয়, তাহ'লে গোল হয় না। বীজেরই গাছ, মাটিরই গাছ নয় তো! তুমি যে-কোন বংশেরই মেয়ে বিয়ে কর না কেন, সন্তান পাবে পিতৃবর্ণ। অবশ্য মায়ের বর্ণ-অনুযায়ী আলাদা-আলাদা থাক হবে। মা কিন্তু soil (মাটি)। প্রতিলোম বিয়ে হ'লে প্রতিলোম যৌন-সংস্রবের ফলে পুরুষের অনেকগুলি trait (গুণ) টেনে নিয়ে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে আলাদা

orbit (কক্ষ) সৃষ্টি ক'রে সন্তানকে বহুমুখী বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের একটা জগাখিচুড়ি-রূপে সৃষ্টি করে। তারা কখনও integrated personality (সংহত ব্যক্তিত্ব) হ'য়ে গ'ড়ে উঠতে পারে না। তারা কখন যে কোন্ ধরন ধরবে, তার কোন ঠিক থাকে না।

জনার্দ্দনদা—আজকাল তো হ্যালডেন প্রমুখ অনেকে বলেন,—পরিবেশই সব এবং তার ফলে যে-কোন মানুষ অসাধারণ বড় হ'য়ে উঠতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবেশ কাজ করবে কিসের উপর? সে তো কাজ করবে জৈবী-সংস্থিতির উপর। বিহিত জৈবী-সংস্থিতি থাকলে, তাই-ই পরিবেশ থেকে পোষণ গ্রহণ ক'রে নিজে পুষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে। পোষণ গ্রহণ করনেওয়ালা যদি না থাকে, তাহ'লে পোষণ তো ব্যাহত হ'য়ে কেঁদে ফিরতে থাকবে। পরিবেশ একটা major factor (বড় দিক), সে-বিষয়ে সন্দেহ কী? কিন্তু সে যার উপর সার্থকভাবে কাজ করতে পারে, সেই জৈবী সম্ভাবনাটা থাকা চাই।

আজকালকার নানা আন্দোলনে প্রতিলোম বেড়ে যাচ্ছে। প্রতিলোম যদি ভাল হ'তো, বাড়তো—ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এর ফলে মানুষগুলিকে যে stree-dog (রাস্তার কুকুর)-এর মত ঘোরা লাগবে এবং তাদের মধ্যে সংহতি না থাকায় তাদিগকে মুর্গীর মত ধ'রে দুষ্টশক্তি কেটে-কেটে খাবে। সে কি ভাল?

সগোত্র বিয়েও ভাল না। লাউ-কুমড়োর ব্যাপারেও একই গাছের পুং-বীজ দিয়ে যদি সেই গাছের স্ত্রী-বীজকে breed (জন্মদান) করা যায়, তবে দেখা যায় ফল ছোট হ'য়ে পড়ে। গাছপালা, গরু-ভেড়ার বেলায়ও যে নিয়ম, প্রজননের ক্ষেত্রে মানুষের বেলায়ও সেই নিয়ম, শাস্ত্র যা' বলে তার পিছনে কিন্তু বিজ্ঞান আছে। আমরা বিজ্ঞান মানতে প্রস্তুত, কিন্তু শাস্ত্রের কথা বললেই নাক সিট্কাই, তার কি কোন মানে আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন।

প্রফুল্ল—আপনার ইচ্ছাপূরণের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা আগে চল্লিশ জন যোগাড় কর্। এরা হওয়া চাই সন্ন্যাসী ধরনের মানুষ, আর নিজেরাও সেইভাবে তৈরী হ'।

জনার্দ্দনদা—ভাল-ভাল ছেলে পাওয়া যাচ্ছে কিছু-কিছু।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—পাওয়া যাচ্ছে? খুব ভাল কথা। শুনে চুমু খেতে ইচ্ছে করে। এই যদি পার, তাহ'লে বাঁচাতে পারবে জাতকে। লোকেও cultural conquest (কৃষ্টিগত পরাভব)-এর হাত থেকে রেহাই পাবে। সব

কাগজগুলির মধ্যে ঢোকা লাগে। নিজেদের কাগজ বের করতে হয়। ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টির কথা নিয়ে বার-বার ঢাক বাজাতে হয় লোকের কাছে।

জনার্দ্দনদা—অনেকে ধর্ম্ম কথাটাতেই ভয় পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম মানে তো বাঁচাবাড়া। এ বাদ দিয়ে কারুর কি পারার জো আছে? যে যা' করে তাই ধর্ম্ম, তা' যদি সত্তাসম্বর্দ্ধনী হয়। আমি নুন খাই, কিন্তু নুন কথাটা উচ্চারণ করতে যদি বাধে, তাহ'লে নুন খাওয়াটা তো না-খাওয়া হ'য়ে গেল না। কতকগুলি অজান মানুষের পাল্লায় প'ড়ে মানুষ ভাঁওতাবাজীর পাক-চক্রে প'ড়ে গেছে। বোধি-ব্যক্তিত্ব কম লোকেরই আছে, তাই মানুষ ঠাওর পায় না, কোন্‌টা কী?

জনার্দ্দনদা—একেবারে চুপচাপ যারা তাদের নিয়েই পারা মুশকিল। তারা বাদ-বিবাদ করে না, নীরবে শোনে, কিন্তু ধরে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা ধরবে যখন চারিদিকে আগুন ধ'রে যাবে। তোমরা খুব ক'রে কাজ কর। চারিদিকের pressure-এ (চাপে) ওরা ঠিক হবে।

জনার্দ্দনদা—অনেকে মাছ ছাড়ার কথাটাই ভাবতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তার খাতিরে, আদর্শের খাতিরে, যা' তুমি ত্যাগ করতে পারছ না, জানবে তাই তোমাকে ঠেসে ধরেছে অজগরের মত। তার মানে তুমি তোমার সত্তাকে খতম করার পথে চলেছ। মোটকথা, তোমাকে তাই করতে হবে; যা' তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনার জন্য অপরিহার্য্য। আমরা মরণকে avoid (পরিহার) করতে চাই। তাই আমাদের সেই সব-কিছুকে বাদ দিতে হবে যা' আমাদের মরণকে আবাহন করে। মরণের বিরুদ্ধেই আমাদের অভিযান। ম'রেও আমরা অমর হ'তে চাই। অমৃতত্বের আকূতি আমাদের কিছুতেই ছাড়ে না। ঐ বোল আমরা বাদ দিতে পারি না।

বিজ্ঞান হয়তো বলল যে, পরলোক-টরলোক কিছু নেই। কিন্তু আমরা হ'লাম কি ক'রে। আমরা হয়েছি তো একটা কিছু—তাহ'লে হয়তো ছিলাম আগে কোথাও কিছু। পরেও তো আবার থাকতে পারি। এটা সহজেই মনে আসে। এই চ্যাংড়া-বুদ্ধি ছাড়ি কেন? গেলাম হয়তো নিভে, কিন্তু আবার জ্বলি কেমন ক'রে সেই তো হ'লো কথা। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন—ব্রহ্মের ইতি নাই। আমরাও eternal becoming (অনন্ত বিবর্দ্ধন)-ই চাইছি। চিরতরে নিভে যেতে চাই না।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে বললেন—মনে হয় যে বাংলায় লোক নেই, তা' নয়, এখনও পাওয়া যাবে হয়তো।

গুরুর প্রয়োজন সম্পর্কে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যদি আমাতে

concentric (কেন্দ্রায়িত) হই, তবে আমার libido (সুরত) stunted (খর্ব) হ'য়ে যাবে, becoming (বৃদ্ধি) হবে না। Stagnation (স্থবিরতা) এসে যাবে। বাইরে উপযুক্ত তেমন কাউকে ধরলে libido (সুরত) তারই অভিমুখে এগিয়ে চলে। এটা বাদ দিয়ে কখনও সম্বেগ বাড়ে না। শিবাজীর libido (সুরত) attached (অনুরক্ত) হ'লো রামদাসে। তাই সে বড় হ'য়ে উঠলো। প্রবৃত্তিগুলি যায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠের প্রতি অচ্যুত অনুরাগের ফলে সেগুলির meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হয়। গীতায় আছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।

(বহুজন্মের পর জ্ঞানবান আমাকে এমনভাবে লাভ করে যে আমি বিশ্বে যাহা কিছু হইয়া আছি, কিন্তু তেমন মহাত্মা সুদুর্লভ।)

Integration, consummation, sublimation ও materialisation (সংহতি, পূর্ণ পরিণতি, ভূমায়িতি ও বাস্তবায়ন) এইগুলি ভাল, না প্রবৃত্তির খপ্পরে প'ড়ে দিন-দিন মিইয়ে যাওয়া ভাল? তাই গুরু ছাড়া গতি নাই।

জনার্দ্দনদা—পরমপিতা কী? তাঁর স্বরূপ কী? তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আইনস্টাইন নাকি বলেছেন, absolute intelligence-এর (অখণ্ড বোধির) কথা, তাকে পরাপ্রজ্ঞাও বলা যায়। তিনি আবার পরম প্রেমস্বরূপ। তিনি যে কী, তা' মুখে বলা যায় না।—বোঝে প্রাণ বোঝে যার। তাঁর জীবন্ত স্পর্শ যার ভিতর-দিয়ে পাই, তিনিই কিন্তু আমার সব। Mathematics (গণিত) আমরা উপলব্ধি করি mathematician (গণিতজ্ঞ)-এর ভিতর-দিয়ে। আমাদের সত্তা আছে। সত্তা আছে ব'লেই থাকি, চলি। সত্তাটাকে উপভোগ করাই আমাদের কামনা। বুদ্ধদেবকে বলেছে বোধিসত্ত্ব। তার মানে universal intelligence-এর being (সার্থক বোধির সত্তা)। আমরা বলি তত্ত্ব। তত্ত্ব মানে আমি বুঝি তাহাত্ব। যা' যা' নিয়ে তিনি, সেইসব aspect (দিক) নিয়ে তাঁকে জানা মানেই তাঁকে তত্ত্বতঃ জানা। এর মধ্যে কিছুই বাদ যায় না। আমি কুলি-গিরিই করি, মাস্টারিই করি, আর গভর্ণরই হই; আমার সব-কিছু দিয়ে তাঁকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে।—এই তো আমার কাজ। আমার সব-কিছু যখন তাঁর সেবায় লাগাই, তখন তাঁকে তত্ত্বতঃ জানি আমার মতো ক'রে। প্রত্যেককেই চলতে হবে তার বৈশিষ্ট্যের পথে। সেই বৈশিষ্ট্য তাঁর সেবায় লাগালেই জীবন সার্থক হ'য়ে যায়।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে বললেন—ভক্তিই হ'লো normal platform of our being (আমাদের সত্তার স্বাভাবিক মঞ্চ)।

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ৯।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), যতিবৃন্দ, প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

জনার্দ্দনদা—ব্যক্তিগতভাবে কোন ধনিকের প্রতি আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজন যদি কোটি টাকা নিয়ে থাকে, তা' থাক, আমার আপত্তি নেই তাতে। আমরাও যেন এমনভাবে চলি, এক-একজন capitalist (ধনিক) হ'য়ে উঠতে পারি। আমি বলি, প্রতিপ্রত্যেকে capitalist (ধনিক) হোক—বিহিত শ্রম এবং সেবার ভিতর-দিয়ে। আমাদের socialism (সমাজবাদ) তাই চেয়েছে। আমরা চাই মানুষকে বড় ক'রে বড় হ'তে। মানুষের উন্নতিতে ব্যাঘাত করলে আমাদের উন্নতি কখনও অব্যাহত থাকতে পারে না। আমার কথা—সবাইকে বড় কর এবং নিজেরাও বড় হও।

জনার্দ্দনদা—মাঝখানে দালালরা থাকায় চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা purchasing bureau (ক্রেতা-সমবায়) করব, যাতে চাষীরা না ঠকে।

কেষ্টদা—Capitalist (ধনিক)-দের হাতে সবাই আজ বাঁধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ওদিক দিয়ে যাবই না। ধরেন, টাটা কোম্পানির অনেকগুলি কাজ domestic industry (পারিবারিক শিল্প) হিসাবে পাঁচ হাজার পরিবারে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

কেষ্টদা—পারা যাবে না, তাদের হাতে State (রাষ্ট্র)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা ক'রে নিয়েছে, আমাদেরও organised (সংগঠিত) হ'তে হবে। তখন সব আমাদের হাতে এসে যাবে। মানুষ বাদ দিয়ে কারুর কিছু করার জো নেই। আমরা সমাজের প্রতি স্তরের প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঢুকে যাব। Capitalist বা labour (ধনিক বা শ্রমিক) কেউ আমাদের পর নয়। সবারই মঙ্গল চাই আমরা।

জনার্দ্দনদা—Capitalist (ধনিক)-এর গায়ে হাত লাগলে revolution (বিপ্লব) এসে যাবে, blood-shed (রক্তপাত) পর্য্যন্ত প্রয়োজন হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Revolution (বিপ্লব) আসলে আসবে। তবে দেখতে হবে

blood-shed (রক্তপাত) কত কম ক'রে পারি, এবং একেবারে না ক'রেই পারি কিনা। আমরা তো কারও ক্ষয়ক্ষতি হোক, তা চাই না। Co-operative scale-এ (সমবায়ী স্তরে) capital (মূলধন) সংগ্রহ ক'রে business, trade, industry-র (শিল্প, বাণিজ্যাদির) কতকগুলি powerful centre (শক্তিমান কেন্দ্র) যদি আগেই সৃষ্টি করি, তাহ'লেই ইষ্টকৃষ্টিহীন স্বার্থ-সর্ব্বস্ব capitalist (ধনিক)-দের clutch (কবল) থেকে জনসাধারণকে বাঁচাতে পারব। নচেৎ interim period (মধ্যবর্ত্তীকাল)-এর বিপর্য্যয় এড়াতে পারব না। আমি নিজেকে blessed (ধন্য) মনে করব যদি এক ফোঁটাও রক্তপাত করা প্রয়োজন না হয়।

কেষ্টদা—ঘৃণার ভিতর-দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক আকৃতি সম্যক বিকাশ লাভ করে না। কারও বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে না তুলে আমরা প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলব—সপারিপার্শ্বিক জীবন ও বৃদ্ধির পথে চলার ব্যাপারে। আর, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য বর্ণাশ্রম মেনে চলব। টাকা আমাদের মানদণ্ড নয়। আমরা চরিত্র ও গুণের কৌলিন্য সৃষ্টি করব। এই ভিত্তির উপর যে রাষ্ট্র হবে, তাকে বলা যায় Indo-Aryan Soviet-Socialist (আর্য্য ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। আমরা কাউকে মারতে চাই না, সারতে চাই। অর্থাৎ ধনিক-শ্রমিক, জমিদার-কৃষক যার মধ্যেই যে প্রবৃত্তিতান্ত্রিক অসামাজিকতা থাকুক না কেন, তা' আমরা সংশোধন ক'রে তুলতে চাই।

জনার্দ্দনদা রাশিয়ার কম্যুনিজ্মের ভাল দিকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মুগ্ধ কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন—'চারিদিক হ'তে অমর জীবন/বিন্দু বিন্দু করি আহরণ/আপনার মাঝে আপনারে আমি/পূর্ণ হেরিব কবে?' আমাদের বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে দুনিয়ার ভাল যেখানে যা-কিছু পাব, তা' গ্রহণ করব—আত্মগত ক'রে নেব। আমরা যদি আমাদের বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে কাউকে অনুকরণ করতে যাই, তাহ'লে হয়তো কাকপুচ্ছ ময়ূরের মতো হব। মোট 'পর বাঁচতে চাইলেই পরিবেশের প্রত্যেককে বাঁচিয়ে উচ্ছল ক'রে তুলতে হবে। কারও ক্ষতি ক'রে কারও লাভ হ'তে পারে না।

সকাল ৯টা ২২ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত ছড়াটি দিলেন।

'অগুণ যত বেড়ে চলে
দারিদ্র্যও তত ফোলে।'

এই প্রসঙ্গে বললেন—মানুষের চারিত্রিক দারিদ্র্য অর্থাৎ বদভ্যাস ও অবগুণ যদি না থাকে, তাহ'লে কোন মানুষেরই দরিদ্র হবার কোন কারণ নেই। যারাই

বৃদ্ধিমান, পরিশ্রমী, সুস্থ-সবল ও অনুসন্ধিৎসু সেবাপরায়ণ,—তারা রাজাগজা না হ'তে পারে, কিন্তু কখনও তাদের হতদরিদ্র জীবনযাপন করতে হয় না।

কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি—গুণরাশি নষ্ট হ'লেই দারিদ্র্যদোষ আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে কেষ্টদা, জনার্দ্দনদা প্রমুখ সহ বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। সেখানে সুজনন-প্রসঙ্গে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিয়ে যদি ঠিকমতো হয় এবং স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, তবে স্ত্রীর ovum-এর secration (ডিম্বাণুর ক্ষরণ) অর্থাৎ enzymeগুলি পুরুষের gene (জনি)-গুলিকে nurture (পোষণ) দিতে পারে ভাল। আমার মনে হয় মেয়েদের যৌনগ্রন্থিগুলি ঐ এঞ্জাইমের ল্যাবরেটরি। পুরুষ-নারী প্রত্যেকেই যত সুকেন্দ্রিক হয়—বাঁচাবাড়ার আকূতি নিয়ে, ততই তাদের শরীর বিধানের প্রত্যেকটি যন্ত্র সুষ্ঠুভাবে ক্রিয়া করে। এতে শরীর, মন ও মাথা একসঙ্গে খোলতাই হয়। ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ তাই কখনও dull (নীরেট) হয় না, তাদের চলাবলায় একটা দীপ্তি থাকে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ছোট বাণী দিলেন—

'ধর্ম্মকে প্রতিপালন কর,
ধর্ম্মকে আয়ের উপকরণ ক'রে নিও না—
ঐ প্রতিপালিত ধর্ম্মই
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের
অধিকারী ক'রে তুলবে তোমাকে।'

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং। ১০। ৮। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), শৈলজাদা, প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

সুপ্রজনন-সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিহিত পরিণয় যদি হয় এবং স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি সুকেন্দ্রিক হয়—ইষ্টানুগভাবে,—প্রবৃত্তির পথে হ'লে হবে না, আর স্বামীর যদি শ্রেয়ের প্রতি টান থাকে, তবে সুসন্তানের আবির্ভাব সহজ হ'য়ে ওঠে। ধর, স্বামী-স্ত্রী থিয়েটার দেখতে গেল, সেখানে বুদ্ধদেবের জীবন অবলম্বন ক'রে লেখা নাটক দেখে আসল। ঐ-সব বিষয়ে আলাপ করতে-করতে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হ'লো, তখন ঐ ভাবওয়ালা সন্তানেরই আগমন হবে।

পিতামাতার সমঞ্জসা অনুরাগ ও মিলনের ভিতর-দিয়ে সন্তানের জীবনী-শক্তি নির্দ্ধারিত হয়। প্রত্যেকটা সেল ও অরগ্যান তেমনতরভাবে adjusted (বিন্যস্ত)

হয়। Resisting capacity (প্রতিরোধ ক্ষমতা)-ও determined (নির্দ্ধারিত) হয় ঐ দিয়ে।

আমাদের আর্য্যদের বুদ্ধি ছিল যাতে ঘরে-ঘরে ভগবান হয়। মনে কর শতকরা পঁচিশ জনও যদি শুভ সংস্কার নিয়ে জন্মায়, তারও প্রভাব হয় অসীম।

প্রফুল্ল—এইসব বিধিবিধান থাকা সত্ত্বেও ভারতের আজ এ দুরবস্থা কেন? প্রধান সমস্যা তো ভাল মানুষের অভাব!

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতিলোমই সব সর্ব্বনাশের মূল। বেনরাজার সময় প্রথম এটা সমাজে ঢোকে। আজও তা eliminated (অপসৃত) হয়নি। প্রতিলোম সন্তানের শয়তানি প্রবৃত্তি প্রবল হবেই। তারা কালের অধীনে থাকতেই ভালবাসে।

জনার্দ্দনদা—প্রবৃত্তিমুখী সাধনায় কি মানুষের উন্নতি হয়? যেমন পঞ্চরসিক ও এক ধরনের তান্ত্রিকদের মধ্যে দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা হ'লো নিম্নস্তরের লোকদের জন্য। ওর ভিতর-দিয়ে যাতে মানুষ উন্নতির দিকে পরিচালিত হয়, সেইটেই এর লক্ষ্য।

জনার্দ্দনদা—'I am the way, the truth, the goal ; none can come to the father, but by me. (আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই লক্ষ্য। আমাকে না ধ'রে কেউ পরমপিতার কাছে যেতে পারে না।) এ কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।' অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই। তাই ব্রহ্মবিদ্‌কে বাদ দিয়ে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্ আমাদেরই মতো মানুষ। তাই তাঁকে আমরা বুঝতে পারি, অনুসরণ করতে পারি, ভালবাসতে পারি। যেমন গণিতজ্ঞকে ধ'রে আমরা গণিত শিখি।

জনার্দ্দনদা—ভোলানন্দ গিরি, বালানন্দ ব্রহ্মচারীজী এঁরা কি ব্রহ্মবিদ্?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হ'তে পারেন। ব্রহ্মবিদ্ যাঁরা হন, তাঁদের মধ্যে পূর্ব্বতনের সঙ্গে সঙ্গতি দেখা যায়। তাঁরা ভেদ সৃষ্টি করেন না। বরং তাঁদের ভিতর-দিয়ে পরস্পরের পরিপূরণে ঐক্যই এগিয়ে যায়। ক্রাইস্ট বলেছেন, 'I am come to fulfil, not to destroy' (আমি পরিপূরণ করতে এসেছি, ধ্বংস করতে আসিনি)। প্রত্যেক ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের মধ্যে এই পরিপূরণী লক্ষণটা স্বাভাবিক।

Miracle (অলৌকিকতা) সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণদেব তো ওসব পছন্দ করতেনই না। কিন্তু একসময় হৃদে তাঁকে খুব ক'রে ধ'রল,—মা'র কাছ থেকে একটু সিদ্ধাই চেয়ে নেও। তাহ'লে আমার সংসারের দুঃখ-কষ্ট ঘুচে যাবে। হৃদয়ের কথা মনে করে তিনি ভাবলেন, যদি মার দয়ায় ওর কিছু উপকার হয়। মা যা' করেন তাই তো হবে। ঐ সম্বন্ধে

ভাবতে ভাবতে তিনি দেখতে পেলেন, তার সামনে একটা বুড়ী বেশ্যা পিছন ফিরে ভড়-ভড় ক'রে হাগছে। তখন তিনি হৃদেকে বকতে লাগলেন, তাঁকে ঐভাবে অনুরোধ করার জন্য। রামকৃষ্ণদেব সিদ্ধাইকে বেশ্যার বিষ্ঠার মতই ঘৃণা করতেন। কারণ, ওতে মানুষের সত্যিকারের উন্নতি হয় না। কিশোরী অনেক সময় এ-সব করত। একবার একটা অর্কাইটিসের রুগীকে সারিয়ে ওর গা ফুলতে লাগল। তখন আমি ওকে সাবধান ক'রে দিলাম।

Psychically (মনোবৈজ্ঞানিকভাবে) miracle (অলৌকিকতা) ব্যাপারটা হ'লো mainly manipulation এবং suggestion (প্রকৃতির উদ্দেশ্যানুকূল পরিচালনা ও সাংকেতিক কৌশল)।

নাম-টাম যদি seriously (গুরুত্ব সহকারে) কর, অনেক কিছু আসবে, কিন্তু ওদিকে যদি ঢ'লে পড়—খুবই মুশকিল।

আমার এমন কত হয়েছে যে খুব মেঘ হয়েছে, আকাশের দিকে একটুক্ষণ চাইলাম, চারিদিক খুব বৃষ্টি হ'য়ে গেল—যেখানে আছি সেই জায়গাটা বাদ দিয়ে। এ-সব কিছু না, এর কোন দাম নেই। এদিকে মন দিও না, তাহ'লে গেছ। রাস্তায় ঘোরা সাধুর মতন দশা হবে। ওসব বুদ্ধি ক'রো না, এমনি যা' হয় হোক। ওদিক গ'ড়িয়ে গেলে পরে কাম হবি নানে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন।

২৬শে শ্রাবণ, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১১।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সারাদিন কয়েকটি বাণী দিলেন। রাত্রে তিনি বাইরের তাঁবুতে বসে আছেন। বহু দাদা ও মায়েরা উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—মানুষ যদি কাউকে ভালবাসে, তাহ'লে সবসময় লক্ষ্য রাখে, প্রিয় যাতে সুখে থাকেন, সুস্থ থাকেন, তাঁর কষ্ট হয় এমনতর কিছু সে করতে চায় না। আমার এমনতর অবস্থা যে আমি যখন কষ্টে ধুঁকছি, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে, তখন হয়তো একজন এসে আমাকে বলল—আমার প'চিশটা টাকা না হ'লেই নয়। তখন ভাবি—Thy necessity is greater than mine (তোমার প্রয়োজন আমার থেকে বেশী)। এমন মনোভাব নিয়ে সেই দুর্ব্বল শরীরে স্থবির মন নিয়ে হয়তো হাত-পা নাড়ি। একে-ওকে ডেকে যেমন ক'রে হোক একটা ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করি। কিন্তু এভাবে আর পেরেও উঠি না। তাই মনে হয়, মানুষের জন্য করতেই যদি না পারি, তবে বেঁচে লাভ কী? এইসব নিয়ে বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে চলে, আমার কথা একটু দরদের সঙ্গে ভাবে,

তেমন লোকই কম। বহু মানুষ আছে, তাদের এতটুকু অসুবিধা হ'লে তারা আমাকে আর রেহাই দেয় না। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে যে কী কষ্টে কাটাই দুনিয়ার কারও কাছে তার কৈফিয়ৎ দেবার জো নেই। মানুষ মনে করে ঠাকুর খুব সুখে আছে, কিন্তু এ অবস্থায় পড়লে মানুষ বুঝতে পারে যে সুখটা কী!

প্রফুল্ল—আমরা দায়িত্ব নিয়ে মানুষের প্রয়োজন যদি মেটাই, তাহ'লে বোধ হয় আপনার এত কষ্ট পেতে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধ্যমত অপরের জন্য যদি কর, তাতে তোমাদের পক্ষে ভাল হবে, মানুষগুলিকে যদি ইষ্ট ও পরিবেশের জন্য ভাবতে ও করতে প্রবুদ্ধ ক'রে না তোল তাহ'লে কিন্তু তাদের অভাব ঘুচবে না। মানুষ যতদিন স্বার্থসন্ধিৎসু হ'য়ে চলে, ততদিন তাদের পারগতা তো গজায়ই না এবং পরিবেশও তাদের দ্বারা উদ্বেজিত হয়। মানুষ কষ্ট পায় চরিত্রের জন্য। যে চরিত্রের দরুন, যে দোষের দরুন অভাব ছাড়ে না, তাকে বলা যায় pauperism (দারিদ্র্যব্যাধি)। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি যদি কেউ ঠিকমত করে, তাহ'লে pauperism (দারিদ্র্যব্যাধি) যেতে বাধ্য। দীক্ষা অনেকে নেয়, কিন্তু যা'-যা' করার তা' করে না ব'লেই ফল পায় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন।

২৮শে শ্রাবণ, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ১৩।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

গতকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত প্রফুল্ল শ্রীযুত অনিল গাঙ্গুলীদার কাছে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লেখেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত চিঠির নকল ভাবীকালের প্রয়োজনের কথা ভেবে লিখে রাখতে বললেন। সেই চিঠির অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হ'লো।

শ্রদ্ধেয় অনিলদা,

আপনার চিঠি পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে শুনিয়েছি। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে বললেন 'সে কি? ওদের (রাজবংশী ক্ষত্রিয়ের) মেয়ে যদি কায়স্থের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতো—সে না হয় একটা হ'তো—সেটা ভালই। এ কি করলো? ওরা ক্ষত্রিয়ের একটা branchও যদি হয়—তাও কি সব ক্ষত্রিয়ের মেয়ে সব ক্ষত্রিয় নিতে পারে? পারশবের বামুনও তো বামুন—তাই বলে কি একজন সাধারণ ভাল ঘরের বামুন তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারে, না দেয়? মোটপর এ ব্যাপারে

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদৌ অনুমোদন বা সমর্থন নেই এবং তিনি রীতিমত দুঃখিতই হয়েছেন—ভবিষ্যতে এমনতর কাজ যেন আর না হয়।

আপনার এ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের বিভিন্ন এলাকা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ক্রমাগত চিঠি আসছে। এ প্রতিবাদ একটা শুভলক্ষণ—আপনি যে বহুলোককে ইষ্টকৃষ্টির প্রতি অনুরাগী ক'রে তুলতে পেরেছেন—এটা তারই পরিচায়ক। যারা আপনার এই কাজের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বা জানাচ্ছেন, তারা সংহতি-ভঙ্গকারী নয়—তারা ইষ্ট, কৃষ্টির তথা ইষ্টকৃষ্টির পরিবেশক, আপনার পরম সুহৃদ। পরমপিতার শক্তিতে শক্তিমান হ'য়ে আপনি যদি এদের দূরে ঠেলে দেন—সেটা নিজের পায়ে কুড়োল মারাই হবে। আপনার নিজের ভুল সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে এদের নিয়ে একগাট্টা হ'য়ে তাঁর কাজে লাগাই বাঞ্ছনীয়। আপনি লিখেছেন—'সকলে এইরূপ বিবাহ প্রচলনের ভিতর দিয়া উত্তরদেশী ও দক্ষিণদেশী ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিভেদ দূরীকরণে খুবই একমত ও উৎসাহিত'—তাদের ঐকমত্য ও উৎসাহ খুবই আশঙ্কার ব্যাপার—যাজনের সাহায্যে আপনার এদিগকে mould (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগবে—অবশ্য রাজবংশীর মেয়ের কায়স্থের সঙ্গে বিবাহ তো অনায়াসেই হ'তে পারে—বিধিমাফিক।

আমার এ চিঠির ভিতর-দিয়ে সব কথা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হ'লো কিনা জানি না—তবে মোদ্দা কথা আশা করি পরিস্ফুট হয়েছে।

ঋত্বিগাচার্য্য থেকে সুরু ক'রে প্রত্যেকেই আপনার চিঠি পেয়ে অবাক হয়েছেন। সাক্ষাৎমত আরো কথা হবে।

আপনাদের কুশল জানাবেন। আমার সশ্রদ্ধ 'রা' জানবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরসহ অত্রস্থ কুশল।

ইতি

দীনভাই—প্রফুল্লকুমার দাস।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। অধ্যাপক জ্যোতিষ মণ্ডল, তার পুত্র কমল মণ্ডল, ঘোষালদা প্রমুখ এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের খবরাখবর নিলেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন। প্রত্যেকটি বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রফুল্ল সেগুলি দাদাদের প'ড়ে শোনাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত দাদাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—বোঝা যাচ্ছে তো?

ওরা সবাই বললেন—হ্যাঁ।

সেই প্রসঙ্গে কিছু-কিছু আলোচনাও হ'লো।

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ১৪।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় উপবিষ্ট। যতীনদা (দাস), ভগীরথদা (সরকার), হরিপদদা (সাহা), প্যারীদা (নন্দী), জ্যোতিষদা (মণ্ডল), কমলদা (মণ্ডল), ঘোষালদা, জনৈক পাশী গুরুভাই প্রমুখ অনেকে উপস্থিত। খাতা থেকে প্রফুল্ল শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেকগুলি বাণী প'ড়ে শোনাল।

জ্যোতিষদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আপনার এ সব বাণী শুনলে সংসারের দুঃখকষ্ট আর মনে থাকে না। এগুলি যত তাড়াতাড়ি ছাপা হয়, ততই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এগুলি সব গুছিয়ে ঠিক করা দরকার। (গল্পচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন)—কার যে কোন্ সময় কোন্ কথা মাথায় ধ'রে যায় তার ঠিক নেই। আমার ছড়ার মধ্যে আছে—অভাব যখন মারবে ছোঁ/যা' জোটে দিস পাবিই জো। কাটোয়ার একজন সৎসঙ্গী আছে, তার অবস্থা খুব খারাপ। সে ভাবল—'আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন তো হ'চ্ছেই না। কিন্তু ঠাকুরের এই নীতি-অনুযায়ী চ'লে দেখিই না কেন।' এই ভেবে সে রোজ একটা পুকুর থেকে কলমী শাক তুলে এ-বাড়ী, ও-বাড়ী--নানা বাড়ীতে দিত। তারা কেউ-কেউ দাম দিতে চাইত। সে বলত —দামটাম লাগবে না, আপনারা খেলেই আমি খুশী হব। কেউ-কেউ পয়সা দিতে চাইলেও সে নিত না। যে-সব বাড়ীতে সে কলমী শাক দিত, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বিশিষ্ট লোক, শুনেছি, ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। তিনি ভাবলেন—লোকটা রোজ-রোজ কলমী শাক দেয়, পয়সা নেয় না, আবার এত আগ্রহভরে শাক খাওয়ার কথা বলে ; এর পরে যখন আসবে তখন লোকটা সম্বন্ধে খবর নিতে হবে ; কোথায় থাকে, কী করে ? পরে একদিন তাকে পেয়ে তার খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলেন। সে তখন বলল—আমি গরীব মানুষ, আমার বিশেষ কোনই কাজকর্ম্ম নেই, অতি কষ্টে সংসার চলে। আমি সৎসঙ্গী। অভাব দূর করা সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা আছে—'অভাব যখন মারবে ছোঁ/যা' জোটে দিস পাবিই জো'। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই নির্দ্দেশ-অনুযায়ী আমি পুকুর থেকে কলমী শাক তুলে এ-বাড়ী ও-বাড়ী দিই।' ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি লেখাপড়া জান ?' লোকটি বলল—'আমি ম্যাট্রিক পাশ করেছি।' ভদ্রলোক বললেন—'মিউনিসি-প্যালিটিতে কেরানীর কাজ খালি আছে, করবে ?' লোকটি বলল—'আমি কোন আশা নিয়ে কিছু করিনি। আপনার মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমি যে দুটো কলমী শাক তুলে খাওয়াতে পেরেছি, সেই আমার মহালাভ। তবে আমি যদি কোন কাজ পাই, তাহ'লে খুশী হব।' চেয়ারম্যান তখন বললেন—'তুমি একটা

দরখাস্ত কর, তোমার একটা কাজের ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে।' এইভাবে তার কাজ জুটে গেল।

তখন তার সচ্ছল অবস্থা, তবু কিন্তু সে স্বেচ্ছায় মাঝে-মাঝে চেয়ারম্যানসাহেব এবং অন্যান্যকে শাকপাতা যা' পারত দিতে চেষ্টা করত।

তাই বলি—আমরা যদি আমাদের চলন-চরিত্র ঠিক করি এবং সেবাবুদ্ধি নিয়ে চলি, তাহ'লে দুঃখ-দারিদ্র্যের মোটামুটি নিরসন হ'তে বাধ্য।

৩২শে শ্রাবণ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ১৭।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), যতীনদা (দাস), সুরেনদা (বিশ্বাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরিদাসদা (সিংহ), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে মাঝে দুইদিন শ্রীশ্রীঠাকুর প্রধানতঃ বাণীই দিয়েছেন।

আজ সকালে প্রার্থনা সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রার্থনা এমন হওয়া ভাল, যেমন—'আমার জীবন তোমার দয়াতে অভিষিক্ত হোক। তোমার অনুগ্রহের পথে আমার জীবন সঞ্চালিত হোক।' প্রার্থনাগুলি খুব ফেনানো ভাল না। Short compressed (ছোট সংহত) অথচ forceful (শক্তিশালী) হওয়া চাই। ফেনানো হলে diluted হয়ে (গুলিয়ে) যায়। 'আমি দীনহীন পাপী, আমাকে দয়া কর'—ইত্যাদি প্রার্থনা ভাল না। আমার কথা হ'ল যতক্ষণ তোমার অহংবুদ্ধি আছে, তত সময় তুমি নিজের চেষ্টায় actively (সক্রিয়ভাবে) কর। তাঁর জন্য করব আমি, সেটা আমারই দায়। তাঁর জন্য না করতে পারলে আমি যেন বাঁচি না। এমনতর না হয়ে যদি আমি প্রার্থনা করি,—'আমি যেন তোমাকে ভালবাসতে পারি'—সেটা খুব ঠিক প্রার্থনা নয়। 'দেহ প্রেম কী দাত' ইত্যাদি প্রার্থনায় মানুষের নিজের করায় খাঁকতি আসে। আমার ভালবাসা তাঁকে নিবেদন করব—সেখানে তিনি কী দেবেন? কাজটা তো আমার এবং এটা আমারই আয়ত্তাধীন। ভগবান তো আমাকে ভালবাসা দিয়েই দিয়েছেন। সেই ভালবাসা যেখানে-সেখানে না ঢেলে তাঁতেই ন্যস্ত করব, আমার এই-রকম ধারণা।

খগেনদার (তপাদার) উপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ঘর করার দায়িত্ব দিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বললেন—প্রয়োজনের আগে প্রস্তুতি জিনিসটা খুব দরকার। বরাবর আমার এ বুদ্ধি ছিল। তাই ম্যাজিকের মতো কাজ হ'য়ে যেত। আজ যেখানে জঙ্গল, কাল হয়তো সেখানে দেখা গেল একটা দালান উঠে গেছে। পাবনা শহরের

লোক এসে বলত—'এ তো রীতিমত ম্যাজিকের মতো ব্যাপার—অসম্ভব কাণ্ড।'

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন।

'যাই করতে যাও না কেন,
করার আগেই বুঝে নেও তা,
বুঝে তার লওয়াজিমা সংগ্রহ করে প্রস্তুত হও,
করায় হাত দেও,
সময়মাফিকই সুসম্পন্ন কর তা'—
ভুলচুক সংশোধন ক'রে,
এমনি ক'রেই জ্ঞান,
যোগ্যতা অর্জ্জন কর,
ঠকবেও কম, ঠেকবেও কম।'

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এক-একজন লোকের অভ্যাস আছে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলে—তা' উভয়ের পক্ষেই খারাপ, তাই ভগবান কান দিয়েছেন পাশে।

বর্দ্ধমান থেকে আগত একটি দাদা বললেন—আমার বারবার অসুখ করছে, কিছুই ক'রে উঠতে পারি না। সবই তালগোল পাকিয়ে যায়। আমি এমন শক্তি চাই যাতে সবটা সুবিন্যস্ত ক'রে তুলতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশৃংখলা থাকবেই, বাধা থাকবেই, কিন্তু বোধি দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে তাকে অতিক্রম করা লাগবে। Struggle (সংগ্রাম)-ই জীবন। যারা বাধার ভয় পায়, বা succumb করে (অভিভূত হয়), তারা জীবনে বড় হতে পারে না। ভগবানকে ভালবাসা লাগে। শরীর ঠিক রাখা লাগে, আর পরমপিতার পথে দাঁড়ায়ে যা' কিছু করা লাগে।……বারবার এত অসুখ হয় কেন?

উক্ত দাদা শারীরিক বিভিন্ন উপসর্গের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুদিনা, সুলপে, ধনেপাতা, আমলকী বা তেঁতুল সহ কাঁচালঙ্কা ও চিনি মিশিয়ে চাটনী করে ভাতের পাতে খাস। আর সকালে আমানীর জল খাওয়া ভাল—লেবু, লঙ্কা ও নুন দিয়ে।

১লা ভাদ্র, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১৮।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। যতীনদা (দাস), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), মানিকদা (মৈত্র), হরিদা (গোস্বামী), প্রবোধদা (মিত্র), মণিভাই (সেন), প্রফুল্ল প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

হীনম্মন্যতা যেখানে যত শক্ত ও সঙ্কীর্ণ,
অপরাধস্বীকার, মার্জ্জনাভিক্ষা ও সরল আনুগত্য
সেখানে তত কৃপণ ;
আত্মবিচার ও স্বার্থসন্ধিৎসুতাও তার তেমনতর।

উপরের লেখাটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট, মোহর খাঁ ডাকাত—এদের ডাকাতির পিছনেও হীনম্মন্যতা ছিল, কিন্তু তা' সঙ্কীর্ণ স্বার্থসন্ধিৎসু ছিল না। তার সঙ্গে মানুষের কল্যাণের একটা যোগ ছিল। তাই হীনম্মন্যতা ক্ষুদ্রস্বার্থীও হতে পারে, আবার বৃহত্তরস্বার্থীও হতে পারে। তুমি ধর বৈশ্য community-র (সম্প্রদায়ের) উন্নতি চাও, কিন্তু তুমি যদি শুধু বৈশ্য community-র (সম্প্রদায়ের) কথাই ভাব—অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা, তাদের উন্নতির কথা যদি চিন্তা না কর, তোমার এই কল্যাণবুদ্ধিও সঙ্কীর্ণ হীনম্মন্যতা-প্রসূত। আর তাতে বৈশ্য community-র (সম্প্রদায়ের)-ও কিছু করে উঠতে পারবে না তুমি।

কিছু সময় পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

মানুষের মস্তিষ্কলেখা
যেমনতর আগ্রহ-অভিভূতি নিয়ে
নিবন্ধ থাকে,
কপাল বা অদৃষ্টও
তাদের তেমনতরই ;—
স্বভাব-চলন চরিত্র-আচার-ব্যবহার
সেই পরিচর্য্যা-নিরত হয়েই চলে ;
তাই, স্বভাব তা'র বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
যাতে যেমনতর সক্রিয়,
কপালও তার তেমনিই।

বাণীটি দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের মস্তিষ্কলেখার কথা কইলাম, কিন্তু এটা universal (সার্ব্বজনীন) ব্যাপার—পশুপক্ষীর মধ্যেও এমনতরই।

সুশীলদা—দুনিয়া থেকে মানুষ তো গ্রহণ করে তার instinct (সংস্কার)-অনুযায়ী, কেউ খারাপ instinct (সংস্কার) নিয়ে জন্মালে, তাকে ভাল করার পথ কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন, একজন চুরির instinct (সংস্কার) নিয়ে জন্মেছে, সেখানে

দেখা লাগে সেই চুরিটা কোন্‌-কোন্‌ জায়গায় ভাল—সেইভাবে সেটাকে যদি guide (পরিচালনা) করা যায়, তবে ঐ মন্দ instinct (সংস্কার)-ও হয়তো সুফলপ্রসূ হতে পারে।

২রা ভাদ্র, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ১৯।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতীনদা (দাস), হরিদাসদা (সিংহ), প্রবোধদা (মিত্র), খগেনদা (তপাদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মোহনকে (ব্যানার্জ্জী) বিশেষ একটা নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। মোহন সেটা সময়মত না করায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রত্যেকটা কাজের একটা সময় আছে, গরম থাকতে-থাকতে না করলে হয় না। রান্নাতে নুন যখন দিতে হয়, তখন না দিয়ে অন্য সময় দিলে সে তার আর হয় না।

যতীনদা—আপনি যে-সব পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন, তা' পার হতে-হতেই তো কাজ সারা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পার হনই না। তা' যদি হতেন আপনাদের যে traits (গুণ) আছে, আপনাদের সঙ্গে পারে কে? খামাকা আমি ফচে হ'য়ে থাকলাম। আপনারা বড় না হ'লে আমার মর্য্যাদা কোথায়? আপনারা ঠিকভাবে চললে আপনাদের সঙ্গে কারুর পারার জো ছিল? যা' কই, তা' করেন না, তাহ'লে এ-দশা থাকত না। নিজের পেছনে নিজে লাগা লাগে। Complex-এর (প্রবৃত্তির) পেছনে কোন leaning (আনতি) থাকবে না, mercy (দয়া) থাকবে না, থাকবে justice (ন্যায়বিচার)। দেখতে হবে complex-এর (প্রবৃত্তির) সাত্বত ব্যবহার কেমন ক'রে হয়।

বাইরে থেকে আপনার স্বাস্থ্য ভালই দেখা যায়, মনে হয় কোন রোগ নেই। সুরেনেরও শরীর ভাল হয়েছে। এখন আপনাদের আভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্যটা ভাল হলেই হয়।

যতীনদা—আজীবন কি পরীক্ষা চলবে, পরীক্ষা কি শেষ হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরীক্ষার কি শেষ হয়? পরীক্ষার তো একটাই বোঁটা—ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্নতা। সমস্ত প্রলোভন, attraction (আকর্ষণ) supersede (অতিক্রম) ক'রে থাকবে এই জিনিসটা with active immediacy (সক্রিয় ত্বরিত গতি নিয়ে)। প্রত্যেকটা affair-এ (বিষয়ে) ভাবাই লাগে, চলাই লাগে ঐভাবে।

এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরমপূজনীয়া ছোটমার বহু-বিবাহ সম্বন্ধে লেখাটার খুব প্রশংসা করলেন। বললেন—অনেকের লেখা দেখে মনে হয় conception (ধারণা)-টা clumsy (আবিল)। Example (উদাহরণ)-গুলি দেয়, তা' দেখেই বোঝা যায়, conception (বোধ) কতখানি clumsy (অপরিচ্ছন্ন)। এর লেখার একটা স্বচ্ছ ধরন আছে, বইটই যোগাড় ক'রে দিতে পারলে, বোধহয় আরও ভাল পারবে।

কেষ্টদা বললেন—চুনী, বীরেন খুব লিখছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনে ভাল লাগে। লেখা, বলা, চরিত্র—সবই যদি একটা অসাধারণ standard (মান) attain করে (লাভ করে), তবে মানুষের তাক লেগে যাবে।

গণতন্ত্র সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সকলের মত নিয়ে সমাজের কল্যাণ করতে গেলে প্রকৃত কল্যাণ হয় না। কারণ, অধিকাংশ মানুষ প্রবৃত্তিপন্থী। তাই মনু বলেছেন—একজন বেদবিৎ দ্বিজোত্তম যা' বলেন, লক্ষ-লক্ষ মানুষের মত না নিয়ে তা' শোনাই শ্রেয়। তেমনতর order (স্তর)-এর না পেলে তিনজন বা দশজন বা শতজন ব্রাহ্মণ্য-গুণসম্পন্ন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত পরিষদ দিয়ে সমাজ পরিচালিত হবে। ইনি বা এঁরা যে কোন বর্ণেরই হোন না কেন, ব্রাহ্মণ হওয়া চাই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যগুণসম্পন্ন হওয়া চাই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিলেন।

৩রা ভাদ্র, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ২০।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতীনদা (দাস), নন্দদা (চক্রবর্ত্তী), গোপেনদা (রায়), প্রফুল্ল প্রমুখের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Stiff ego (শক্ত অহং) tackle (পরিচালনা) করতে গেলে সবসময় thrash (আঘাত) দিলে হয় না। Thrash (আঘাত) দিলে আরও stiff (অনমনীয়) হ'য়ে পড়ে। Psychologically (মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে), sympathetically (সহানুভূতি সহকারে) deal (ব্যবহার) করলে ভেঙ্গে পড়ে। তখন open ক'রে (খুলে দেয়) নিজেকে।

এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু) প্রমুখ আসলেন। কথায়-কথায় তাঁরা বললেন—কেউ-কেউ দুষ্ট লোকের উল্টো যাজনের শিকার হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎসঙ্গী, যাদের এক-আধটু কিছু হয়েছে, তাদের চোখ খুলে গেছে। তাদের খানা-ডোবায় পড়া মুশকিল।

বর্ধমানের একটি দাদা বললেন—দীক্ষা নিয়েছি, ইষ্টের জন্য ভাবা-বলা-করা দরকার। মানুষকে কী বলব, আর করবই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে মানুষের সত্তা-সম্বর্ধনা হয়, তাই মানুষকে বল—প্রত্যেকের মতো ক'রে তাকে। পরিবেশ উন্নত না হ'লে তোমারও উন্নতি নেই। তাদের কাছ থেকেই দেহ ও মনের খোরাক নিতে হবে তোমাকে, তাই তারা যত সৎ ও সাত্ত্বিক হয়, ততই ভাল তোমার পক্ষে; তাতে তুমি জীবনীয় রসদ পাবে। সুতরাং মানুষকে বলতে হবে তাই যাতে তাদের মঙ্গল হয়। তাদের মঙ্গলেই তোমার মঙ্গল। আর তোমার ভাবাটা যদি ভাবাতেই পর্য্যবসিত হয়—তোমার nerve (স্নায়ু)-কে excite (উদ্দীপ্ত) ক'রে যদি তা' করায় উদ্ভিন্ন না হ'য়ে ওঠে, তবে তা' তোমার সত্তার দানা বেঁধে ওঠে না। আবার, ইষ্টার্থে ভাবা, বলা, করার সঙ্গতি যত হয়, ততই ইষ্টানুরাগ গজিয়ে ওঠে। ঐটেই মানুষের মূল সম্বল।

উক্ত দাদা—আমরা নিজেরা যতটা খাই, ইষ্টের জন্য ততটা যদি না দিই, তবে তো আমরা অপরাধী হব,—এ কপটতায় লাভ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'যেন ভুলে না যাই/বেদনা পাই/শয়নে স্বপনে। তোমায় আমার হয়নি পাওয়া/সে কথা রয় মনে।' তুমি যখন বাচ্চা ছিলে মা-বাবা তোমার জন্য কত করেছেন, তুমি আর কতটুকু করতে পেরেছ। যা হোক, আমরা যদি কাউতে concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'তে চাই, তবে তার জন্য আমাদের করা লাগে। এবং কিছু করলেও আরও করতে পারছি না ব'লে বেদনা থাকাই লাগে। এই আকুতিতেই তখন তুমি যেখানে যা' পাবে তাকে তা' দিয়ে তৃপ্তি পেতে চেষ্টা করবে। একটা ফুল পাও, ফল পাও, আগ্রহ-আবেগভরে তাই তাকে নিবেদন করবে। আদত কথা হল—ভোজ্য দেওয়া। Sincere (আন্তরিক) হ'লেই আশানুরূপ না দিতে পারলে বেদনা লাগবেই, আর বেদনা না পাওয়ার জন্যই তখন আরও বাড়াতে থাকবে, আরও দিতে থাকবে। এতেই বাড়বে যোগ্যতা।

আগ্রহটাই বড় কথা। এই আগ্রহদীপ্ত সেবার ভিতর-দিয়ে মানুষের অনুরাগ বাড়ে। আর অনুরাগ বিনা সব ব্যর্থ। আহার্য্যানুপাতিক দিতে পারছি না ব'লে ঐ অজুহাতেই কিছু না দেওয়ার চাইতে দুটো হ্যালেঞ্চা বা কলমী দেওয়াও কত ভাল। এই রকম খুঁদ-কুঁড়ো যা' জোটে সেই দেওয়ার মধ্য-দিয়েই কতজনে অভাবনীয়ভাবে বেঁচে গেছে। তাঁকে আরও-আরও দেবার জন্য যদি মনে একটা আকুতি না থাকে তাহ'লে evolution (বিবর্ত্তন) হয় না। Evolution (বিবর্ত্তন)-এর মূলেই থাকে অমনতর আগ্রহ ও বেদনা। ঐ বেদনাই তাকে বাড়তির পথে নিয়ে যায়।

উক্ত দাদা—যারা সামর্থ্য সত্ত্বেও ইষ্টভৃতি বাড়ায় না, তাদের কি ক্ষতি হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করতে-করতেই বাড়াবার বুদ্ধি আসে। বলে—'habit is the second nature' (অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব)। এক ফকির গিয়েছিল এক বাড়িতে ভিক্ষা করতে, কিছুই দেয় না, বার-বার চাইতে-চাইতে গৃহিণী বিরক্ত হ'য়ে শেষটা একমুঠো ছাই দিল। তা' পেয়েই ফকির বলল—'এও ভাল, হাত আসুক'।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি বাণী দিলেন। মাঝখানে একবার বললেন—আমার লেখাগুলির ভিতর কেবল আছে কর্ম্মের কথা—কর্ম্ম, ব্যবহার, আচার, আদর্শ—এই নিয়েই সব কথা।

৪ঠা ভাদ্র, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ২১।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), যতীনদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সুরেনদা (বিশ্বাস), হরেনদা (বসু), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বেকুব না হ'লে মানুষ ক্ষুদ্রস্বার্থী হ'তে পারে না। মানুষ যত সঙ্কীর্ণ, আত্মস্বার্থী হয়, ততই তার স্বার্থ ব্যাহত হয়।

কেষ্টদা—বীজোৎকর্ষে ও তপ-প্রভাবে, এই দুইভাবে নাকি মানুষ বড় হয়। বীজোৎকর্ষ যদি খুব নাও থাকে, তবু তপস্যা ক'রেও তো মানুষ যথেষ্ট উন্নত হ'তে পারে। তাও তো তেমন সচরাচর দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিকমত তপস্যা করতে গেলে concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া লাগে। অবশ্য, তপস্যা করতে-করতেও মানুষ concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়।

সময়মত কাজ না করলে কী হয়, সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সময়মত কাজ না করতে-করতে, তখন যত প্রয়োজনই হোক না কেন, চেষ্টা ক'রেও যখন যেটা প্রয়োজন, তখন মানুষ সেটা করতে পারে না। হয়তো দেখা যাবে সময় উত্তীর্ণ হবার পর সে কাজ সমাধা করতে পারল। এই দোষ হয়েছে সবার।

কেষ্টদা—কোনও দায়িত্ব না-নেওয়া বা কথা না-দেওয়াই তো সবচেয়ে ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু না করলে nerve (স্নায়ু)-গুলি অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে।

কেষ্টদা—নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিই যদি হয়, সেই তো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজ না করা নৈষ্কর্ম্য মানে কী বুঝি না। ঈশোপনিষদের কথাটাই ভাল লাগে।

কেষ্টদা—'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমা। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥' (যে ব্যক্তি এই জগতে শত বৎসর বাঁচিতে উৎসুক, তিনি

কর্ম্ম করিয়াই বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেন। এই প্রকার নরাভিমানী তোমার পক্ষে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই যাহাতে তোমাতে অশুভ কর্ম্ম লিপ্ত না হইতে পারে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—হ্যাঁ! আরও কী আছে তো—'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।' (অবিদ্যা-জ্ঞানের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া পরাবিদ্যার দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন)।

এরপর এই বিষয় অবলম্বন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় এসে বসলেন। মায়া মাসিমা, কালিদাসীমা, সরোজিনীমা, মঙ্গলামা, সুধাপাণিমা, রমণদার মা প্রমুখ উপস্থিত।

পরকীয়া প্রীতির নাম ক'রে দুষ্ট মানুষ কেমন ক'রে মেয়ে ভুলিয়ে এনে তাদের সর্ব্বনাশ করে, তাদের নিয়ে বৈরাগী-বোষ্টম সাজে এবং তারা মহোৎসবে যেয়ে কেমন ক'রে হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে মাজা দুলিয়ে নাচে আবার গাঁজা খায়—শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং তা' হুবহু অভিনয় ক'রে দেখালেন। এ-সব দেখে মায়েদের মধ্যে খুব হাসির হুল্লোড় প'ড়ে গেল।

হরিপদদা (সাহা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুখ বুজে হাসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিপদদার দিকে চেয়ে বললেন—ও তো সাধু মানুষ, ও এ-সব ব্যাপার বোঝেই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায়। পূজনীয় বড়দাসহ কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু) এবং যতিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কথাচ্ছলে পদ্মার কুমীরের কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যতবার আমি কুমীরের সম্মুখীন হয়েছি, আগে থাকতেই আমার মনে কেমন সন্দেহ হয়েছে, এখানে বোধহয় কুমীর আছে।

কথায়-কথায় বড়দা বললেন—বাইরে থেকে এখানে মানুষ আসলে স্থানীয় অনেকে তাদের কাছে ভিক্ষার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে সেবা দিয়ে প্রীত ক'রে নিতে জানে না, এটা একটা disqualification (অবগুণ)।

তারপর বড়দাকে বললেন—তুই এদিকে লক্ষ্য রাখিস।

৫ই ভাদ্র, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ২২।৮।১৯৫০)

বেলা গোটা দশেকের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্রশয্যায় ব'সে

আছেন। সুশীলদা (বসু), চুনীদা (রায়চৌধুরী), পণ্ডিতভাই (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্ল এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত।

আহার ও প্রজনন সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—পুষ্টিকর খাদ্য যথেষ্ট মাত্রায় খাওয়া না হলে এবং পেটে কিছু-কিছু ক্ষিধে থাকলে endocrene secretion (শরীরের আভ্যন্তরীণ গ্রন্থির ক্ষরণ) বেশি হয়। এই ক্ষরণ যত বাড়ে sexual excitement (কামোদ্দীপনা) তত বাড়ে। এর দরুন এবং দারিদ্র্যের নিষ্পেষণের মধ্যেও সত্তার প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য মানুষ বংশবিস্তার ক'রে সন্তান-সন্ততির ভিতর-দিয়ে বাঁচতে চায়। তাই সাধারণতঃ দেখা যায় অতি দরিদ্র ঘরে সন্তান-সন্ততি বেশি হয়। আহার-সম্বন্ধে আমার মনে হয় বিহিত মাত্রায় সাত্ত্বিক আহারই ভাল। তোমরা যা' সাধারণতঃ খাও, তাই ঠিক, তবে ওর সঙ্গে একটু ক'রে দুধ খাওয়া ভাল। একেবারে অনাহারে কিন্তু endocrene secretion (শরীরের আভ্যন্তরীণ গ্রন্থির ক্ষরণ) বন্ধ হ'য়ে যায় এবং শরীরের অপুষ্টির দরুন নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়। ওতে মস্তিষ্ক শক্তিও দুর্বল হ'য়ে পড়ে। তাই সাধারণতঃ সব ব্যাপারে মধ্যপন্থাই শ্রেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। আজ খুব বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। যতিবৃন্দ উপস্থিত আছেন। কুষ্ঠিয়া থেকে সত্যদা (দত্ত) এসেছেন বিষ্টুদাকে (বিশ্বাস) সঙ্গে নিয়ে। সত্যদা সব ফেলে এসেছেন, তাই এখন কিভাবে চলবে সেই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অভয় দিয়ে বললেন—কিছু না। ভিক্ষাপাত্র আছে তো। পরমপিতার দয়ায় আমরা মানুষের অনুগ্রহভুক—প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক মানুষই তাই। তাই আমাদের পরিবেশের মানুষগুলি যদি বাঁচে ও সুস্থ-সবল থাকে এবং তাদের সঙ্গে যদি আমাদের প্রীতির সম্পর্ক থাকে, তাহ'লে আমাদের ভাবনা কী? দুঃখের বিষয়, আমরা বড় মন্থর, করি না কিছু। কলোনীটা এতদিনেও আমরা করলাম না। নিজেদের আস্তানা হ'লে অনেক সুবিধা হ'ত।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে বললেন—আগে পল্লীগ্রামে সকলে যেন একটা বন্ধনীর মধ্যে থাকত। কামারপাড়া, কুমোরপাড়া, নাপিতপাড়া, কায়স্থপাড়া —সব পাশাপাশি থাকত। এরা একাধারে ধনিক ও শ্রমিক। আবার পারস্পরিকতাও খুব ছিল। কাউকে বাদ দিয়ে কারুর চলত না। বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে এবং পরস্পরের impulse ও example-এ (সাড়া ও দৃষ্টান্তে) প্রত্যেকেই উন্নত হ'ত। এক-একটা সম্প্রদায় বা বর্ণ নিয়ে এক-একটা গ্রাম হ'লে তা' হয় না। সব বর্ণ

পাশাপাশি থাকলে পরস্পর প্রত্যেক বর্ণই inter-interested ও inter-educated (পরস্পর স্বার্থান্বিত ও পারস্পরিক প্রভাবে শিক্ষিত) হয়।

শুনেছি রানাঘাটে এক জায়গায় বহু পারশব বসিয়েছে। কিন্তু ঐভাবে পাশাপাশি সমাবেশ করেনি। ভেবেছিলাম এদের দিয়ে সেই ঐতরেয় উপনিষদের যুগ ফিরিয়ে আনব। কিন্তু তা' করতে গেলে একটা ধরন আছে, সেইভাবে সব ব্যবস্থা করা লাগে। কেমন ক'রে পল্লী গড়তে হবে, তা' আমার পল্লী-পরিকল্পনায় দেওয়া আছে।

৬ই ভাদ্র, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ২৩।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যতীনদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরিদাসদা (সিংহ), খগেনভাই (মণ্ডল), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—পৃথিবীর কোন দেশে আজ বর্ণানুগ বৃত্তি-নিরূপণ নেই। তা' যদি থাকে, তাহ'লে unemployment (বেকারত্ব) ব'লে জিনিসটা থাকতে পারে না। আমেরিকা যদিও এত ধনী, সেখানেও আজ কত বেকার। যা' বললাম, ঐ ছাড়া পথ নেই। আমি ভেবে অবাক হ'য়ে যাই, ঋষিরা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক অজস্র সমস্যার সমাধান কিভাবে করেছিলেন বর্ণাশ্রমের ভিতর-দিয়ে।

কেষ্টদা—রাজশক্তি ও সমাজশক্তির সমাবেশ না থাকলে তো এ জিনিস ফুটিয়ে তোলা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার জন্য যা' করণীয়, নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে। আমি যে কোটি-কোটি লোকের দীক্ষার কথা বলি, তার মানে আছে! সর্বসাধারণের মধ্যে আপনাদের ভাবধারা যদি চারিয়ে যায় এবং বহু এম-এল-এ, এম-পি যদি এইভাবে ভাবিত হয়, তাহ'লে রাষ্ট্রমঞ্চে বর্ণাশ্রমের বাস্তব সুফল ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করতে পারবে। নিজেদের কাগজ বের করা লাগে এবং সবরকম মাধ্যমের মধ্য-দিয়ে এটা চারান লাগে।

যতীনদা—ব্রাহ্মণের মোক্তা লক্ষণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওভাবে দেওয়া সম্বন্ধে আমার একটা ভয় আছে। মনে হয়, অনেকে হয়তো তাই দেখে সেই ভান ধ'রে বামুন সাজবে আর দাবী করবে তেমনতর।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন।

৮ই ভাদ্র, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ২৫।৮।১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসেছেন। মায়েরা অনেকে আছেন।

রমণদার (সাহা) মা'র খাওয়ার কথা আলোচনা হচ্ছিল।

দুলালীমা—মানুষ যে খায়, মানুষ খায় না ভগবান খান ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ খায়।

দুলালীমা—মানুষের ভিতর তো ভগবান আছেন, তিনি খান না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে তো দিইনি।

দুলালীমা—দিইনি কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি, লোভে খাই।

দুলালীমা—আমাদের খাওয়া তাহ'লে ভগবান পান না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে যখন ভালবেসে খাওয়াই, তখন ভগবান একটু পান। যেমন প্রাণে দিই, তিনি তেমনি পান। বিশেষ ক'রে অশক্ত, ক্ষুধার্ত্ত, আপদগ্রস্ত, বিপাক-বিধ্বস্ত—এদের খাওয়ালে ভগবান খান। খাওয়ানো কেন, তাদের প্রতি যত্ন-আদর, সেবা-শুশ্রূষা—যা'ই করা হয়, সবই ভগবান পান। তাদের যোগ্যতায় যোগ্য ক'রে তুললে ভগবান আরও তৃপ্তি পান। যাকেই যোগ্য ক'রে তুলবে, ভগবান তাতেই তৃপ্ত হন।

গতকাল শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বড় বাণী দেন।

এরপর সুশীলদা (বসু) আসলেন।

সিলেট থেকে আগত একটি ব্রাহ্মণ মহিলা তাঁর মেয়ে নিয়ে কিছুদিন ধ'রে এখানে আছেন। মেয়েটিকে হরেনদার (বসু) বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। আর, ব্রাহ্মণ মহিলাটির একজন অদীক্ষিত ভদ্রলোকের বাড়ি থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই মা আজ সেখানে গেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন—ঐ মাটিকে যে রাখতে পারলাম না, তাতে বড় কষ্ট লাগছে। মা যখন চ'লে গেল, হরেন সামনে যাচ্ছে, মেয়েটি মার পিছনে-পিছনে যেতে লাগল। দেখে আমার মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল। মনে হ'ল ফিরিয়ে আনি। কিন্তু আমিও তো কোন ব্যবস্থা করতে পারছি না। ভাবছি কেউ যদি ফিরিয়ে আনতো, ভাল হতো। এই যে গেল কাজের contract (চুক্তি) ক'রে, এটা বড়ই বেদনাদায়ক। এতে চাকরানীর মতো জীবন হ'য়ে যাবে। যারা এইভাবে অভ্যস্ত নয়, তাদের হঠাৎ এই অবস্থার মধ্যে পড়লে, খাপ খাইয়ে নেওয়া বড় কষ্ট হয়। এখানে থাকলেই ভাল ছিল। বাইরের লোকের

চক্ষু তো আলাদা। আমাদের মধ্যে যদি একটা কুকুরের কাছেও থাকত, তাও ভাল ছিল, তারও চোখ অন্যরকম।

আমাদের একসময় অতি দুঃস্থ অবস্থা ছিল। মাকে তখন কত কষ্ট করতে হয়েছে। শ্যাম চৌধুরীর বাড়িতে কত সেবা দিয়েছেন। আজ ঐ মা'র যাওয়া দেখে আমার সেইসব দিনের কথাই চোখে ভেসে উঠছে।

দুলালীমা—বামুন যদি কায়স্থর এ'টো ধোয়, তাতে কি অন্যায় হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বামুনের ওতে জাত যায় না। ন্যায়পথে সে সবার জন্য সব করতে পারে, তার তাতে আসে যায় না। কায়স্থ যদি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তোমাকে দিয়ে ঐ-সব কাজ করায়, তার অন্যায় হবে। আবার, তুমি পয়সা নিয়ে যদি কর, তবে খারাপ হবে। তোমার মা যে তোমার জন্য কত করেছে, তা' কি পয়সা নিয়েছে? শচীনদা (গাঙ্গুলী) আছে, শচীনদার বাড়ির মা আছে, তারা যদি একজন মুদ্দোফরাসের বাড়ি গিয়ে সেবাবুদ্ধি নিয়ে, তার গু-মুত ধুয়ে তার বাসন পর্যন্ত যদি মেজে দিয়ে আসে—বিশেষ প্রয়োজন হলে—তাতে কোন বাধা নেই। সেটা তাদের বরং মহত্ত্বের পরিচায়ক হবে। কিন্তু পয়সা নিয়ে যদি ঐ-সব করে, তবে পাতিত্য এসে যাবে। নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সব করা যায়।

সুশীলদা—সেবার বিনিময়ে সে যদি উপঢৌকন কিছু দেয়, তা' কি নেওয়া খারাপ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর প্রতিদান হিসাবে যদি দিতে চায়, তবে ভাগায়ে দেবে। বলবে—'নিকালো হিঁয়াসে, তোমার জন্য করেছি, করার দাম দিতে এসেছ?' অবশ্য, সে কৃতার্থ হ'য়ে প্রীতি-অবদান যদি কিছু দেয়, এবং না নিলে ব্যথিত হয়, তেমন ক্ষেত্রে নেওয়া চলে। আনন্দের সঙ্গে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে প্রণামী হিসেবে দিলে নেওয়া যায়। মোটপর, সেবা বিক্রয় জিনিসটা ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর একটি বাণী দিলেন।

কিছু সময় পরে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে আসলেন। তিনি যতীনদাকে বললেন—বড়াল-বাংলোর মধ্যে অজয়ের জন্য যদি একটা ঘর তুলে দেন, তাহ'লে তার কাজের সুবিধা হয়।

যতীনদা—এখানে বসে টাকাপয়সা যোগাড় করা তো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথায় ঠিক পান না, কিন্তু এই ঘাসের মধ্যেও পয়সা আছে।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—একটা কথা বলতে গেলে অনেক দূর হিসাব ক'রে বলতে হয়। যতদূর যতভাবেই গড়াক না কেন, যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেই ভাবেই বলি। ঐভাবে রূপ ধ'রে যখন word (কথা) আসে, তখনই dictation

(বাণী) আসে, তখনই বলা যায়। বলতে গিয়ে তার আবার এক-আধটু ব্যত্যয় হয়তো হয়।

পরে কথাপ্রসঙ্গে প্রফুল্ল বলল—ননীদি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে আমার মা-ই আমার মেয়ে হ'য়ে এসেছেন। আমিও প্রথম যখন দেখি, দেখা মাত্র ঐ-রকম impulse (সাড়া) পেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হতে পারে, তুই তো বেঁচে গেছিস, তোর কপাল খুলে গেছে। এখন এইটে পাকাভাবে বিশ্বাস ক'রে নিতে পারিস, তাহ'লে হয়। আমি মুষোক-পালে, আমার কি আর তা' হবার জো আছে। জাতিস্মর শান্তির মতো ঐভাবে মাকে পেতাম, আগের কথা-টথা সব বলতে পারত, তাহ'লে আমি শরীরে জোর পেতাম, মনে জোর পেতাম, মাথায় জোর পেতাম, আমার একটা উপায় হ'ত, আমি অন্য মানুষ হ'য়ে যেতাম।

প্রফুল্ল—যদিও ঐভাবে মনে হয়, তবুও critically analysis করার (খুঁটিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার) প্রবৃত্তি হয়, আর তাতে সন্দেহ আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে লাভ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। পূজনীয় বড়দা, যতিবৃন্দ এবং কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ভুপেনদা (দাশগুপ্ত), গোবর্দ্ধনভাই প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে প্রফুল্ল কয়েকটি বাণী প'ড়ে শোনাল। একটা বাণী প্রসঙ্গে ভুপেনদা জিজ্ঞাসা করলেন—প্রত্যেকটা মানুষকে কি ফুল্ল করা যায় ? কেউ নিজে থেকেই যদি বিরক্তিকর ব্যবহার করে, সেখানে আমরা কী করতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে যদি exalt (উন্নীত) করতে না পারি, তাকে active (সক্রিয়) করতে পারব না exaltingly (উন্নতভাবে)। মানুষের খারাপ ব্যবহার দেখেই যদি মন খিঁচড়ে যায়, তাহ'লে তাকে হারাব। ঐ অবস্থায়ও যদি তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করি, কোন্ মুহূর্ত্তে তার ভিতর পরিবর্ত্তন আসতে পারে তার ঠিক কি ?

ভুপেনদা—মানুষকে ভাল করতে গেলে কিভাবে চলা লাগে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম জিনিস হ'ল যে যেমনই হোক, তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ব্যবহার করা। তোমার ব্যবহার এমন হওয়া চাই, যাতে সে তোমাকে শ্রদ্ধা ক'রে সুখী হয়।

ভুপেনদা—ছাত্রদের নিয়ন্ত্রিত করতে গেলে শিক্ষকের কিভাবে চলতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার আচার-ব্যবহার, চলন-চরিত্র, কথা-কাজ এমনতর charming (মনোমুগ্ধকর) হওয়া চাই, যাতে তোমাকে দেখে ছাত্র শ্রদ্ধাপরায়ণ হ'তে শেখে। তোমার পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুজনের প্রতি সক্রিয় সেবা-সম্ভ্রম ইত্যাদির অভিব্যক্তি

যত তারা দেখতে পায়, ততই ভাল। আমাদের এখানে যেমন অনেকে আসে, কিন্তু এরা বসতেই বলে না। কিন্তু তোমার কাছে একটা মানুষ আসা মাত্রই যদি তুমি তাকে আদর-আপ্যায়িত ক'রে ডেকে বসাও এবং যদি তাকে জিজ্ঞাসা কর আপনি তামাক খান? ভদ্রলোক ঘাড় নাড়তেই তুমি নিজে যদি তামাক সেজে দেও, আপন-জনের মতো ব্যবহার কর, তাহ'লে তাকে তুমি অনেকখানি আপন ক'রে পাবে। তোমার প্রাণস্পর্শী ব্যবহারের ফলে সে তখন তোমার কথা শুনবে। তোমার আপন হ'য়ে যাবে। মানুষ বেশী কিছু চায় না, চায় একটু ভালবাসা। কিন্তু সেই চাওয়ার পরিবেশনটা কায়দামতন হওয়া চাই। এইসব শীল ও সৌজন্য তোমার মধ্যে বাস্তবে ফুটে ওঠা চাই। ছাত্ররা যদি দেখতে পায় যে, তুমি সবার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ তাহ'লে তারাও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে। ছাত্রদের সঙ্গে সম্ভ্রান্ত দূরত্ব যত বজায় থাকে, ততই ভাল। আর নিজে যত concentric (সুকেন্দ্রিক) হবে, তাদের তত প্রভাবান্বিত করতে পারবে। তা' বাদ দিয়ে যত ভাল ব্যবহারই কর, তাতে তারা তোমাকে একজন ভাল মানুষ বলবে, কিন্তু তাদের কোন সত্যিকার মঙ্গল তুমি করতে পারবে না।

ভূপেনদা—পড়ার কোন বিষয় যদি ভাবধারার বিরুদ্ধে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোচড় দিয়ে তোমার favour-এ (অনুকূলে) নিয়ে আসা লাগবে। নিন্দা করতে গেলেও কায়দা ক'রে করা লাগবে, যাতে তোমার অশ্রদ্ধা প্রকাশ না পায়, অথচ ছাত্রেরা ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

ভূপেনদা—যেমন আছে রবীন্দ্রনাথের 'দুর্ভাগা দেশে'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইভাবে বলা লাগে, আমরা আপনাদের জন্য যা' করার তা' করিনি, এই হয়েছে আমাদের অপরাধ। কিন্তু আমাদের মধ্যে কারুর প্রতি ঘৃণা ছিল না এবং ছোটকে বড় করার বুদ্ধি ছিল। বড়কে ছোট করার বুদ্ধি আমরা কখনও প্রশ্রয় দিই নি। আমরা চাই যাতে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করতে পারে এবং কোনও শূদ্র যদি ব্রহ্ম হয়, সেও কিন্তু বিপ্রের গুরু হতে পারে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিলেন।

৯ই ভাদ্র, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ২৬।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে ব'সে আছেন। ভূপেনদা (দাশগুপ্ত), হাউজারম্যানদা, পণ্ডিতভাই, প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা দশটার পর একটি বাণী দিলেন। তারপর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ব্রাহ্ম ও প্রটেস্ট্যাণ্টরা ল্যেজা-মুড়ো বাদ দিয়ে ধর্ম্মের পরিবেশন করতে যেয়ে বহু

বিকৃতির সৃষ্টি করেছে। অনুষ্ঠান ছাড়া principle (নীতি)-গুলি maintained (সুরক্ষিত) হয় না। অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি বা কমতি ভাল না। অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে will (ইচ্ছাশক্তি) grow করে (বাড়ে)। Will-এর (ইচ্ছাশক্তির) ভিতর-দিয়ে আবার activity (কর্ম্ম) grow করে (বৃদ্ধি পায়)।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর এ-সম্বন্ধে একটি বাণী দিলেন।

আজ রমণদার (সাহা) মা'র জন্য আতরসিক্ত আলুর পোলাও, কুমড়ো ফুলের কালিয়া, ভাতের চপ, ভাজাভুজি, চাটনি ইত্যাদির ব্যবস্থা হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর রোজই তাকে রকমারি উপাদেয় খাদ্যাদি খাওয়ান আর বলেন, ওকে দেখলেই আমার খাওয়াতে ইচ্ছে করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), যতিবৃন্দ প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—আমার ভাষাটা কেমন জানি। লেখাপড়া জানি না, তা' জানলে বোধ হয় ভাষাটা আর একটু মার্জ্জিত হতো।

কেষ্টদা ও সুশীলদা একযোগে বললেন—লেখাপড়াজানাওয়ালাদের ছাড়িয়ে গেছে সর্বদিক দিয়ে। অতিরিক্ত মার্জ্জিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবটার connection (যোগসূত্র) পরপর ঠিক ক'রে দিতে গিয়ে mechanism (মরকোচ) unfold (ব্যক্ত) ক'রে দিতে গিয়ে ভাষাটা বোধহয় ঐ রকম হ'য়ে যায়।

১০ই ভাদ্র, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ২৭।৮।১৯৫০)

আজ কদিন ধরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মাজায় ব্যথা। তৎসত্ত্বেও তিনি নিত্যই কিছু-কিছু বাণী দিয়ে চলেছেন।

১১ই ভাদ্র, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ২৮।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে সাধনার পরিণতি সম্পর্কে একটি বাণী দিলেন। বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর অনুভূতিবান মানুষের লক্ষণ-সম্পর্কে সুশীলদার (বসু) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের প্রজ্ঞা ভূমায়িত হ'য়ে উঠলে সবাইকে ভূমা সত্তার দিকে উত্তোলিত করাই তার বৃদ্ধি হ'য়ে ওঠে। সেই বৃদ্ধি, সেই চালচলন, সেই activity (কর্ম্ম), সেই tactics (কৌশল) নিয়েই সে চলে।

১২ই ভাদ্র, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ২৯।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে। তাঁর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। তৎসত্ত্বেও তিনি বেলা আটটার সময় একটি বাণী দিলেন।

কালিষষ্ঠীমা তার জামাতা সম্পর্কে এসে বললেন—তার জন্য যত যাই করা যাক না কেন, সে কিছুতেই খুশী হয় না। প্রত্যেকটায় তার অভিযোগ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার প্রতি একটা সম্ভ্রম যদি না থাকে, তার উন্নতি করতে পারবে না। তাই সম্ভ্রম ও সমীহ যাতে থাকে, তেমনভাবে ব্যবহার করা লাগে। কতকগুলি কথা বললেই হয় না। আর স্নেহপ্রীতি যতই থাক তার সঙ্গে একটু শাসন না থাকলে মানুষের ভাল করা যায় না।

Practical কাজ (হাতের কাজ) শেখা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর খোকাকে (সাহা, কালিষষ্ঠীমার পুত্র) বললেন—যা' শিখবি, thoroughly (পুরোপুরি) শিখবি। অজয়ের মত মাস্টার পেয়েছিস, এখন যদি সব তাড়াতাড়ি ভাল ক'রে না শিখে নিস্ তো হবে না। নইলে হয়তো চল্লিশ বছর ধরে ফাইলিং করে যারা তাদের মতো অবস্থা হবে। একজন হয়তো ত্রিশ বছর ধরে ভাইসম্যানের কাজ করে, আর কোন কাজ জানে না। একটা সুঁচ করতে দিলে পারবে না। সব যোগাড়যন্ত্র ক'রে হাতের কাছে রকমারি জিনিস এনে দিয়ে জায়গা মতো বসিয়ে দিলে, সে শুধু আংশিক একটুখানি কাজ করতে পারে। এমনকি সংশ্লিষ্ট অন্য কাজ সম্বন্ধেও তার কোন অভিজ্ঞতা থাকবে না। অনেকের এমন আছে যে, যে-জায়গায় বসে কাজ করছে তার আশপাশের লোকগুলি কী করছে, সে সম্বন্ধেও তার কোন অনুসন্ধিৎসা থাকে না এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যা' কারখানার কাজে সর্বদা লাগে, তা' সংগ্রহ ও সমাবেশ করতে শেখে না। আমাদের বর্ণাশ্রম ও পূর্বকালীন শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে এমন ছিল না। তারা যা' শিখত পুরোপুরি শিখত এবং অনেক যন্ত্রপাতির অভাব সত্ত্বেও নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্যে, অসুবিধার মধ্যে পরিবেশ থেকে নানান জিনিস যোগাড়যন্ত্র ক'রে কিভাবে, কোথায়, কেমন ক'রে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্য্য সমাধা করতে হয়, তা' তারা জানত। এতে একঘেয়েমী থাকত না, আর উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃজনী প্রতিভাও জাগ্রত হত।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বাণী দিলেন।

১৩ই ভাদ্র, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ৩০।৮।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় আছেন। কান্তিদার (বিশ্বাস)

সঙ্গে বনগাঁ থেকে কয়েকজন দাদা এসেছেন। তাঁরা এবং ভগীরথদা (সরকার), উমাদা (বাগচী), ঈষদাদা (বিশ্বাস), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

বনগাঁর এক দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম করবি আর স্ফূর্ত্তি ক'রে কাম করবি।

উক্ত দাদা—পরিবারে খুব অশান্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তি ক'রে ফেল। বাধালেই বেধে যায়। কথায় বলে বোবার শত্রু নেই। Unprofitable (অলাভজনকভাবে) কথা বাড়াতে নেই।

উক্ত দাদা—গোলমাল যেন এড়ানো যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি মারা পড়ার মতো অবস্থা হোস, তেমন অবস্থায় ছাড়া কথা কইতে কিংবা ফোঁস করতে যাবি না। Ignore (উপেক্ষা) ক'রে চলাই ভাল।

একটি দাদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর একটা কাজের কথা বলায় তিনি বললেন—আপনি শক্তি দিলে পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শক্তি আছেই। নিষ্ঠার যার যত বেগ, শক্তিও তার তত বেশী। অচ্যুত বেগবতী নিষ্ঠা শক্তির আধার।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন।

প্রফুল্ল—শুনেছি ভালবাসায় মানুষের জীবনীশক্তি বাড়ে, সব রকম ভালবাসায় কি এটা হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব ভালবাসায় জীবনীশক্তি বা আয়ু বাড়ে না। জীবনীশক্তি বাড়ে সেই ভালবাসায় যাতে co-hesive urge (সুসংসক্ত হওয়ার শক্তি) অক্ষুণ্ণ থাকে ও পরিপুষ্ট হয়। ঐটে হ'ল আমাদের জীবনের মূল। তাই, পূরয়মাণ আদর্শে প্রবৃত্তিভেদী টান লাগে। প্রবৃত্তি-ছাপানো টান না হ'লে co-hesive urge (সুসংসক্ত হওয়ার শক্তি) ভাঙ্গা পড়ে। অমনতর টান থাকলেও longevity (আয়ু) original potency (মৌলিক শক্তি)-র maximum limit (চরম সীমা) ছাড়িয়ে উঠতে পারে না সাধারণতঃ। তবে লাভ হয় এই যে, তার আর অযথা খরচ হয় না। যা' হোক, এই বেগবতী ভালবাসা ছাড়া মানুষের agility (তরতরে ভাব), activity (কর্ম্মশক্তি) ও vital flow (জীবনীয় সম্বেগ) বাড়ে না। বহু লোকের ভালবাসা এত নিথর যে তার মধ্যে যেন কোন গতি, প্রাণ বা বেগ নাই, তা' মানুষকে সার্থক করে না। তারা profitable (লাভের অধিকারী) হয়ও না, করতেও পারে না কাউকে। উপচয়ী অর্জ্জী হওয়া তাদের পক্ষে দুরূহ। তাই আমাদের অনেকের সব-কিছুই losing concern (লোকসানের কারবার)। একজন হয়তো একশ টাকা খরচ ক'রে আধ তোলা বংশলোচন কবিরাজী ঔষধ নিয়ে আসলো।

তাই, যেমন actively (সক্রিয়ভাবে) concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া লাগে, তেমনি complex (প্রবৃত্তি) মুক্ত থাকা লাগে। রাগ-দ্বেষ কোনটাই ভাল না। এগুলির above-এ (ঊর্দ্ধে) থাকা লাগে। complex (প্রবৃত্তি)গুলি আমাদের vital flow (জীবনীয় সম্বেগ) থেকে শক্তি সংগ্রহ ক'রে তবে যা কিছু করে। complex (প্রবৃত্তি) মাত্রই জীবনের অপব্যয় করে, অবশ্য যদি তা' সত্তাসম্বর্দ্ধনী না হয়। তাই ওতে আয়ু বাড়বে কি ক'রে?

আজকাল রোজই রমণদার (সাহা) মাকে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব খাওয়ান। কথায়-কথায় শৈলমা, কালিষষ্ঠীমা, হেমপ্রভামা প্রভৃতির সাথে তার ঝগড়া বেধে যায়। ঝগড়ার ক্ষেত্রে যাতে কেউ কাউকে অভিশাপ না দেয়, ভগবানের নামে দিব্যি না করে, এবং সন্তান ও পিতৃপুরুষ তুলে গালাগালি না দেয়, এইসব সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। কিন্তু রমণদার মা প্রতিদিনই সেই নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করেন। তার দরুন ঝগড়া আরো উত্তাল হ'য়ে ওঠে। রমণদার মাকে যত বারণ করা যায়, ততই তিনি সেই নির্দ্দেশ অমান্য ক'রে চলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলছিলেন—আমার বোধহয় কেমন একটা ছেলেমানুষি আছে। এইসব ব্যাপার আমার ভাল লাগে।

প্রফুল্ল—লগ্নে বুধ থাকলে নাকি আজীবন শিশুসুলভ চপলতা থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি তো তাই।......আমি দেখি বহু মানুষ কথাই কইতে জানে না, মাথায় বুদ্ধিই নেই। কোন্ কথার পৃষ্ঠে কোন্ কথা বলতে হয়, বোঝে না। কিসে কী প্রশমিত হয়, তাও ঠাওর পায় না। এই যে বোধ-বিবেচনাহীন নিরেট ধার্ম্মিকতা, তার চাইতে মনে হয় ঝগড়াঝাটিও ভাল, যদি তার ভিতর-দিয়ে ঠেলায় প'ড়ে মাথা খোলে, বোধ বাড়ে, নিয়ন্ত্রণশক্তি তরতরে ও তুখোড় হ'য়ে ওঠে। অবশ্য, অনুরাগ যদি একটু থাকে, তাহ'লেই হয়তো এর ভিতর-দিয়ে কিছু হ'তে পারে। নইলে কোন-কোন মানুষ হয়তো ছিটকে পড়তে পারে।

১৫ই ভাদ্র, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১।৯।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে আছেন। কতিপয় দাদা ও মা উপস্থিত।

বেলা আটটার সময় একটি বাণী দিয়ে তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—একটা টাকা মানে তদনুপাতিক urge (আকুতি) ও energy (শক্তি)-র খরচ।

এসেছে। সুশীলদা পড়ছেন। ওতে যে-সব কথা আছে সুশীলদা আমাকে বলছিলেন। আমি দেখলাম, আমার ও-সব কথা বলা আছে। আমি যা-কিছু দিয়েছি, সব experience (অভিজ্ঞতা)-এর উপর দাঁড়িয়ে। Experience (অভিজ্ঞতা) বাদ দিয়ে কিছু বলিনি। যদি কোথাও কিছু inference (অনুমান) থাকে, তাও ঐ experience (অভিজ্ঞতা)-এর উপর দাঁড়িয়ে।

প্যারীদা (নন্দী) বললেন—আমার দায়িত্বে দুই-একজনের অল্প-স্বল্প টাকা রায় কোম্পানিতে (ওষুধের দোকান) বাকি আছে। তার দরুন তারা ভগীরথকে অনেক কথা শুনিয়ে দিয়েছে। ভগীরথও আবার তেমন কথা কইতে পারে না, তাই নির্ব্বিবাদে সব শুনে এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারও অনুপস্থিতিতে কেউ যে তার উপস্থাপক হবে, তাকে represent করবে (তার প্রতিনিধিত্ব করবে), সেই জিনিসটাই তোমাদের মধ্যে দেখি না, তা' তোমরা পার না। ভগীরথ ইচ্ছে করলেই ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারত।—ক'টা টাকা বাকি আছে, সেই কথা তারা বড় ক'রে বলছে ; কিন্তু তোমার হাত দিয়ে তারা কিন্তু হাজার-হাজার টাকা পেয়েছে। তবে তোমাকেও বলি, যদি কেউ তোমার সুপারিশে অল্প-স্বল্প টাকার ওষুধ বাকি এনে থাকে, বিশেষ ক'রে তারা যদি কোন ওয়াদা দিয়ে থাকে, তারা তাদের কথা পালন না করলেও, তোমার নিজ দায়িত্বে তাদের দেনা পরিশোধ ক'রে দেওয়া ভাল ছিল। তোমার মতো মানুষকে কেউ কিছু বললে আমার খুব লাগে। কারণ, তুমি মানুষকে দিতেই ভালবাস, অপরের কাছ থেকে নেওয়ার বুদ্ধি তোমার খুব কম। তবে একটা কথা শোন, তুমি যদি কারও কোনও টাকার দায়িত্ব নেও, সেটা তোমার নিজের জমাখরচের খাতায় লিখে রেখ। নইলে মানুষ ভুলে যায়। জমাখরচ দেখলে কথাগুলি মনে পড়ে এবং দরকার মতো অন্যকেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়। একান্তই যদি কেউ নিজের দায়িত্ব পালন না করে, সেখানে নিজের গাঁট থেকে গচ্চা দেওয়া ছাড়া উপায় কী? তোমরা আমার সঙ্গে, সৎসঙ্গের সঙ্গে জড়ান, তাই তোমাদের খুব হিসেব ক'রে চলা লাগে। যাতে তোমাদের সামান্যতম ত্রুটির দরুন এখানকার কেউ বদনাম করতে না পারে। তোমাদের যদি শত-শত সদ্গুণ থাকে, তার জন্য তোমরা প্রশংসা পাবে কম, কিন্তু অল্প একটু ভুল থাকলে, তাই মানুষের মধ্যে চাউর হবে বেশি ক'রে। কোন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকলে অনেক হিসাব ক'রে চলা লাগে।

১৬ই ভাদ্র, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ২।৯।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), কেষ্টদা

(ভট্টাচার্য্য), সত্যদা (দত্ত), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর এখনও খারাপ। গলায় কষ্ট আছে। তিনি ঠাকুর-পরিবারের মেয়েদের জন্য হরিদাসদাকে পাত্র দেখার কথা বললেন। তারপর প্রসঙ্গতঃ তাঁকে বললেন—মানুষের জীবনে যদি একটা মুখ্য মানুষ না থাকে, সে জীবন ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে। গুরু, বাপ-মা, বড় ভাই—যেই হোক, শ্রেষ্ঠ কাউকে যদি মানা না থাকে এবং কেউ যদি উচ্ছৃংখলভাবে নিজের খেয়ালেই চলে, সে কখনও সার্থক হ'তে পারে না। আমার ভাইদের দায়িত্ব আমার উপর, কিন্তু আমার সঙ্গে তাদের ভালবাসার যোগসূত্র খুবই কম।

নির্ম্মল ঘোষদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—ঋত্বিকের চাই চরিত্র। চরিত্র না থাকলে কিছু থাকে না। পুরোহিতের আগে কত সম্মান ছিল। চরিত্রের খাঁকতিতেই তা' গেছে। চরিত্র ভাঙ্গারেই তো মানুষ খায়, তা না হ'লে আর কী দিয়ে খায়। চরিত্রই তো capital (মূলধন)।

সত্যদা—ক্ষত্রিয়ের তো বামুনকে ভাত খেতে দেওয়া উচিত না। আমরা ইষ্টকে নিবেদন ক'রে খাই, তা' কি ঠিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টকে নিবেদন করায় বাধা কি ? সেটা তো তিনি গ্রহণ করছেন সূক্ষ্মভাবে। আপনি যদি ক্ষত্রিয় হ'য়ে বামুনের বৈশিষ্ট্য অবদলন করেন, তাতে তার যা' ক্ষতি হোক বা না হোক—সে অবদলন আপনাকে স্পর্শ করবেই। সব বেড়া দেওয়া আছে। একটা বেড়া ভাঙলে সকলেরই ক্ষতি। আমাদের সম্বর্দ্ধনী বৈশিষ্ট্যচলন যদি বজায় রাখা যায়, তাহ'লে একেবারে অচ্ছেদ্য অটুট জিনিস হ'য়ে দাঁড়ায়। আপনি যা'ই খান, তাইতো আপনার অন্তর্নিহিত ইষ্টের খাওয়া হয়। কারণ, তিনিই আপনার আত্মাস্বরূপ, তাই তাঁকে নিবেদন করায় দোষ নেই। এটা করতে হয় অনুরাগের সঙ্গে।

একটা আছে আপনার ব্যষ্টিদেহ, আর একটা আছে সমগ্র সমাজকে নিয়ে, মনুষ্য-জাতিকে নিয়ে সমষ্টি-দেহ। সমষ্টি-দেহকে যদি অবজ্ঞা করেন, সমষ্টি-দেহের প্রতীক-স্বরূপ ইষ্টকে যদি আপনি অবজ্ঞা করেন, তাহ'লে কিন্তু আপনার ব্যষ্টি-দেহ টিকবে না।

আপনার সম্মান বজায় রাখতে গেলে অন্যের সম্মান বজায় রাখতে হবে। অন্যের সম্মান যদি এক সরষে ভাঙেন, আপন সম্মান কুড়ি সরষে পরিমাণ ভাঙা প'ড়বে। আমরা ভাবি একজনকে খাটো ক'রে আমরা বুঝি বড় হ'লাম। কিন্তু অন্যে যদি বড় না হয়, বড় না থাকে, আমার বড়ত্ব দাঁড়ায় কোথায় ? পারিপার্শ্বিক নিয়েই তো আমি।

কেষ্টদা শঙ্করাচার্য্য এবং অন্যান্য দার্শনিক সম্পর্কে কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি লেখাপড়া না জেনে সুবিধা হয়েছে। Fact (তথ্য)-টা সোজাসুজি বলতে পেরেছি। আর, আপনারা লেখাপড়া জেনেও না-জানা হ'য়ে আছেন, কোন ঘুলি বা আবর্ত্তের মধ্যে পড়েননি। তাই আমার জিনিসগুলি মাথায় set হয়েছে (বসেছে)—কাজে যা' করেন বা না করেন।

সত্যদা বললেন—সবই তো একব্রহ্ম বা ঈশ্বরেরই প্রকাশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের যদি বৈশিষ্ট্যর জ্ঞান না থাকে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জ্ঞান না থাকে, তাহ'লে সে ব্রহ্মজ্ঞানের কোন মানে নেই। ব্রহ্ম মানে তো সবার ভিতরের common factor (উপাদান-সামান্য), যাকে কিনা সেই universal absolute factor (বিশ্বজনীন পরম উপাদান) বলি। তা' কোথায় কিভাবে হেঁটে-চ'লে কিসের ভিতর কী mechanism (মরকোচ) নিয়ে থেকে কোন্‌ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে, তা জানা চাই। বৈশিষ্ট্যের বিশেষ জ্ঞান-সমন্বিত যে একীকৃত জ্ঞান, সেই জ্ঞানকেই কয় ব্রহ্মজ্ঞান। নচেৎ সব সমান যদি বলি, তার মানে হয় না, ওটা জ্ঞানের কথা না। কারণ, গাছের দুটো পাতাও সমান নয়, মাথার দুটো চুলও সমান নয়। সব মানুষ এক ইত্যাদি যদি বলি তার মানে—বোধ নেই। যদি আমরা একটু ব্যুৎপত্তি নিয়ে একটু conscientiously adhered (বিবেকসম্মতভাবে যুক্ত) থাকি, তবে deluded (বিভ্রান্ত) হব না কিছুতেই, বরং প্রত্যেক জিনিসকেই explain (ব্যাখ্যা) করতে পারব যে-কোন দিক দিয়ে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ৩-৫৫-তে এবং বেলা ৪-টেতে বড়াল-বাংলোর বারান্দাতে ব'সে দুটি বাণী দিলেন।

দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—আমার অনুবর্ত্তন কর, অথচ আমার প্রহার যদি সহ্য না কর, শাসন, ভর্ৎসনা যদি সইতে না চাও, আমি গাল পাড়ব, বকব, নানারকম চাপ দেব—তা' যদি বরদাস্ত করতে না পার, তাহ'লে কিন্তু ঠিকমত evolve করতে (বিবর্ত্তিত হ'তে) পারবে না। হয়তো উপরসা নামকরা লোক হ'য়ে যেতে পার, কিন্তু আদত কাজ হবে না। দায়িত্বপূর্ণ সক্রিয় সঙ্গ-সাহচর্য্য, সেবা ও অনুবর্ত্তনে যা' হয়, লাখো পড়াশুনাতেও তা' হয় না। তাই আগের কালের মানুষ অতখানি নিষ্ঠা নিয়ে গুরুসঙ্গ করত, গুরুসেবা করত, ঐটের উপরই জোর দিত বেশী।

কেমন ক'রে আমার মাথায় যেন ঢুকে গেল ঐ concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়ার কথা। আর, সেই সূত্রের উপর দাঁড়িয়েই যা কিছু লেখা দিয়েছি। এত

দিয়েছি, তার মধ্যে হয়তো এমন philosophy (দর্শন) বা মাল-মশলা থাকতে পারে, যা' হাজার বছর ধ'রে unfolded (বিকশিত) হ'য়েও শেষ হবে না। তবে একটা জিনিস আছে আমার—আমি যে কিছু জানি, এইটেই আমার মনে হয় না। নিজেকে মনে হয় বেকুব। জানার consciousness (সচেতনতা) থাকা ভাল কি ভাল না, তাও বুঝতে পারি না।

প্রফুল্ল—যেটা যত normal (স্বাভাবিক) সেটা সম্বন্ধে আমরা conscious (সচেতন) হই তত কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তা' ঠিক। আমরা যেমন চোখ দিয়ে দেখি, তবু চোখ আছে, এ-কথা মনে হয় না। চোখের কথা বা পেটের কথা বা কোন অঙ্গের কথা, বেশী ক'রে মনে হয় তখনই, যখনই সেগুলি অসুস্থ হয়।

যন্তা সুরেনদা (বিশ্বাস) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—পারশবদের মধ্যে যারাই উপবীত গ্রহণ করবে, তাদেরই যজনশীল হ'তে হবে, সাধনশীল হ'তে হবে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হবে তারা। তাদের আর সবাইকে ধর্ম্মাচরণে শিক্ষিত ক'রে তোলা লাগবে। পারশবদের মধ্যে পারশব নামে পরিচিত চণ্ডালও বহু ঢুকে গেছে। তাদের segregate (বিচ্ছিন্ন) করা লাগবে। শিয়ালী বা শ্রীপালী পারশবরাই পরিশুদ্ধ পারশব ব'লে মনে হয়; তাদের সঙ্গে যদি চণ্ডাল শ্রেণীদের বিয়ে-থাওয়া হয়, তাহ'লে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে।

পারশবদের মধ্যে corruption (বিকৃতি) অনেক কম। এরা যদি অবিহিত বিয়ে-থাওয়ায় নষ্ট হ'য়ে যায়, real (প্রকৃত) পারশবদের ভিতর যদি গলদ ঢুকে যায়, তবে সারা জাতকে বাঁচানো মুশকিল হ'য়ে পড়বে।

আর, নূতন কলোনীতে আমি চেয়েছিলাম, বিভিন্ন বর্ণের সমঞ্জসা সমাবেশ যেন হয়, তাতে পরস্পরের প্রভাবে পরস্পর educated (শিক্ষিত) হয়। তা' না হ'য়ে শুধু এক বর্ণ'ই যদি একটা জায়গা জুড়ে থাকে, তাদের মধ্যে অতখানি all-round (সর্ব্বতোমুখী) culture ও education (সংস্কৃতি ও শিক্ষা) ঢোকে না। যেভাবে বলেছি, সেইভাবে করে, তাহ'লে তো হয়।

১৭ই ভাদ্র, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ৩।৯।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকীতে এসে বসেছেন। এখনও তিনি গলায় উদ্বেগ বোধ করছেন। শরীর সুস্থ নয়। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত আছেন।

রঘুনাথপুর থেকে অন্নদাদার (হালদার) সঙ্গে কয়েকজন এসেছেন। তাঁদের

মধ্যে একজন বললেন—আমার জীবনে সহজ ভক্তি ও অনুরাগ যেন জাগে, এই আমার প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই কর, ইষ্টের প্রতি মমত্ববোধ যাতে উদগ্র হ'য়ে ওঠে, তাই কর। ইষ্টকে সবচাইতে আপন ব'লে জানতে হয়। ওতে concentration (একাগ্রতা) সহজ হ'য়ে ওঠে। ছেলেপেলের প্রতি মানুষ যেমন করে, তাদের জন্য ক্রমাগত ভাবে, বলে ও বাস্তবে করে, ইষ্টের জন্যও ঐ-রকম করা লাগে, যাতে তাঁর উপর মমতা জাগে, টান আসে। শুধু মনে-মনে ভাবলে হয় না, করা লাগে। নাম করতে হয়, কাজ করতে হয়। তাঁর স্বার্থকেই মুখ্য করতে হয়। আর, সেইদিকেই নজর রেখে চলতে হয়।

অন্নদাদা একটি দাদাকে দেখিয়ে বললেন—এই দাদাটি বলেন,—আমার বিশ্বাস হয় না, তার প্রতিকার কী? বিশ্বাস হয় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের অন্তরের সম্পদ এই আছে যে, আমরা মানুষকে ভালবাসতে পারি, শ্রদ্ধা করতে পারি। মানুষের উপর আমাদের অনুরাগ গজিয়ে তুলতে পারি—তার উপর দাঁড়িয়ে যা' হয়, তা' এমনিই হয়। ভালবাসতে-বাসতে বিশ্বাস গজিয়ে ওঠে। ভালবাসা বা বিশ্বাসের অনুশীলন করলেই তা' বেড়ে ওঠে। আমাদের নিজেদের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে সব। বউকে ভালবাসি কি ক'রে? বিশ্বাস করি কি ক'রে?

অন্নদাদা আরেকটি দাদা সম্বন্ধে বললেন—ইনি পরিবারের আর সবাইকে কিভাবে এই পথে আনবেন, তাই ভাবছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি পথে আসলেই হয়, আমার মধ্যে এ জিনিসটি চরিত্রে ফুটে ওঠা চাই। চরিত্রে যখন ফুটে বেরোয়, তখন কত লোক আসে, তখন মানুষ মনে করে—একে ভক্তি না করতে পারলে ঠ'কে যাব। মানুষের কাছে তাদের সুখ-সুবিধা, বাঁচাবাড়ার কথা বলা লাগে। নিজের জীবন দিয়ে তাদের কল্যাণের পথে আকৃষ্ট ক'রে তোলা লাগে। তুমি যদি মানুষের ভালই চাও, কুশল-কৌশলে যদি তাদের ভালর দিকেই অনুপ্রাণিত ক'রে তোল, তা'রা শুনবে না কেন?

অন্নদাদা—মানভূমে দেখলাম, ধর্ম্মভাবটা বেশ আছে। তবে গতানুগতিক প্রাণহীনরকম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করা। ওর ভিতর-দিয়ে মানুষ grow করে (বাড়ে)। আমাদের পূর্ব্বের যে জিনিষটা ছিল, সেই অনুযায়ী বর্ত্তমান পূরয়মাণ মহাপুরুষের সান্নিধ্যে সব-কিছুকে ঝালাই ক'রে প্রাণবন্ত ক'রে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করা লাগে। মুসলমান ও ইংরেজ আমল থেকে

শুরু ক'রে আমরা decultured (অপকৃষ্ট) হ'তে শুরু করেছি। নিজেদের যে কী ছিল, জানি না। তাই বৈশিষ্ট্যহারা হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের মিশনারী system (প্রথা) ছিল না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রত্যেকটি মানুষই মিশনারী (যাজক)। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি প্রত্যেকেরই করণীয়। শুধু কথায় ভালবাসলে হবে না। আমি যাকে ভালবাসি, তিনি আমার মধ্যে জীবন্ত হ'য়ে ওঠা চাই। সেই জলুস ফুটে ওঠা চাই চরিত্রের ভিতর-দিয়ে। তবেই মানুষ আমাদের কথা শুনবে। এমনি ক'রে ধর্ম্মকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলা লাগবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। যাই করি এটা বাদ দিয়ে কিছু হবে না।

আমরা টাকা-টাকা করি, কিন্তু নারায়ণ বাদ দিয়ে কি লক্ষ্মী আসে? যত আমরা ইষ্টের অনুসরণ করি, নারায়ণের অনুবর্ত্তন করি, তত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সহজ হ'য়ে ওঠে—আপনিই আসে। আর ব্যবসা, বাণিজ্য, কাজ-কর্ম্ম করি কিংবা যাই করি, সবই সৎপন্থী হ'য়ে করা লাগবে। সৎপন্থী মনে সত্তা-পন্থী, যাতে পরিবার-পরিবেশ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি, কেউ যাতে ব্যাহত না হয়।

স্মরণ রাখতে হবে, আমি বাঁচতে গেলেই আমার পারিপার্শ্বিক দরকার। মানুষ, গরু, গাছ-পালা, যা-কিছু আমার সত্তাকে পরিপোষণ দেয়, তাকেই উন্নত ক'রে তুলতে হবে। উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে, পোষণ দিতে হবে। তাই পঞ্জিকাতে দেখ, এমনকি বৃক্ষ রোপণ উৎসবের কথা পর্য্যন্ত আছে। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যানুগ পোষণ যাতে হয়, তাই ধর্ম্মের অঙ্গ। আবার, প্রবৃত্তির অধীন হলে চলবে না, সেখানেই জীবন আহত হবে।

তুমি রসগোল্লা খাও, কিন্তু রসগোল্লা যেন তোমাকে না খায়, রসগোল্লা যেন তোমার পুষ্টি যোগায়, তুমি যেন সেই লোভের খোরাক না হ'য়ে ওঠ। মোট কথা যাই বলি, যাই করি, যাই ধরি, তাই যদি ইষ্ট-স্বার্থ-পরিপূরণী না হয়, সেখানেই আমি loser (ক্ষতিগ্রস্ত) হলাম।

অন্নদাদা—বাঁচাবাড়ার আকাঙ্ক্ষাই যদি মানুষের স্বাভাবিক হয়, তবে এত প্রবৃত্তি-মুখীনতা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তি আমাদের যতই পেয়ে বসুক না কেন, সেটা যখন আমাদের সত্তাকে অবলুপ্ত করতে চায়, তখন কিন্তু বাঁচার আকুতিই প্রবল হ'য়ে ওঠে। তখন বোঝা যায় শেষ পর্য্যন্ত আমরা সত্তাকেই চাই। একজন বেশী রসগোল্লা খেয়ে যখন গুরুতর অসুস্থ হ'য়ে পড়ে, তখন ডাক্তারকে ডেকে কয়—'এইবারটি আমায় সারিয়ে তোল, আর এমন খাব না।'

আমি যখন ডাক্তারি করতাম, তখন একটা মেয়ে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে

দিয়েছিল আত্মহত্যা করবার জন্য। তাকে দেখাবার জন্য আমাকে ডাকে। আমি যেয়ে দেখলাম, বাঁচার জন্য তার কী করুণ আর্তনাদ! তখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন বাঁচতে চাচ্ছ, তবে কেন আগুন ধরিয়ে মরতে গিয়েছিলে?' সে বলল,—'ভেবেছিলাম মরাটাই ভাল, তাতেই বোধহয় সুখ পাব। কিন্তু এখন দেখছি বাঁচার ইচ্ছা আমার কত প্রবল—বাঁচতে পারলেই বেঁচে যাই।'

শ্রীশ্রীঠাকুর ২/১ মিনিট নীরব থাকার পর নিজে থেকে বললেন—'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ'—আচরণ চাই, নইলে ধর্ম্ম পরিপালন হবে না।

অন্নদাদা—মানুষ এত কষ্ট পায়, তবু ইষ্টের কথা শোনে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তি-অভিভূতি প্রবল থাকে। বাঁচার পথে না চলাটাই অসুস্থতার লক্ষণ। আমাদের মন যদি প্রবৃত্তি-অভিভুত বা অসুস্থ হয়, তার ভিতর-দিয়ে শরীরও অসুস্থ হ'য়ে ওঠে। শরীর-মনের সুকেন্দ্রিক সমঞ্জসা-সক্রিয়তাই সুস্থি, আর তাই ধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর অজয়দা (গাঙ্গুলী)-কে বললেন—তোর ছাত্রদের যদি একটু-একটু ক'রে drawing (অঙ্কন) শেখাস, তাহ'লে বেশ হয়। ধর, একটা জুতো বানাবে, আগে যদি drawing (অঙ্কন)-টা ক'রে নিতে পারে, তাহ'লে ভাল হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কতকগুলি বাণী দিলেন।

১৮ই ভাদ্র, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ৪।৯।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। প্যারীদা (নন্দী), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

প্রসঙ্গক্রমে জনার্দ্দনদা জিজ্ঞাসা করলেন—প্রতিলোম-সংমিশ্রণে হয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতে sperm (বীজ) ovum (রজ)-এর তুলনায় নিকৃষ্টতর শক্তিসম্পন্ন হওয়ায়, একধরনের atomic rupture (পারমাণবিক বিস্ফোরণ)-এর মত হয়। তার ফলে রজ-বীজের সংমিশ্রণ হলেও সন্তান পিতৃবৈশিষ্ট্য এবং মাতৃবৈশিষ্ট্য—দুটো বৈশিষ্ট্য থেকেই বঞ্চিত হয় এবং তার মধ্যে গুণপনা যাই থাকুক না কেন, তার ব্যক্তিত্ব স্থৈর্য্য লাভ করে না। একটা বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট, দুর্ব্বল, ইতস্ততঃমনা, নিষ্ঠাহীন বিধ্বংসী শারীরিক ও মানসিক ভাব উক্ত সন্তানের মধ্যে ক্রিয়া করতে থাকে। সেইজন্য কোন গুরুতর ব্যাপারে তারা বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য হয় কম। ইষ্টকৃষ্টি ও সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পরিপন্থী একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। শ্রেয়ের প্রতি আনতিও তাদের থাকে না। পিতৃবৈশিষ্ট্য ও মাতৃবৈশিষ্ট্য—উভয় থেকে বঞ্চিত হ'য়ে তারা যেন কতকটা ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কোনও

সদ্‌বিষয়ে তাদের conviction (প্রত্যয়) পাকা হয় না এবং যখনই কোন প্রলোভন বা পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তখনই তারা প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টিকে অল্পেতেই বিসর্জ্জন দেয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), প্রফুল্ল, শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), হরিদাসদা (সিংহ) প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত।

কেষ্টদা বললেন—একটা মানুষ যতই ভাল হোক না কেন, পরিবেশ ভাল না হ'লে, সে কিছুতেই ভাল হতে পারে না। তার সাধনার কোন মূল্য থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তা' বুঝি না। আমার ভাল হতে গেলে যেমন environment (পরিবেশ)-এর ভাল হওয়া লাগে, তেমনি environment (পরিবেশ) ভাল হতে গেলেও আমার ভাল হওয়া লাগে। কারণ, সেই মানুষটির environment (পরিবেশ) মানেই আমি এবং আমার মতো কতকগুলি ব্যক্তি। সেইজন্য ব্যক্তির চরিত্র-নিয়ন্ত্রণ, তপস্যা ইত্যাদিরও দরকার আছে। সেটা বাদ দিয়ে কখনও ভাল পরিবেশ গ'ড়ে উঠতে পারে না। কারণ, ব্যষ্টি নিয়েই তো সমষ্টি। ব্যষ্টিকে যদি না ধরেন, তবে হাত দেবেন কোথায় ? আবার, প্রবৃত্তি-পরায়ণ society (সমাজ)-কে যদি আমি mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে না পারি, তবে আমি বা বাঁচব কি করে ? তাই ব্যক্তির চাই দীক্ষিত হ'য়ে যাজনমুখর হ'য়ে চলা। এই ব্যক্তির চরিত্র, ইষ্টনিষ্ঠা ও যাজনমুখরতাকে বাদ দিয়ে কখনও society (সমাজ)-কে ভাল করা যাবে না। এর সঙ্গে ইষ্টভৃতি, সুবিবাহ ও সুজননেরও খুব দরকার আছে। মানুষকে সপরিবেশ ভাল ক'রে তুলতে গেলে তার জন্য যা' যা' প্রয়োজন, তার কোনটাকে বাদ দিলে হবে না।

জনার্দ্দনদা—অনেকে হয়তো অন্তর্বিকাশের জন্য নাম নেয়, কিন্তু তারা পারিপার্শ্বিকের ধার ধারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাজন বাদ দিয়ে মানুষ evolve করে না (বিবর্ত্তিত হয় না)। Conflict (দ্বন্দ্ব) না থাকলে তো প্রত্যেকেই ভাল মানুষ। কিন্তু অবস্থার মধ্যে, সংঘাতে কিংবা প্রলোভনে প'ড়ে সে কেমন ব্যবহার করে এবং মানুষকে কেমন adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে, সেইটের ভিতর-দিয়েই তার পরখ যে, সে কতখানি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কতটা বিবর্ত্তিত হয়েছে নিজে অন্তর্জীবনে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর এই সম্বন্ধে একটি বাণী দিলেন।

১৯শে ভাদ্র, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ৫। ৯। ১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে আছেন। জনার্দ্দনদা

(মুখোপাধ্যায়), প্রফুল্ল, যতীনদা (দাস), কালীদাসীমা, সরোজিনীমা প্রমুখ উপস্থিত।

প্রফুল্ল—বিরুদ্ধ সমাজের মধ্যে মানুষ একক কী করতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন মানুষই সম্পূর্ণ একক ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেকেই পরিবেশের সঙ্গে জড়িত। তাই প্রত্যেকটি মানুষই পরিবেশকে কিছু-না-কিছু প্রভাবিত করতে পারেই। এইভাবে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য সমষ্টিবৈশিষ্ট্যে evolve ক'রে (বিবর্ত্তিত হয়ে) ওঠে। তুমি যেমন সদ্‌ভাবে ভাবিত ও প্রচেষ্টাশীল, তুমি দেখতে পাবে, তোমার পরিবেশের মধ্যেও তোমার ভাবে ভাবিত কিছু-কিছু লোক পাবেই এবং তাদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তাদের সঙ্গে একযোগে চেষ্টা করবে। এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও তাদের পারস্পরিক সংহত, সমবেত ও সমাবেশী চেষ্টায় সমগ্র পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ধীরে-ধীরে পরিবর্ত্তন এসেই যাবে। কারণ, যে যতই প্রবৃত্তিপরায়ণ হোক, সে কিন্তু বাঁচতে চায়, বাড়তে চায় এবং সুখে, শান্তিতে থাকতে চায়। কিন্তু তোমাকে নিষ্ঠাসহ লেগে থাকতে হবে। একবার বললে শুনল না, আর তুমি হাল ছেড়ে দিলে, তাতে কিন্তু হবে না। পরিবেশের বাধা যদি তোমাকে সঙ্কল্পবদ্ধ ক'রে না তোলে, তাহ'লে কিন্তু হবে না। আর একটা কথা মনে রেখ, পরিবেশের মধ্যে নানাধরনের লোক থাকে, তুমি চেষ্টা করলে, তাদের ভিতর-থেকে কিছু-কিছু লোককে তোমার সহযোগী ক'রে তুলতে পারবেই।

কথাপ্রসঙ্গে জনার্দ্দনদা বললেন—মানুষের যে কী দুঃখ, তা' আমরা দূর থেকে ঠিক-ঠিক বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! মানুষের সঙ্গে যদি অন্তরঙ্গভাবে মিশে তার অবস্থায় ফেলে নিজেকে না দেখা যায়, তবে বাইরে থেকে উপরসা দেখে আমরা তাদের যে দুঃখ ব'লে কল্পনা করি, তা' কিন্তু ঠিক নয়। কুলিগিরি ক'রে এবং কুলিদের সঙ্গে মিশে আমি এটা বুঝেছিলাম। কুলিরা বহু উপার্জ্জন করে, দুঃখবোধ তাদের খুবই কম। তারা বরং কাঁচা পয়সার প্রাচুর্য্যে নেশাও করে এবং অসংযত চলনেও চলে। দেখে-শুনে আমার মনে হয়েছিল, বরং বাবুদের কষ্ট বেশী। সীমিত আয়ের মধ্যে তাদের খানিকটা ভদ্রভাবে চলতে হয়। জামা-কাপড় কেনা, ছেলেপেলেদের লেখাপড়া শেখান, সামাজিকতা বজায় রাখা ইত্যাদি নিয়ে তাদের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী।

আমাদের পরিচিত একটা খোঁড়া ছেলে ছিল। সে হামাগুড়ি দিয়ে স্কুলে যেত। একদিন আমি কতরকমে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তার অসুবিধা ও দুঃখের কথা, সে কাপড়চোপড়, টাকা-পয়সা, খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধার কথা বলল, কিন্তু তার শারীরিক অসুবিধা মেনে নিয়েছে ব'লে, ও-কথা কিন্ত উল্লেখই করল না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুর মধ্যে চৌকিতে ব'সে আছেন। আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), নরেনদা (মিত্র), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), বিজয়দা (রায়), মহিমদা (দে) প্রমুখ অনেকে উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর জনার্দ্দনদাকে বললেন—আপাততঃ অন্ততঃ ভাল একজন কর্ম্মী যোগাড় ক'রে ফেল। আর, তোমার কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে স্বতঃই যা' আসে তার উপর দাঁড়াতে চেষ্টা কর। অবশ্য, মনে কোন চাহিদা যেন না থাকে।

'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী-র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥'

(অধ্যাত্মচিত্ত হইয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া ফলাভিসন্ধিরহিত, 'আমার' এই বোধহীন ও শোকশূন্য হইয়া তুমি যুদ্ধ কর।)

আদর, সোহাগ, টাকা-পয়সা, মান-যশ—কোনরকম প্রত্যাশা যদি থাকে, তবে তুমি কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে ঐ প্রত্যাশায়, adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারবে না নিজেকে। ফলে আত্মপ্রবঞ্চনাই সার হবে।

যাদের মধ্যে ছিটিয়ে পড়েছ, তাদের যদি তোমাকে দেওয়ার প্রবৃত্তি হয় out of love (ভালবাসা থেকে), তবে মনে করতে পার, তারা gainer (লাভবান) হবে। আর, তুমি তাদের যা' দেও, তার চাইতে তাদের যদি পাওয়ার প্রত্যাশা বেশী হয় তোমার কাছ থেকে, জানবে তারা spoiled (নষ্ট) হচ্ছে। তোমাকে দেবার আবেগ না হয়ে, তোমার কাছ থেকে পাবার আবেগ হ'লে তাকে inner wealth (অন্তরের সম্পদ) কিছু দিতে পারবে না। তুমি যদি জীবন্ত হ'য়ে ওঠ, তোমাকে না দিয়ে, তোমার জন্য না ক'রে ভাল লাগবে না অন্যের।

রবীন্দ্রনাথের কথা আছে—"হায় সে কী সুখ/হাতে লয়ে জয়তূর্য্য/জনতার মাঝে ঝাঁপায়ে পড়িতে/রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে-গড়িতে/অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।"—ঐ-রকম তোমাদের হয়, তাহ'লেই হয়। এক-একটা শিবাজী হ'য়ে ওঠ। তোমার প্রত্যেকটা কথা, চাউনি, চলন উদ্দেশ্যকে প্রতিমুহূর্ত্তে বিচ্ছুরিত করা চাই, পরিপূরণ করা চাই।

চাই বাক্ নিয়ন্ত্রণ। এমন alert (সজাগ) হতে হবে, যাতে decision (সিদ্ধান্ত)গুলি with every immediacy (সর্ব্বপ্রকার ত্বরিত্যার্থনয়ে) সম্পাদন করতে পার।

তারপর হওয়া চাই tactful (কৌশলী),—কোথায় কী অবস্থায় কিভাবে চলতে

হবে, সে সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন বোধ। আর, হওয়া চাই কুটকৌশলী—কোন্‌টার ভিতর-দিয়ে কোন্ অসুবিধার সৃষ্টি হ'তে পারে, তা' বুঝে নিয়ে fencing (বেড়া) সৃষ্টি ক'রে চলার কায়দা আয়ত্ত করা। সর্ব্বোপরি চাই মানুষের কাছে শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে ওঠা। তা' না হ'লে তোমার কাছ থেকে জীবন পাবে না কেউ। তোমার জেল্লা বাড়াবার জন্য এ-সব কথা বলছি না। যাতে লোকের মঙ্গল সাধন করতে পার, সেইজন্যই এই কথা। তোমাকে সুখী করা যেন মানুষের হৃদয়তৃষ্ণা হয়, তাতে তারা লাভবান হবে।

আমার একটা দোষ আছে—মানুষকে ভালবেসে, তার সুখ-দুঃখের সঙ্গে পুরো-পুরি identified (একীভূত) হ'য়ে পড়ি—মমতা-মুগ্ধতায়। তুমি কিন্তু তা' হয়ো না, উর্দ্ধে থেক, তা' না হলে মঙ্গল করতে পারবে না তাদের, আর কষ্ট পাবে। আমার কিরকম—তুমি কলকাতায় আছ, যদি শুনি তোমার অসুখ হয়েছে, উদ্বেগে আমি শেষ হ'য়ে যাই—যত সময় সুস্থতার সংবাদ না পাই। বড় কষ্ট পাই এতে। সেটা ভারি বিশ্রী। এ-রকমটা হয়েছে মা যাবার পর থেকে। মা থাকতে আমার একটা prop (আশ্রয়) ছিল, এখন অসহায় হ'য়ে পড়েছি।

আর দেখ, কাউকে যদি এমনি কিছু দিতে পার দিও। সেখানে দিয়ে পাবার প্রত্যাশার নাম-গন্ধও রেখো না। আর এই যে দেবে, সে তোমার সামর্থ্যকে নিপীড়িত ক'রে নয়কো। তাছাড়া, যদি কাউকে কিছু দেও ও পাওয়ার প্রত্যাশা থাকে, সেখানে বিহিত করণীয় যা', তা' করে দিও। নচেৎ হয়তো ঠকবে।

দেবার কথা ব'লে যারা নিতে চায়, অথচ বিহিত পন্থার ভিতর-দিয়ে নিতে নারাজ, তখন বুঝবে তাদের ভিতর insincerity (কপটতা) আছে। তোমারও যদি ফিরে পাবার ইচ্ছে থাকে, অথচ যে বিধিগুলির মধ্য-দিয়ে যাওয়া দরকার, তা' যদি না যাও, তবে সেটা generosity (উদারতা) নয়। তা innert, indolent blunder (নিষ্ক্রিয়, অলস ভ্রান্তি) ছাড়া আর কিছু নয়কো। সাধারণতঃ বিশ্বাস বলতে আমরা যা' বুঝি, তা' কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস নয়। যে-ব্যাপারে যেখানে যা' করণীয়, সে-ব্যাপারে সেখানে তা' না করলে, সেটাকে ত্রুটি ব'লে ধ'রে নেওয়া উচিত। প্রতি পদক্ষেপে আমাদের বিধিমাফিক সতর্কভাবে চলতে হবে। কেউ যদি আমাকে ঠকায়, সেখানে তার দোষের চাইতে আমার দোষ কম নয়। আমি এমনভাবে কেন চলব, যাতে মানুষ আমাকে ঠকাতে পারে। আমাকে অনেক মানুষ অনেক ঠকিয়েছে, কিন্তু আমি কারও কাছে ঠকিনি। কারণ, আমি যখন যাকে যা' দিই, তা' প্রত্যাশা-শূন্য হয়েই দিই। অন্যে ফেরত দেবার কথা ব'লে নিলেও আমি ধ'রে রাখি যে, সে ফেরত দেবে না। আমার মধ্যে এই প্রস্তুতি থাকার দরুন, আমি কাউকে দিয়ে

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর আলোচিত বিষয়ের উপর একটা বাণী দিলেন। তারপর তিনি মনোহরদা (সরকার)-কে কালিষষ্ঠী-মার একটি কাজ ক'রে দিতে বললেন। তাতে মনোহরদা বললেন—আপনার এখানে যে-সব কাজের দায়িত্ব আছে, তা' ক'রে রাত্রে ছাড়া তো সময় হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন মনে বললেন—তাই করবে, রাত্রেই করবে। ভগবান মাথায় বুদ্ধি দিয়েছেন, দেহে শক্তি দিয়েছেন, অন্তরে ভক্তি দিয়েছেন,—এর চাইতে আর সম্পদ কী আছে? মানুষের প্রয়োজন হয়েছে, ক'রে দেবে, আর চাই কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—এমন দিন যদি কখনও আসে যে মানুষকে মারা লাগে, তখনও প্রাণপণে চেষ্টা করবে, যাতে মানুষকে না মেরে পার। আর, লক্ষ রকমে, লক্ষ পন্থায় সবসময় চেষ্টা করবে যাতে মানুষ বাঁচে, মানুষ থাকে। আর, এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করেছিলেন war avoid করার (যুদ্ধ এড়াবার) জন্য—কিন্তু দুর্য্যোধন ইত্যাদির মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন আনতে না পারায় যুদ্ধ করতে বাধ্য হলেন।

জনার্দ্দনদা—শ্রীকৃষ্ণ তো দুর্য্যোধনের মধ্যে পরিবর্ত্তন এনে দিতে পারতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যে এই কথা বলছ, এর মানে তুমি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অস্বাভাবিক কিছু ভেবে রেখেছ। ধরবে, তিনি একজন মানুষ। তাঁর প্রতি টান যদি থাকে, তার মধ্যে-দিয়েই তিনি কারও মধ্যে ক্রিয়া করতে পারেন। আর, ঐ ছাড়া উপায়ওনেই।

জনার্দ্দনদা—তিনি তো অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তাঁর প্রতি concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়েছিল, তখন একটা ecstatic moment-এ (উচ্ছ্বসিত মুহূর্ত্তে) হয়তো অমন realisation (অনুভূতি) হয়েছিল তার ভিতর। আবার, দুর্য্যোধনও নাকি বিশ্বরূপ দেখেছিল, তা' হয়তো for the time being (সাময়িক) তার মনে একটা উচ্ছ্বাস আসার ফলে হয়েছিল, কিন্তু তা' তার চরিত্রে অর্শেনি। তাই পরে ভুলে গেল—নিজের অনুভবকেই সন্দেহ করল।

২০শে ভাদ্র, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ৬।৯।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। অজয়দা (গাঙ্গুলী), নগেন ভাই (দে), প্রবোধদা (বাগচী), বীরেনদা (মিত্র), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্ল প্রমুখ অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রত্যেকটা বর্ণ চার ধরনের থাকে। যেমন বৈপ্রী বিপ্র, ক্ষাত্র বিপ্র, বৈশ্য বিপ্র, শূদ্র বিপ্র। আবার

বৈপ্রী ক্ষত্রিয়, ক্ষাত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ক্ষত্রিয়, শূদ্র ক্ষত্রিয়। সেইরকম আছে বৈপ্রী বৈশ্য, ক্ষাত্র বৈশ্য, বৈশ্য বৈশ্য, শূদ্র বৈশ্য। ইত্যাদি। আবার, শূদ্রের মধ্যেও এ-রকম আছে। প্রত্যেকটা মানুষ বিশেষ বর্ণের অঙ্গীভূত হ'লেও প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চরিত্রের বিশেষ-বিশেষ ধাঁজ থাকে।

ননীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে তার সম্পর্কে একজনের ভুল ধারণা সম্বন্ধে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ ধারণায় দেখে, ধারণায় শোনে; চোখে দেখে না, কানে শোনে না,—তাতেই যত গোলমাল হয়। পরের মুখের কথায় যত বিশ্বাস হয়, প্রত্যক্ষ দেখায় ততখানি বিশ্বাস হয় না। শোনা কথায় এতখানি আস্থা হয় যে প্রত্যক্ষ সেখানে ভেসে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর দুটি বাণী দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে তাম্বুতে এসে বসলেন। আজ মেঘলা দিন। চুনীদা (রায়-চৌধুরী), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), বীরেনদা (পাণ্ডে), সতীশদা (দাস), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), ভোলানাথদা (সরকার), প্রফুল্ল প্রমুখ আছেন।

ভালবাসা-সম্পর্কে কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের কখনও-কখনও প্রীতি-বিক্ষেপ হয়। ধর, তোমার ছেলের প্রতি তুমি অত্যন্ত স্নেহপরবশ, যখনই সে তোমাকে অবজ্ঞা ক'রে দুনিয়াকে উপভোগ করার দিকে ছুটলো, তোমার স্বার্থ, শুভ সমর্থন ও উপচয়ী সম্বর্ধনার প্রতি কোন খেয়াল না রেখে,—তখনই তোমার অন্তরে একটা প্রীতিবিক্ষেপ হয়, খুব কষ্ট হয়। যারা প্রবৃত্তিপরায়ণ হ'য়ে গুরুজনকে এইভাবে আঘাত দেয়, তারা জীবনে যতকিছুই পাক না কেন, যা-কিছুই হোক না কেন, একটা গভীর অন্তঃসারশূন্যতা এবং অন্তর্জীবনের ব্যর্থতা তাদের পেয়ে বসেই কি বসে।

২১শে ভাদ্র, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ৭।৯।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ বিভিন্ন স্থানে ব'সে অনেকগুলি বাণী দিলেন। তিনি সন্ধ্যার পর নতুন তাঁবুতে এসে বসলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), প্যারীদা (নন্দী), হরিপদদা (সাহা), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্ল প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—আমার অনেকদিন থেকেই মনে হচ্ছিল, আবার এখন মনে হ'চ্ছে—সৎসঙ্গীদের ভিতর কে কী ভাল টোটকা জানে সংগ্রহ ক'রে রাখা যদি

হয়, তাহ'লে খুব ভাল হয়। খুব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হয়; কোন্ অবস্থায় কী প্রয়োগ ক'রে কী হ'লো। যে-সব টোটকা সম্বন্ধে কারও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তার কাছ থেকে তা' লিখে রাখতে হয়। বহু সাধারণ লোকের অনেক-কিছু জানা আছে। এখানে একটা সুবিধা আছে বহু জায়গার থেকে বহু লোক আসে। এগুলি preserve (সংরক্ষণ) ক'রে না রাখলে অনেক কিছু নষ্ট হ'য়ে যাবে।

২৩শে ভাদ্র, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ৯।৯।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ দুদিন ধ'রে ক্রমাগত শুধু বাণীই দিয়ে চলেছেন।

২৪শে ভাদ্র, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ১০।৯।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুরেনদা (বিশ্বাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরেনদা (বসু), হরিদাসদা (সিংহ) ও ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী) কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সাড়ে সাতটার সময় একটি বাণী দিলেন।

এখন বেশ রোদ উঠেছে। চারিদিক সোনালী রং-এ রঙিন। শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের সামনে ঘাসের বুকে সূর্য্যকিরণ-উদ্ভাসিত শিশিরকণার দিকে লক্ষ ক'রে বললেন—নীহারকণাগুলি ঘাসের বুকে কেমন করে নাচছে, সূর্য্যের আলো বিকিরণ ক'রে দিচ্ছে নানা রংবেরং-এ। ওরা যেন বলছে, 'তোমারই গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তোমারই রূপে।' ঘাসের দিকে চেয়ে সেই শোভা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে বললেন—বাঃ বাঃ বাঃ কী চমৎকার!—একটা কণা নীল আভা ধরেছে, কী সুন্দর। ……কিন্তু যত সুন্দরই হোক, জীবন এর ক্ষণস্থায়ী।

ছোটবেলায় একদিন মাঠে হাগতে গিয়েছি, তখন ঘাসের বুকে ঐ শিশিরকণার দিকে লক্ষ্য পড়ল। দেখলাম পরিপূর্ণ সূর্য্যটাকে সে বুকে ধারণ ক'রে কতভাবে আলো বিচ্ছুরণ করছে। দেখে খুব ভরসা হলো। ভাবলাম, এই ক্ষুদ্র শিশিরকণা যদি সূর্য্যকে এমন ক'রে প্রতিফলিত করতে পারে, তবে আমি যত ক্ষুদ্রই হই না কেন, আমার ভিতর-দিয়েও হয়তো সেই পরমপিতার আলো বিচ্ছুরিত হ'তে পারে। তাকেও আমি বুকে ধারণ করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ভক্তজনপরিবেষ্টিত হ'য়ে ব'সে আছেন। এমন সময় রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা) আসলেন। দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—রত্নেশ্বরদা! কোথা থেকে আসলেন?

রত্নেশ্বরদা—সিউড়ি থেকে।

রত্নেশ্বরদা কাছে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনাকে দেখামাত্র যেন অব্যক্ত বাণী হলো, 'হোনসে আয়ে দে রম্যা ?'

রত্নেশ্বরদা—এর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি জানি ?

একটু চুপ করে থেকে বললেন—ঘুরতে-ঘুরতে কোত্থেকে আসলেন ?—এমনি কিছু হ'তে পারে।

২৫শে ভাদ্র, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ১১।৯।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

আমিষ, নিরামিষ আহার-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিরামিষ আহারই সর্ব্বাংশে শ্রেয়। তবে যারা আমিষ আহার বাদ দিয়ে কিছুতেই পারে না, তারা অপরিহার্য্য ক্ষেত্রে বাওয়া ডিম ও দুম্বার মাংস খেতে পারে।

কেষ্টদা—বিজ্ঞানীরা বলে animal protein (জান্তব প্রোটিন) নাকি শরীরের পক্ষে দরকার।

হরিদাসদা—আমিষ-আহার লাগে না। ওদের কথা ভুল। আমরা কী খাই ! কিন্তু আমাদের কী খাঁকতি আছে ?

কেষ্টদা—আমরা নিরামিষও যে judiciously (বিচার সহকারে) খেতে জানি না। আমাদের ডাক্তারের খরচটা দেখলেই তো হয়। গত চার বছরে তো পঞ্চাশ জন লোক মারা গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশী খেয়েই তো আমাদের অসুখ করে। আগে যখন খাওয়া-দাওয়ার কোন সুব্যবস্থা ছিল না, দিনান্তে একবেলা কোনভাবে দুটো জুটতো, একটা লঙ্কা পেলে উৎসব লেগে যেত, তখন কিন্তু রোগবালাই ছিল না, কুড়ি বছরেও একটা মানুষ মরেনি।

কেষ্টদা—তখন যে urge (আকুতি) ছিল, তার কাছে কিছু লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন আহার সম্বন্ধে একটি বাণী দিলেন।

বেলা ৮-৪০-এ বাণী দেওয়া শেষ হবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। তখন পফম্প্র বাণীটা পড়ল।

কালিদা (সেন) বাণী শুনে জিজ্ঞাসা করলেন—মাছ-মাংস খাওয়ায় দোষ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Animal cell (জান্তব কোষ) animal cell (জান্তব কোষ)-কে হজম করতে চায় না, তাকে repell (প্রত্যাখ্যান) করে। Animal cell (জান্তব কোষ) খাওয়ালে এমনি হয়তো শরীর খুব বাড়বে, কিন্তু তোমার মোটের 'পর দিয়ে খরচ হবে। অর্থাৎ animal cell (জান্তব কোষ)-এর নিজের existence (অস্তিত্ব) বজায় রাখার জন্য cell-division (কোষ-বিভাজন) বেড়ে যায়। তাতে শরীরের resistance power (প্রতিরোধ ক্ষমতা) ক'মে যায়। কারণ, শরীরের cell (কোষ)-গুলির constantly (সর্ব্বদা) struggle (সংগ্রাম) করা লাগে। Animal cell (জান্তব কোষ) শরীরে ঢুকলে, তারা ভাবে দিই এক কামড় লাগিয়ে। কারণ তারা নিজেরাও বাঁচতে চায়। ঐ cell (কোষ)-গুলি equally (সমভাবে) animated (সঞ্জীবিত)। মানুষের দেহকোষের মতো তারাও বাঁচার সংগ্রামরত। উভয়ের এই সংগ্রামের ফলে আমিষ-আহারে শরীরে toxin (বিষক্রিয়া) বেড়ে যায়। একান্ত যদি প্রয়োজন হয়, বাওয়া ডিম ও দুম্বার মাংস অপরিহার্য্য ক্ষেত্রে খাওয়া যেতে পারে। এগুলি low animated (কম জীবনীশক্তি সম্পন্ন)। দুধও animal diet (আমিষ খাদ্য) হলেও ক্ষতিকর নয়। কারণ, দুধ পেটে গিয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাসিলাস হয়। এই ব্যাসিলাস মানে vegetable cell (নিরামিষ কোষ), আর ব্যাকটিরিয়া মানে animal cell (জান্তব কোষ)। Vegetable cell (নিরামিষ কোষ)-গুলি less animated than animal cell (জান্তব কোষের তুলনায় কম জীবনীশক্তি সম্পন্ন)। তারা শরীরে গিয়ে animated (সঞ্জীবিত) হ'তে চায়। তাদের সঙ্গে দেহকোষগুলির বিরোধ কম হয়। তাই তা' থেকে শরীরের জান্তব কোষগুলি nurture (পোষণ) পায় বেশী।

রসিকদা (সেন) বলছিলেন—আমার ছেলে একটি বৈদ্য মেয়েকে বিয়ে করতে পারে ব'লে লোকে বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের সর্ব্বনাশ আর করবে কি ক'রে ? এতে যে শুধু সেই মেয়েটা যাবে তা তো নয়, তোমার বংশও যে নিকেশ হবে। আমরা যেন নিজের সর্ব্বনাশ করার আত্মঘাতী পরিকল্পনায় গা ঢেলে দিয়েছি।

সন্ধ্যায় ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে ব'সে আছেন।

এক দাদা বললেন—আমি বিপন্ন, কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর নাম কর, তাঁকে ভালবাস, তাঁকে ডাক, সদাচারে চল।

উক্ত দাদা—ডাকতে তো শরীর লাগে !

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাকাই শরীরকে আরো পটু ক'রে দেবে। ঐ শরীর নিয়ে যা' পার, করতে থাক। তাতে ক্ষমতা বেড়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এর পর কয়েকটি বাণী দিলেন। রাত সাড়ে আটটার সময় যে বাণীটি দিলেন, তাতে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দেওয়া আছে।

উক্ত বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শরীরকে ঠিক করতে গেলে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক,—এই তিন রকমের কর্ম্মপ্রবণতা একই সঙ্গে বাড়িয়ে দিতে হয়।

এরপর গোকুলদা (নন্দী), প্যারীদা (নন্দী), প্রফুল্ল প্রমুখকে বললেন—তোমরা কিন্তু জীবনীয় কর্ম্মগুলি যথাসাধ্য নিজেরা করবে। জীবনীয় কর্ম্ম মানে, তোমার বাঁচার জন্য যা' করতে হয় তা' করা। ধর, তুমি কাপড়টা কেচে নিলে, নিজের এঁটোটা পাড়লে, খেয়ে থালাটা ধুলে নিজে,—এইরকম টুকটাক নানারকম কাজ করতে-করতে nerve (স্নায়ু), muscle (পেশী)-গুলিতে নানাভাবে energy (শক্তি) flow করে (প্রবাহিত হয়)। তা' আবার তোমাকে পটু ক'রে তোলে। কর্ম্মঠ চলনে চললে elimination (অপনয়ন) ভাল হয়। একঘেয়ে হলে তেমনটি হয় না। ধর, তুমি সাইকেল চ'ড়ে রুগী দেখে বেড়াও, কিন্তু হাতে-কলমে ঘরোয়া নানারকম কাজ করতে অভ্যস্ত নও। তাতে তোমার energy (শক্তি-র) বহুধা সলীল গতি ব্যাহত হবে এবং ধীরে-ধীরে শরীরকে অপটু ক'রে তুলবে।

নিজহাতে প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি সবরকম কাজ করতে হয়। হয়তো একটু বাগান করলে, জল তুললে, বেড়া বাঁধলে। নচেৎ একঘেয়ে কাজে পেশীর নানারকম সক্রিয় চলনগুলি অভ্যস্ত থাকে না। এতে static condition (স্থিতিশীল অবস্থা) এসে যায়। শরীরের এই পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মন ও মস্তিষ্কও স্থবির হ'য়ে উঠতে থাকে।

২৭শে ভাদ্র, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ১৩।৯।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে একটি বাণী দিলেন। সে-বাণীটির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন—অন্যের দুর্ব্ব্যবহারে আমরা যদি অসুস্থ হ'য়ে পড়ি, তাহ'লে তারও যেমন দোষ, আমাদেরও তেমনি দোষ। কারণ, মানুষের দুর্ব্ব্যবহার যদি সইতে, বইতে ও হজম করতে না পারি, তবে সেটা আমাদেরও শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ। আমাদের সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, জ্ঞান ও প্রীতি

যত বাড়িয়ে তুলতে পারব, পরিবেশের অবাঞ্ছিত ব্যবহারে অক্ষত থাকার শক্তিও আমরা তত লাভ করব। আবার, কে, কখন, কী কারণে, কেমনতর আচরণ করে, সেটা যদি আমরা সহানুভূতি ও সহনশীলতার সঙ্গে বুঝে নিয়ে মানুষটাকে আপন করার বুদ্ধি নিয়ে চলি, তবে উভয়েরই লাভ হয়। আমরা নিজেরা তো বিপর্য্যস্ত হইই না, অধিকন্তু আমাদের উন্নত চলন দিয়ে অন্যকে কিছুটা পরিশুদ্ধ ক'রে তুলতে পারি।

সুশীলদা (বসু) প্রসঙ্গতঃ বললেন—গরু মেরে চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি হয় বলে ট্যাণ্ডনজী (পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন) চামড়ার জুতো পরা ছেড়ে দিয়েছেন।

হরিদাসদা (সিংহ)—কারণ দূর না ক'রে, একলা ঐটুকু করায় কি কিছু লাভ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মধ্যে যদি একটা অস্বস্তিকর ভাব থাকে ব্যথার মত হ'য়ে এবং আমি যদি দু'লাখ লোককেও সেইভাবে ভাবিত ক'রে তুলতে পারি, তাও খানিকটা লাভ। তবে সমাজে ব্যাপকভাবে যদি কোন অন্যায় মাথা তোলা দেয়,—এইভাবে বিচ্ছিন্ন একক প্রচেষ্টায় আদতে বিশেষ-কিছু হয়ে ওঠে না। আমি অবশ্য বর্ত্তমান প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু বলছি না। কারণ, এই ব্যাপারের সঙ্গে অনেকগুলি দিক জড়ানো আছে। কোন জটিল ব্যাপারের সমাধান করতে গেলে সামগ্রিকভাবে সেটা সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হয়। আমরা যদি জুতো না পরি, তাহ'লে যে গরু মারা বন্ধ হ'য়ে যাবে, এমন আশা করা ভুল। ইসলামের শাস্ত্রেই পাওয়া যায় যে দুধ হিতকর, কিন্তু গো-মাংস স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এই বোধটা ভাল ক'রে সঞ্চারিত ক'রে, এর দূরীকরণ করায় লাভ আছে, কিন্তু একপেশেভাবে কিছু করায় সমাজের এক বৃহৎ অংশের অবাঞ্ছনীয় প্রথা রোধ করা যায় কমই। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এইসব জিনিসগুলির দোষগুণ যদি প্রচার করা যায় এবং এর মাধ্যমে মানুষকে সচেতন ক'রে তোলা যায়, তাহ'লে আরও ভাল হয়। কারণ, বহু লোক অজ্ঞতাবশতঃ বহু অখাদ্য-কুখাদ্য খায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রসঙ্গে আর-একটি বাণী দিলেন।

৩১শে ভাদ্র, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ১৭।৯।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকিতে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে ব'সে আছেন। প্রফুল্ল মাঝে ক'দিন অসুস্থ হ'য়ে বাড়ীতে থাকার পর আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে আসলে, তিনি বললেন—আর অসুখ হবে না তো? অসুখ যেন আর না

হয়। এই শরীর নিয়ে কোথাও ছ্বটতে পারি না, কাজ-কাম করতে পারি না, অন্ততঃ কথাগ্বলিও যদি গাঁথা হ'য়ে থাকে, তাহ'লেও কাজ হবে। বারবার যদি অসুস্থ হয়ে পড়িস, চলবে কেন? যাতে আর অসুখ না হয়, সেভাবে চলতে হয়।

প্রফ্বল্ল—আমি তো ভাল থাকার চেষ্টা করি। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাঝে-মাঝে অসুস্থ হ'য়ে পড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছাশক্তিকে এত প্রবল ক'রে তোলা লাগে, যাতে অসুস্থতা তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে। তোমার উপর যখন এত গ্বর্বত্বপ্বর্ণ কাজের দায়িত্ব আছে, জেনো, তোমার অসুস্থ হবার অধিকার নেই। মনটাকে যদি ইষ্টের ভাবে রঙিন-মাতাল ক'রে তুলতে পার, তাহ'লে হয়তো দেখবে, অসুখ-বিসুখ কোথায় পালিয়ে গেছে। ইষ্টান্বরাগ এমন জিনিস যে তার ফলে অসম্ভব সম্ভব হ'য়ে উঠতে পারে।

১লা আশ্বিন, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ১৮।৯।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে পরপর বাণী দিচ্ছেন।

পারশী গ্বর্বভাই দার্বওয়ালাদা, সুশীলদা (বসু), মহেন্দ্রদা (হালদার), সতীশদা (দাস), ভোলানাথদা (সরকার), কাল্বদা (আইচ), কাশীদা (রায়-চৌধ্বরী), নগেনভাই (দে), অম্বল্যদা (ঘোষ), স্মরজিৎদা (ঘোষ) প্রম্বখ উপস্থিত আছেন। প্রফ্বল্ল শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কাগজ প'ড়ে শোনাচ্ছে। কলকাতার একটি সৎসঙ্গ উৎসবের রিপোর্ট বেরিয়েছে। কাগজে রিপোর্টের অবস্থান দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি হ'লে এমন করতাম না। Front page-এ (সামনের পাতায়) বড় হেডিং-এ যদি খবর বের না হয়, তবে কী হলো? Publicity (প্রচার)-ই যদি করতে হয়, তবে stoutest publicity (প্রবলতম প্রচার) চাই।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদা (বসু)-কে বললেন—আমাদের প্রত্যেকটি পরিবারে ছেলেপেলেদের পাঁচ থেকে দশ-বারো বছরের মধ্যে দীক্ষিত ক'রে তুলতে হয়। আর, প্রত্যেকটি পরিবারে পারিবারিক যাজন প্রতিদিন ঠিকমত ক'রে প্রত্যেকটি পরিবার ঠিক ক'রে ফেলা লাগে। প্রত্যেক পরিবারেই এর প্রবর্ত্তন দরকার। এমনকি বাড়ীর চাকর-বাকরদের পর্য্যন্ত সম্ভব হলে initiate (দীক্ষিত) করা ভাল, তা' না হ'লে full strength (প্বর্ণশক্তি) হয় না।

বেলা গোটা এগারর সময় মন্মথ ব্যানার্জ্জীদার সঙ্গে আগত শ্রীযুত পাণ্ডে আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বিদায় নিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার সুযোগ পেলেই আসবেন।

পাণ্ডেজী—আপনি যখন ডাকবেন, তখনই আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর মন্মথ ব্যানার্জ্জীদার দিকে চেয়ে বললেন—আমি ডাকার পর আসলে, আমার তত enjoyment (উপভোগ) হয় না—যতটা না ডাকতে নিজে থেকে আসলে হয়।

পাণ্ডেজী—আমারও নিজে থেকে আসায় ততখানি enjoyment (উপভোগ) হয় না, ডাকে আসলে যেমন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি selfish (স্বার্থপর) কিনা।

পাণ্ডেজী—আমিও selfish (স্বার্থপর)। (উপস্থিত সকলের হাস্য)...... আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কইলেই বড় কিছু ক'ব। আমি চাই নিজেদের আশ্রম with well-equipted University (সুসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় সহ) যাতে ঋত্বিক কলেজ, মিলিটারি কলেজ ইত্যাদি থাকে। প্রয়োজনীয় সবদিক নিয়ে University (বিশ্ববিদ্যালয়) গ'ড়ে ওঠে, এই আমার ইচ্ছা। পাবনা আশ্রমে আমার নিজের মতো কাজ শুরু করেছিলাম। তা' তো টিকল না।

পাণ্ডেজী—আর কিছু না পারলেও তার কয়েকটা ইটও তো সংগ্রহ করতে পারব ? এক জীবনে যদি না পারি, কয়েক জীবনে তো পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি ধরি, তাহ'লে এই জীবনেই কাজ সমাধা করব, এমনতর ভাব থাকা চাই। তাহ'লে ভগবান আমাদের জীবনও push ক'রে (এগিয়ে) দেন।

পাণ্ডেজী—শুধু আমার চেষ্টায় হয়তো এ জীবনে না হ'তে পারে, কিন্তু আপনার দয়া থাকলে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কিন্তু খুব ভাললাগে এইসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর পাণ্ডেজীকে খাবার কথা জিজ্ঞাসা করায় মন্মথদা বললেন—ওর আজ সোমবার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সোমবার-টোমবার করা ভাল।

পাণ্ডেজী—সবদিনই ভগবানের, যে-কোন দিনই ভাল, যদি তা সৎচিন্তা ও সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হয়। নইলে সোমবার হিসাবে সোমবারের কী মূল্য আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার এই অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়েই আমরা culture (কৃষ্টি)-কে enjoy (উপভোগ) করতে পারি। যেমন marriage ceremony ties the union more firmly (বিবাহ অনুষ্ঠান দাম্পত্য মিলনকে আরও দৃঢ়বদ্ধ ক'রে তোলে)।

এই কথা বলার পর একমিনিট থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি একটু fanatic (বেশী গোঁড়া) আছি।

পাণ্ডেজী—হয়তো আমিও আছি। উনি হয়তো ভাল বিষয়ে fanatic (গোঁড়া), আমি হয়তো খারাপ সম্বন্ধে fanatic (গোঁড়া)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fanaticism (গোঁড়ামি) ভাল। রে প্যাণ্ট পরে, কাপড় পরতে চেয়েছিল, আমি বললাম, প্যাণ্টই পর। ঐ ওর habit ও custom (অভ্যাস ও প্রথা)। ও ঐ বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলে, তাই-ই ভাল।……পাণ্ডে তো ব্রাহ্মণ?

পাণ্ডেজী—তা' কী করে বলব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যে family-তে (পরিবারে) জন্মগ্রহণ করে, সেই সংস্কার-অনুযায়ী evolve করে (বিবর্ত্তিত হয়), তাই ভাল।

পাণ্ডেজী—মানুষের জন্ম তো পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। তার উপর গুরুত্ব আরোপ করবার কী আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে family-তে (পরিবারে) জন্মাই, সেই family-র (পরিবারের) instinct (সংস্কার)-এর সাথে সঙ্গতি থাকে বলেই সেখানে জন্মাই। Instinct (সহজাত সংস্কার) intention carry করে (অন্তর্নিহিত ভাব বহন করে)। Instinctive channel-এ (সংস্কারগত প্রবাহে) চললে intention of life (জীবনের অন্তর্নিহিত ভাব) পরিপূরিত হয়।

পাণ্ডেজী—Instinct (সংস্কার) তো ego (অহং)-র-ই ব্যাপার!

শ্রীশ্রীঠাকুর—Instinct (সংস্কার) ego-তে underline করে (অহং-এ অন্তর্নিহিত থাকে)—অনুশায়িত হ'য়ে থাকে।

পাণ্ডেজী—Instinct ও ego-তে তো clash হয় (সংস্কার ও অহং-এ তো দ্বন্দ্ব হয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ego (অহং) সেই instinct (সংস্কার)-গুলি নেয়, যা' তার অনুকূল।

পাণ্ডেজী—আমি ব্রাহ্মণ, এই অহঙ্কার কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি নিষ্ঠা সহকারে ব্রাহ্মণের মতো চলি, বলি, ভাবি,—তাহ'লে ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে বিহিত অহঙ্কারে দোষ কী?

পাণ্ডেজী—বহু untouchable (অস্পৃশ্য)-ও তো ব্রাহ্মণের মতো চলে, তাদেরও তো ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করা উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহু untouchable (অস্পৃশ্য) ঋষি হ'য়ে গেছে। রুহিদাস চামার, সে এখনও অনেক বামুনের নমস্য। সে দাবি করে না, প্রকৃতিই তাকে enthrone করে (অভিষিক্ত করে) সেখানে।

পাণ্ডেজী— Highest evolution (ঊর্ধ্বতম) বিবর্ত্তনের জন্য জাত-পাত-ধর্ম্ম ত্যাগ করা ভাল না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাছ যখন বাড়ে, তখন যদি bark (গাছের ছাল) খুলে নেওয়া যায়, তবে গাছটা বাড়ে না। জন্মগত ধারা ignore (উপেক্ষা) করলে হবে না। Skin (চামড়া) তুলে ফেলে দিলে system (দেহবিধান) নষ্ট হ'য়ে যাবে।

পাণ্ডেজী—জাতপাতের সীমা কি আবহমান কাল থাকবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন সন্ন্যাসে উপনীত হবে, তখন সব ছুটে যাবে। তার আগে যদি এই pressure (চাপ) ছুঁড়ে ফেলে দেও, নিজেকে বজায় রাখতে পারবে না, unregulated disintegration (অনিয়ন্ত্রিত বিশ্লিষ্টতা) এসে যাবে।

পাণ্ডেজী—আমি প্যাণ্ট পরি, এইভাবে থাকি, তবু মনে ভাবি, ভিতরে-ভিতরে আমি সন্ন্যাসী। আমার ভিতরে সন্ন্যাস আছে, না সেটা আসবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কিছু না থাকলে কি এখানে আসে মানুষ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর কয়েকটি বাণী দিলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে। আগামী পরশু তালনবমী তিথি, তাই এখন থেকেই কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তবৃন্দ কিছু-কিছু আসতে শুরু করেছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু) এবং বহিরাগত অনেকে উপস্থিত। প্রফুল্ল শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি বাণী প'ড়ে শোনালো। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাজ কিছু করতে পারি আর না পারি, আমার এইটুকু satisfaction (তৃপ্তি) আছে যে আমার যা' বলার ব'লে যাচ্ছি এবং এগুলি লেখা থাকছে। যাদের প্রাণ চায়, তারা এইগুলি পড়বে ও বুঝে চলবে। অবশ্য, চরিত্রওয়ালা মানুষ সামনে থাকলে মানুষ করার ও চলার প্রেরণা পায়, নইলে সব থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিথর হ'য়ে থাকে। প্রত্যেকে যার-যার প্রবৃত্তি-অনুযায়ী চলতে চেষ্টা করে। আর, প্রবৃত্তিমার্গী চলনকে সমর্থন করতে চেষ্টা করে—আমার কথার দোহাই দিয়ে। পরে দেখতে পাবে, কত লোক আমার কথার এবং নামের দোহাই দিয়ে নিজেদের খেয়ালমতোও চলবে।

একটু পরে বললেন—ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে material emancipation (ভৌতিক মুক্তি)-এর কোন মূল্য নেই, অথচ material emancipation (জাগতিক সমস্যার সমাধান) বাদ দিয়ে spiritual emancipation (আধ্যাত্মিক মুক্তি) ব'লে কিছু নেই। যারা material emancipation (বৈষয়িক মুক্তি)-এর কথা বাদ দিয়ে তথাকথিত spiritual emancipation (আধ্যাত্মিক মুক্তি)-এর

উপর জোর দেয়, তারা না spiritually advanced (আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত) বা materially successful (বৈষয়িক জীবনে কৃতকার্য্য)—কোন দিকেই তাদের কৃতিত্ব নেই। Grit (তেজ) যাদের দৃঢ় নয়, তারা কোনদিকেই এগুতে পারে না।

২রা আশ্বিন, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ১৯।৯।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপস্থিত। বড়াল-বাংলোর ছেলে-পেলেরা অনেকেই এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে।

মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী) শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীঠাকুর-পরিবারের জন্য আগামীকালের তিথি-উৎসব উপলক্ষে কাপড়-চোপড়, মাথার মাখার তেল, সাবান, প্রসাধন-দ্রব্যাদি বহু-কিছু নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য একজোড়া ধুতি, জামার কাপড়, বিছানার চাদর, ছাতা, শেভিং সেট ইত্যাদি অনেক-কিছু নিয়ে এসেছেন। জিনিস-গুলি খুবই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইদিন সকালে ও সন্ধ্যায় কয়েকটি বাণী দিলেন।

৩রা আশ্বিন, ১৩৫৭, বুধবার, শুক্লা তালনবমী (ইং ২০।৯।১৯৫০)

অতি ভোরে একদল জাগরণী দিতে বেরিয়ে গেলেন। তারপর ঊষা-কীর্ত্তনের দল পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে আসলেন—তুমুল কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হ'য়ে। ভোরেই যতীনদা (দাস), নরেনদা (মিত্র) প্রমুখ কলকাতা থেকে আসলেন কয়েকটি বাক্স ও ঝুড়িতে ক'রে তিথি-উৎসবের জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড়, তরি-তরকারী, ফল-মূল, দই-মিষ্টি, খাবার ইত্যাদি নিয়ে। সকাল হতে-না-হতেই রসনচৌকির বাজনা শুরু হলো। বহু দাদা ও মায়েরা এসেছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে।

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর হাত-মুখ ধুয়ে বড়ালের বারান্দায় শুভ্র শয্যায় বসলেন একখানা নতুন কালোপেড়ে শান্তিপুরী সাদা ধবধবে ধুতি প'রে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর তত ভাল নয়, প্রেসার একটু বেড়েছে। তারপর নন্তুসের (পূজনীয় বড়দার পুত্র) অসুখ সঙ্কট-জনক। শ্রীশ্রীঠাকুর উদাস-দৃষ্টিতে নির্ব্বিকারচিত্তে ব'সে আছেন। দলে-দলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ফলমূল, কাপড়, পুষ্পাঞ্জলি ও অর্ঘ্যাদিসহ তাঁকে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। পাশে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) দাঁড়িয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার কাছে টুকটাক জিজ্ঞাসা করছেন—কে কে এসেছে কলকাতা থেকে, কলকাতার উৎসব কেমন হলো ইত্যাদি। কেষ্টদাও সেইসব খবর বলছেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আসনটি মনোজ্ঞভাবে সজ্জিত হয়েছে। আসনের পশ্চাদ্‌দেশে বেড়ায় থরে-থরে

বিকশিত পদ্ম শোভা পাচ্ছে। যতি-আশ্রমের সীমানা জুড়ে সুন্দর বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছে। সামনে একটি গেট করা হয়েছে। গেটটি লতাপাতা দিয়ে সাজানো। সামনে কলাগাছ ও মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়েছে। যতি-আশ্রমের চতুর্দ্দিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটা পূত পবিত্র উৎসবময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে বড়াল-বাংলোর সর্বত্র। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বসার পর নহবত বাজানো সুরু হলো। বেলা ৭-২৮ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ ৬৩তম জন্মলগ্ন ঘোষণা করা হলো। তোপধ্বনি, হুলুধ্বনি ও শংখধ্বনিতে আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত হ'য়ে উঠল। বিভিন্ন স্থানে ধূপ-দীপাদি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। শত-সহস্র দাদা, মা, বালক, বালিকা সমবেত হলেন যতি-আশ্রমের ঘেরার বাইরে।

মাইক ফিট করা হয়েছে। গোঁসাইদার পরিচালনায় বিনতি-প্রার্থনাদি সুরু হল। ভক্তবৃন্দের দৃষ্টি শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে নিবদ্ধ। সকলেই ভাবাবিষ্ট হ'য়ে প্রার্থনায় ডুবে গেলেন।

প্রার্থনাদির পর শ্রীশ্রীঠাকুর মাইকের সামনে বসে বললেন—আমার একান্ত যিনি,—পরমপিতা পরমেশ্বর যিনি, তাঁর চরণে একান্ত নিবেদন আমার, তোমরা প্রতিপ্রত্যেকে তোমাদের পরিবার, পরিবেশসহ সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক। বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট তোমাদের সুনিষ্ঠ কর্ম্মতৎপরতার বোধিকুশল প্রস্তুতি ও নিয়ন্ত্রণে সহজেই সুনিয়ন্ত্রিত ও নিরস্ত হ'য়ে উঠুক। তোমরা তোমাদের পারিপার্শ্বিকের প্রতিপ্রত্যেকের আশ্রয় হ'য়ে ওঠ, তোমাদের সান্নিধ্য ও সক্রিয় সেবায় সকলেই যোগ্যতায় উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে শান্তি, স্বস্তি ও জীবনে উচ্ছল হ'য়ে উঠুক। তোমরা ইষ্টানুগ চলনে সুখী হও, শান্তি পাও, তৃপ্তি পাও—এই আমার প্রার্থনা।

এরপর প্রফুল্ল শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটি বাণী পাঠ ক'রে শোনাল।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলেন। তাঁকে খবরের কাগজ প'ড়ে শোনান হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই সময় দুটি বাণী দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গোটা ১১টার সময় শৌচাদি সেরে স্নানে গেলেন। স্নানের চৌবাচ্চায় গোলাপ-জল ও পদ্মফুল প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়েছে। অজস্র নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নান-অনুষ্ঠান দর্শন করবার জন্য সমবেত হয়েছেন। স্নানের সময় বাজনা, হুলুধ্বনি ও স্লোগান উত্তালভাবে চলতে লাগল। স্নানের পর স্নানজল ছিটিয়ে দেওয়া হল। শ্রীশ্রীঠাকুর নতুন কাপড় পরলেন। তাঁকে একটা সোনার পৈতে পরিয়ে দেওয়া হল।

স্নানের পর তিনি ঘরে এসে মা, বাবা, সরকার সাহেব ও হুজুর মহারাজের ফটোর সামনে বসলেন। গোঁসাইদা মন্ত্রপাঠ করালেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও নিষ্ঠাসহকারে

মন্ত্রগুলি পড়লেন। এরপর ফটোগুলির সামনে ভক্তিবিনম্র চিত্তে প্রণাম নিবেদন করলেন।

এরপর ভক্তবৃন্দ পুষ্পার্ঘ্যসহ প্রণাম করলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা হ'ল। বাইরে আমতলায় তখন খোল, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁজ, ড্রাম ইত্যাদি সহ উদ্দাম কীর্ত্তন চলতে লাগল। মুহুর্মুহুঃ, চতুর্দ্দিক স্লোগানে মুখরিত হ'য়ে উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভোগের পর ঐ শব্দ কলরবের মধ্যেই প্রফুল্লকে বললেন—লিখবি নাকি ?

এরপর দুটি বাণী দিলেন।

তারপর সর্ব্বসাধারণের জন্য আনন্দবাজারে প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা হ'ল।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। যতিবৃন্দ, প্রফুল্লদা (মুখার্জী) এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মা অসুস্থ হবার পর থেকে কোন উৎসব বা festival (আনন্দানুষ্ঠান) আমি enjoy (উপভোগ) করতে পারিনি। বরং আমার কাছে যেন কষ্ট লাগে। কিন্তু ঠেকাবার উপায় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লদাকে কাছে ডেকে নানা কথার ছলে বললেন—ধর্ম্ম মানেই মানুষকে যোগ্য ক'রে তোলা। তা' যদি না হয়, তবে ধর্ম্ম কী ? কিন্তু আমাদের conception (ধারণা) দাঁড়িয়েছে—ধর্ম্মের সঙ্গে আবার যোগ্যতার সম্পর্ক কী ? যোগ্যতাকে খতম ক'রে দিয়ে চললেই ধর্ম্ম হবে। কারণ, ধর্ম্মের মধ্যে তো materialism (বস্তুতান্ত্রিকতা) নেই। কিন্তু material (বস্তুতান্ত্রিক) উন্নতি বাদ দিয়ে তো spiritual (আধ্যাত্মিক) উন্নতি হয় না। সবটা নিয়ে একটা গোটা জিনিস। তোমার whole system (সমগ্র বিধান)—শরীর-মন, সবটা সমগ্রভাবে যদি সুস্থ না থাকে, তাহ'লে যেমন তোমার স্বস্তি হয় না, তুমি সুস্থ আছ বলা যায় না—এও তেমনি।

একটু নীরবতার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বললেন—চলার পথে ঘা-গুঁতো কিন্তু খেতেই হবে, তাতে যদি মুষড়ে পড়, তাহ'লে কিন্তু মুশকিল, ঘাবড়ালে চলবে না। পরমপিতার উপর নির্ভর ক'রে কোনভাবে দুর্দ্দিন পাড়ি দেওয়া লাগবে।

বিকালে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে সভা হল। সুরেনদা (বিশ্বাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ আলোচনা করলেন।

সন্ধ্যায় ওয়েস্ট এণ্ডে সৎসঙ্গ হল। রাত্রে রঙ্গনভিলায় পুজনীয় ছোড়দার পরিচালনায় 'কারাগার' নাটক অভিনীত হল।

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২১। ৯। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে প্যারীদা (নন্দী)-কে বললেন—পুদিনা, শুলপে শাক, ধনেপাতা, পেপের কস, আম-আদা, পাকালঙ্কা, গোলমরিচ, আমলকী, কিসমিস, চিনি একত্র জেলি করে খেতে দিলে resistence power (প্রতিরোধ ক্ষমতা) বাড়ে এবং ভাল রসায়নের মত কাজ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ, প্যারীদা (নন্দী), হরিপদদা (সাহা), গোকুলদা (নন্দী) প্রমুখ আছেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—টাকার লোভের থেকে যে-চিকিৎসকের রোগী আরাম করানর লোভ যত বেশী হয়, সে-ই তত successful (সফল) হয়। আর accurate diagnosis (সঠিক রোগনির্ণয়) যাতে করা যায়, সেই চেষ্টা করা লাগে। রোগীর প্রতি যে-ডাক্তার যত interested (অন্তরাসী) হয়, তার রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতাও তত বেড়ে যায়। আর, পড়াশুনা, আলাপ-আলোচনাও খুব করা লাগে। ডাক্তাররা পরস্পরের মধ্যে যদি সশ্রদ্ধভাবে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে, তাহ'লে তাদের অনেক লাভ হয়।

প্রফুল্ল—ব্যবসা-সম্বন্ধেও তো অনেকটা এই কথা খাটে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যবসার মূল জিনিস হ'ল অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি। আর সবসময় লক্ষ্য রাখা লাগে, কত সুবিধেজনক দামে কত ভাল জিনিস সরবরাহ করা যায়। আর, ব্যবসাদারের ব্যবহারও খুব ভাল হওয়া চাই। যাদের ব্যবহার ভাল এবং ফাঁকিদারি বুদ্ধি কম, তার দোকানে খরিদ্দার তত বেশী আকৃষ্ট হয়। ভাল যাজক হ'তে গেলে যে-সব গুণ লাগে, ভাল ব্যবসাদার হ'তে গেলেও সেইসব গুণের প্রয়োজন হয়। যে যত ভাল যাজী, ব্যবসাদারও সে তত ভাল। ডাক্তার বল, ব্যবসাদার বল, সাধারণ সামাজিক মানুষ বল, যার ব্যক্তিত্ব যত সুন্দর তার প্রতি মানুষ তত আকৃষ্ট হয়।

৫ই আশ্বিন, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ২২। ৯। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। জনৈক দাদা তার ব্যক্তিগত নানা সমস্যা সম্বন্ধে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সবচেয়ে বেশী দরকার concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চাই মানুষস্বার্থী হওয়া, মানুষের স্বার্থকেন্দ্র হওয়া through service, love and sympathy (সেবা, ভালবাসা ও সহানুভূতির ভিতর-দিয়ে)। চাকরী করার থেকে ইষ্টানুগ উঞ্ছবৃত্তি অনেক ভাল।

চাকরী মানে suvservient mentality (দাসসুলভ মনোভাব)। ওতে মাথাটা বিকিয়ে দেওয়া হয়। স্বতঃদায়িত্বে স্বাধীনভাবে মাথা খাটিয়ে উপার্জ্জন করার বুদ্ধিটা লোপ পেয়ে যায়। চাকরীর থেকে ব্যবসা ভাল। ব্যবসা মানে selling service (সেবা বিক্রয় করা)। স্বাধীন ব্যবসায়ে অনেক মাথা খাটানো লাগে, সেই দিক দিয়ে এটা অনেক ভাল। কিন্তু সবচাইতে ভাল যাজন ও লোকসম্পদের উপর দাঁড়ান। তুমি যদি পাঁচ লাখ লোকের interest (স্বার্থ) হ'য়ে উঠতে পার, না চাইতে যদি প্রত্যেকে তারা কিছু-কিছু দেয়, তাই ভাল নয় কি? চাকরী যদি আদৌ করতে হয়, তবে ঐ চাণক্যের মত করা ভাল। তাঁর অঙ্গুলি হেলনে সারা ভারত চলত, অথচ তিনি রাজকোষ থেকে একটা পয়সাও নিতেন না। দিনান্তে লোকের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য থেকে তিনি আতপ চাল ও কাঁচকলা-সিদ্ধ খেয়ে সানন্দে দিন কাটাতেন। সমাজকে তাঁর দেওয়া বা কতখানি, আর তার তুলনায় নেওয়া কত অকিঞ্চিৎকর। এমনতর মানুষেরাই ছিল সমাজের মাথা। আমি ভাবি তোমাদের মধ্যে কি চাণক্য বেঁচে নেই? আবার কি চাণক্য জাগবে না তোমাদের ভিতর দিয়ে?

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন।

উক্ত দাদাকে পরে শ্রীশ্রীঠাকুর একবার বললেন—যে কাজই কর, মনে রেখ, যাজন হল fundamental (মূল) জিনিস।

২০শে আশ্বিন, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ৭।১০।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। তিনি গত মঙ্গলবার থেকে জ্বরে ভুগছেন। আজ ভাল আছেন। সকালে বারান্দায় চৌকিতে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শচীনদা (গাঙ্গুলী), গোপেনদা (রায়), প্রফুল্ল, সেবাদি, সুধাপাণিমা, কালিদাসীমা প্রমুখ উপস্থিত।

শচীনদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সন্তোষবাবুর এমন চাকরে মনোবৃত্তি যে অজয় চাকরী ছেড়ে দেবার জন্য তিনি খুব অসন্তুষ্ট। বলেন—চাকরী থাকলে কত উন্নতি করতে পারত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বুদ্ধি অন্যরকম। আমি যদিও দেখি যে, কারও চাকরে মনোবৃত্তি আছে, তবুও আমি চাই যাতে সে তা' avoid ক'রে (এড়িয়ে) অন্যভাবে পথ ক'রে নিতে চেষ্টা করে। কারণ, চাকরীতে শুধু নিজের ক্ষতি করে না, progeny (বংশ)-শুদ্ধ নষ্ট করে। আমি তখন সবে ডাক্তার হ'য়ে এসেছি, পয়সাকড়ি নেই, বাবা চাকরীর জন্য পীড়াপীড়ি করতেন। ঠাকুরবাবুদের ওখানে দরখাস্ত করলাম। একটা application (দরখাস্ত) ক'রে দিলাম, ভাবিনি কিছু ফল হবে।

হঠাৎ দেখি appointment letter (নিয়োগপত্র) এসে হাজির—পঞ্চাশ টাকা মাইনে—ফ্রী কোয়ার্টার, প্রাইভেট প্র্যাকটিস allowed (করা যাবে)। তখনকার দিনে সেটা কম কথা নয়। কিন্তু চিঠি আসা মাত্র তা' হাতে পেয়ে আমার গা-টা থরথর করে কাঁপতে লাগল। চোখে যেন সর্ষে ফুল দেখতে লাগলাম। তখনই সবার অগোচরে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সোয়াস্তি পেলাম।

২১শে আশ্বিন, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ৮।১০।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে সকালে, বিকেলে এবং সন্ধ্যায় অনেকগুলি বাণী দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্যারীদা (নন্দী), প্রফুল্ল, সরোজিনীমা, ননীমা প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত।

কথায় কথায় কেষ্টদা বললেন—আগে যখন যা' মনে হ'ত, তা' ক'রে ফেলা হ'ত। এখন বাইরে যেতে গেলে দিন দেখতে-দেখতে কত সময় চ'লে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে কিন্তু আমি দেখতাম, যখন যা' করতে বলতাম, বাইরে যেতে বলতাম, কখনও অদিনে যেতে বলিনি, ঠিক কায়দামতই বলেছি। কিন্তু অদিনে কিছু করার intention (অভিপ্রায়) যখন হয়, কিংবা বাস্তবে তেমন করা হয়, তার মানে incompetency (অযোগ্যতা) পিছু নিয়েছে। ওর পেছনেও আছে complex (প্রবৃত্তি), গ্রহ বা obsession (অভিভূতি)। আগে তো পঞ্জিকা-টঞ্জিকা দেখতাম না। কিন্তু যখন যা' শুভারম্ভ কিছু করতে বলতাম, intuitively (অন্তর্দৃষ্টিবশে) তা' সুদিনেই বলা হ'ত। আমি বহু ক্ষেত্রে দেখেছি দিন না দেখে বললেও, ওর ব্যত্যয় হ'ত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তারপর বললেন—আমি যখন নামটাম করতাম, যেন হন্যে কুকুরের মত ছুটতাম, নানারকম কাজকর্ম্ম করতাম। মা আমার সব নেশা খতম ক'রে দিয়ে গেছেন।

এরপর আর একটি বাণী দিলেন।

২৫শে আশ্বিন, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ১২।১০।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করতে উঠবার আগে অজয়দা (গাঙ্গুলী)-কে স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্বন্ধে বলছিলেন—বিধিকে মানাই ভাল। বিধিকে যত মানি না, তত প্রকৃতির শাসনে প'ড়ে যাই।

স্নান সেরে আসবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন।

২৬শে আশ্বিন, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ১৩।১০।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকিতে ব'সে আছেন।

কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অসৎ-নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উপর জোর না দেওয়াতে আমাদের গোলমাল হ'য়ে গেছে।

একটি বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বিজয় রায় (ইলেক্ট্রিশিয়ান)-দাকে বললেন—সর্বান্তঃকরণে concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া লাগে ইষ্টার্থ পোষণে—তাঁর স্বার্থ আগে দেখা লাগে। বৌ-ছেলেপেলেরও আগে, অর্থাৎ তাঁকে উপচরী রাখাই লাগবে। তা' ক'রে তারপর আর যা' কিছু, তবেই পার পাওয়া যায়। এক নৌকার পা দিয়ে দশ নৌকা ঠিক করা যায়—কিন্তু দশ নৌকায় পা দিলে তোমার ভাণ্ডই ফুটো হ'য়ে যাবে—সম্ভর থাকবে না। কথায় কিংবা কাজে go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) করতে নেই।

বেলা দশটা নাগাদ কলকাতা থেকে যোগেনদা (ব্যানার্জ্জী) ও জব্বলপুরের একজন ডাক্তার দাদা আসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অহিংসা, প্রেম, অস্তেয় ইত্যাদি যাবতীয় সত্তা-পোষণী গুণের উৎসারণাই হয় ঐ ইষ্টানুরাগ থেকে। ঐ এক ঘাট ঠিক থাকলে নীতিচলন আপসে আপ এসে যায়।

ধরুন, আমি চুরি করব। পরকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করব তো? পরই যদি না থাকে তবে চুরি করব কি ক'রে? আমার জীবনের মতো যদি সকলের জীবনকে বোধ করি তবে অন্যকে শোষণ করি কি ক'রে, পোষণ না দিয়ে?

আসল কথা আদর্শে কেন্দ্রায়িত হওয়া। যত concentric (সুকেন্দ্রিক) হই তত sublimated (ভুমায়িত) হ'য়ে উঠি—ঈশ্বরে ভুমায়িত হই। সদগুরুর কাছ থেকে নিয়ম গ্রহণ করি—চলি, করি—বোধি-সমন্বয় হয়। তখন মনে হয় গাছ আমি, পাখী আমি, গরু আমি, প্রত্যেকটা মানুষই আমি, যা-কিছুই আমি। সকলেরই বেদনা ও তৃপ্তি আছে আমার মতন, তখন কাউকে ঘৃণা করার প্রবৃত্তি আসে না, ক্ষতি করার প্রবৃত্তি আসে না। হিংসা করার প্রবৃত্তি আসে না। নিজেকে মানুষ নিজে হিংসা করবে কেন?

কত মানুষ ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু এক-একজন মানুষ এসে দুনিয়া ওলোটপালট ক'রে দিয়ে যান। তাঁদের জীবনধারায় সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠে সারা দুনিয়া। আমরা যে বাঁচি সে তাঁদের সম্বল নিয়ে। তাই যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রমুখ কত আগে চ'লে গেছেন; তবু লোকে তাঁদের ভুলতে পারে না। তাঁরাই দেখিয়ে দেন জীবনের

বাস্তবে আচার্য্যকে শ্রদ্ধা সহকারে অনুসরণ না করলে হয় না। ধরুন, আপনি একজন বড় সার্জ্জারীর অধ্যাপক। কেউ যদি সার্জ্জারী ভাল ক'রে শিখতে চায়, তাকে আপনার শরণাপন্ন হ'তে হবে। আপনি কেমন ক'রে কোন্ কায়দায় ছুরিখানা ধরেন, কিভাবে অপারেশন করেন—যাতে রোগীর ব্যথা লাগে কম এবং অপারেশন সফল হয়, এইসবগুলি আপনার সান্নিধ্যে থেকে অনুসন্ধিৎসা নিয়ে আপনার গাড়ু, গামছা ব'য়ে তাকে হাতে-কলমে ক'রে শিখতে হবে। যত করবে, ততই আয়ত্ত করবে। আর, যতই দেখবে, ততই মুগ্ধ হবে। আর, শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে বার-বার বলবে—'গুরুদেব, তোমায় নমস্কার।' এমনি হ'লে তবেই সে আপনার কাছ থেকে পায়। তাই বলে, বিদ্যা, জ্ঞান, গুণ, চরিত্র সবই গুরুগত।

দুপুরে ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে চৌকিতে ব'সে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমি অনেকরকম ক'রে দেখেছি, কিন্তু ভক্তি ছাড়া তৃপ্তি মেলে না। আর, এ যেন বিষামৃতে একত্র মিলন। কষ্ট ও আনন্দ একসঙ্গে থাকে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—সোঽহং করতে-করতে একটা আচ্ছন্ন ভাব আসে—লীন হওয়ার ভাব আসে। তার প্রতিকার হল ইষ্টে অচ্যুত টান।

কেষ্টদা—আমি একসময় সোঽহং সোঽহং করতাম খুব—কিন্তু ওতে মাথা গরম ছাড়া কিছু হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সোঽহং জপ করতে হয়—অর্থভাবনা করতে হয়, দৃশ্যমান যা'-কিছুর সঙ্গে নিজেকে identify (একীভূত) ক'রে তার তাৎপর্য্য বোঝা লাগে। তার ভিতর-দিয়ে উপাদান-সামান্যে উপনীত হ'তে হয়। আর, তাকে সার্থক ক'রে তুলতে হয় ইষ্টে। ওইটে না থাকলে বৃত্তিস্বারূপ্য এসে যেতে পারে, অহং-এর মার খেতে হয়।

আমার এমনতর হয়েছিল যে শকুন হয়ে গেছি, শিয়াল হয়ে গেছি, এইরকম কত যে করেছি, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সবসময় above-এ (উর্দ্ধে) থাকা লাগে। Concentric (সুকেন্দ্রিক) অবস্থা মানে কিন্তু fixation (ত্রাটক) নয়। ইষ্টহীন আত্মচিন্তা করতে-করতে সম্বিৎ fade (বিলীন) হ'য়ে আসে—বোধি প্রদীপ্ত থাকে না। যত যাই কও, তাঁর জন্য বৈরাগী না হ'তে পারলে সুখ নেই—এতে অবশ্য সুখও যেমন, দুঃখও তেমন—বিষামৃতে একত্র মিলন। ব্যাসের কথা শুনেছি, সব লিখে শান্তি হলো না, শেষটা ভাগবত লিখলেন।

২৭শে আশ্বিন, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ১৪।১০।১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

প্রসঙ্গক্রমে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) জিজ্ঞাসা করলেন—আত্মা ব'লে কথাটার অবতারণা ক'রে লাভ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মার স্থূলপ্রকাশ motile instinct (গতিশীল সংস্কার) যাকে বলে তাই ! এই গতিশীলতাই যা'-কিছুকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলে।

কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—জাতিস্মরতার জন্য বামদেব ঋষি-প্রণীত বিখ্যাত বামদেব্যগীতি আছে। তা' আবৃত্তি করলে নাকি জাতিস্মরতা লাভের পক্ষে সুবিধা হয়। Hypnotism (সম্মোহন) এর ভিতর-দিয়ে নাকি পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগানো যায়। সারিপুত্ত বা মৌদ্‌গল্যায়ন, এঁদের কে-জানি সাধনার ভিতর-দিয়ে জাতিস্মরত্ব লাভ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্ম-সম্বন্ধে আমার কতগুলি কথা খুব স্পষ্ট মনে হয়। ছেলেবেলা থেকে এখনও ঠিক একইভাবে মনে হয়। এত বয়সে আদৌ সে স্মৃতি ম্লান হয়নি। ওর উপর দাঁড়িয়ে আবার অনেক কথা মনে হয়। মনে হয় একটা অপ্রশস্ত সুগভীর নদী—তার পাশে বড় পাথর আছে। তার উপর আমি ব'সে আছি এবং কয়েকজন ভাই-টাই কাছে আছে। মেলা টগরফুল ফুটে আছে। নদীটা পশ্চিমদিক থেকে পূর্ব্বদিকে বয়ে চলেছে। খানিকটা দূরে বাঁশবন। সূর্য্য অস্ত যায়। জল আলো হ'য়ে উঠেছে।

আবার একটা মনে হয়—যেন উধাও মাঠ, কুরুক্ষেত্র নাকি জানি না।

আর একটা জায়গার কথা মনে হয়—আপনাদের কাছে যেমন শুনি, বোধহয় সেটা মণিপুরের মতো জায়গা হতে পারে। একটা বাজার বসে। মাটির চালা আছে। কাঠের ঘর, কাঠের পাটাতন। মনে হয় সেখানে এক বৌ আছে, তাকে দেখলে যেন চিনি। কিভাবে মনে হয় জানি না, কল্পনা কিনা তাও জানি না, কিন্তু একটা solid impression (নিরেট ছাপ) আছে।

আবার, এক জায়গা আছে। চারদিকে পাহাড়, তার মাঝে নদীতে নৌকা ক'রে কর্ত্তামার সঙ্গে ঘুরছি, নদীর পারে-পারে আবার অজস্র কাছিম।

আর একটা মনে পড়ে—কী একটা লতানে গাছ দিয়ে কুঞ্জ তৈরী করা হয়েছে। সেখানে ছিলাম।

কেষ্টদা—এগুলির উপর আপনি জোর দেন না কেন ? আর পুণ্যপুঁথির উপরই বা ততজোর দেন না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর উপর আমার কোন control (দখল) নেই। যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মধ্যে বলা।

কেষ্টদা—Control (দখল) নেই তাও তো বলা যায় না, অমন সুন্দর জিনিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকলে সে sub-conscious control (অবচেতন নিয়ন্ত্রণ)। কীর্ত্তনের সময় সমাধির আগে নাচতে-নাচতে যখন একটা মত্ততা আসত, তখন যেন মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠার মতো টের পেতাম। কখনও-কখনও আলোর ঝলক আসত। কখনও বাঁশীর শব্দ জাগত। কখনও-কখনও চৈতন্যদেব বা কোন মহাপুরুষের কথা ভাবতে-ভাবতে তাঁতেই যেন ডুবে যেতাম। কখনও-কখনও ঘুমের আবেশের মতো আসতো, তার মধ্যে যেন স্বপন দেখতাম। ও অবস্থা বেশী সময় থাকতো না। নিজে ইচ্ছে বা এতফাঁক ক'রে-ক'রে সমাধিস্থ হওয়ার চেষ্টা করলে হতো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা নয়টার সময় বড়াল-বাংলোর বারান্দায় কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—ধর্ম্মের খাঁটি unadulterated (নির্ভেজাল) মূর্ত্তি যা' তাতে কেউ বাদ পড়ে না। তা' ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নিয়ে সকল বৈশিষ্ট্যকে, সকল সত্তাসম্বর্দ্ধনী মত ও পথকেই সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে। তা' প্রত্যেকেরই interest (স্বার্থ) fulfil (পরিপূরণ) করে—কারো interest (স্বার্থ)-ই বাদ পড়ে না—এক প্রতিলোমপন্থী ইত্যাদি যারা তাদের interest (স্বার্থ) অবশ্য fulfil (পরিপূর্ণ) করার যো নেই। এই যা আমি দিয়েছি, লেখাপড়া বেশী করা থাকলে এ দেবার জো ছিল না—কিসের মধ্যে আটকা প'ড়ে যেতাম ঠিক ছিল না।

আহার-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—নিষ্ঠাবতী বিধবারা যেমন খায়, সেই আহারই শ্রেয়—তার বেশী খেলে শরীর থেকে খরচ হ'য়ে যায়। খাওয়াটা ও জন্মটা—এই দুটো জিনিস ঠিক রাখতে পারলেই হ'ল।

আগে আশ্রমে যে অমনতর খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তাতে কুড়ি বছরেও একটা লোক মরেনি। প্রত্যেকেই উপচয়ী ছিল। তপোবনে cent percent (পুরোপুরি) পাশ করতো। নানা theory (তত্ত্ব)-এর পাল্লায় প'ড়ে আমি outvoted (বাতিল) হ'য়ে গেলাম। আমি ভাবলাম—ক'রে দেখুক। এতদিন পরে বুঝছে অনেকে—অযথা বহুদিন পিছিয়ে গেলাম। Unprofitable (অনুপচয়ী) ও harmful (ক্ষতিকর) অনেককিছু imbibe (আয়ত্ত) করেছি আমরা। Unprofitable (অনুপচয়ী) যা'-কিছু সেগুলি শয়তান খুব profitable (উপচয়ীভাবে) distribute (বিতরণ) করতে পারে with a charming pull (আকর্ষণী

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

অনেকে উপস্থিত।

যোগেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) জিজ্ঞাসা করলেন—সোঽহং সাধনায় বৃত্তিস্বারূপ্য আসে কখন, কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'আমি সেই', 'আমি সেই' ভাবতে-ভাবতে অহং বৃত্তিতে obsessed (অভিভূত) হ'য়ে যায়। তখন কেটে যায়, link (সূত্র) হারিয়ে ফেলে। সোঽহং করতে গেলে ঐ যেভাবে বলেছি, ঐভাবেই করতে হয়। 'তুমি পিতা, আমি সন্তান', 'তুমি প্রভু, আমি দাস'—এই ভাবই ভাল। ভক্তিই শ্রেয়—অন্যভাবে অযথা টান পাড়াপাড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীবড়মাসহ খানিকটা বেড়িয়ে এসে যতি-আশ্রমের বারান্দায় বসলেন।

ছাপড়া জেলা থেকে একজন বাঙ্গালী উকিল এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বিহারী-বাঙ্গালী বিরোধের কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা ওদের interested (অন্তরাসী) ক'রে তুলতে পারি না—আমরাই disintegrated (অসংহত)। আমাদের হজমী গুণ নেই—ওদের হজম ক'রে আপন ক'রে নিতে পারি না। বাঙ্গালী প্রত্যেককে কোল দিয়েও আজ suffer (কষ্ট) করছে। কারণ, যেখানে থাকে—তাদেরই wound (আহত) করে, তাদের service (সেবা) দিতে চায় না।

কথায়-কথায় সুরেনদা (বিশ্বাস) বলছিলেন—পূজনীয় বড়দা সেইদিন যাদের কাপড় নেই—তাদের ডেকে-ডেকে কাপড় দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বড় sensible (বোধবান), মানুষকে সত্যি ভালবাসে, মানুষের জন্য করেও খুব।

প্রফুল্ল—আমরা worker (কর্ম্মী)-রা যদি এই জিনিসটা imbibe (আয়ত্ত) করতাম তাহ'লে একটা বিরাট ব্যাপার হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বার্থগৃধ্নুতা না গেলে ওদিকে দৃষ্টিই যায় না, চোখই পড়ে না, ভাবেও না ওদিক দিয়ে।

প্রফুল্ল—এতে আমরা অযথা ছোট হ'য়ে থাকি—ঠিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' খেয়ালই হয় না, এত foolish (মূঢ়) আমরা।

সুরেনদা—আগে ভিক্ষা ক'রেও সাহায্য করতাম। এখন যেন খেই পাই না, কিভাবে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিভাবে দিই কী? কী নিয়ে এসেছ দুনিয়ায়? মানুষ দিয়েই মানুষ করে যা'-কিছু। মানুষের দুঃখকষ্টের উপস্থাপক হও আর একজনের কাছে।

তার আবার কষ্ট না হয় সেটাও দেখ। এইভাবে ক'রে যাও সকলের জন্য। কেউই টাকা-পয়সা নিয়ে জন্মায় না। যাদের প্রাণ থাকে, তারা করেও, পারেও।

২৮শে আশ্বিন, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ১৫।১০।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য) প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করলেন—নিত্যজ্ঞানাভ্যাসের কথা আপনি বলেছেন—আমি দিনের শেষে কি ক'রে বুঝব যে নূতন জ্ঞানাভ্যাস করেছি কিনা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Observation (পর্যবেক্ষণ)-এর একটা furtherance (অগ্রগতি) থাকা চাই। যেদিন তা' হ'ল না, বুঝবেন, এগুলেন না।

কেষ্টদা—কিছু একটা মুখস্থ করা নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই করেন তার ভিতর-দিয়ে ঐ হওয়া চাই।

সুশীলদা (বসু)—মননের ভিতর-দিয়ে হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দর্শন, মনন, করণ।

কেষ্টদা—মানুষ নামধ্যান করে, ইষ্টভৃতি করে, কিছু একটু শব্দজ্যোতি দেখে, তারপর এগোয় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নেশা না হ'লে এগোনো যায় না। নেশাই তো উপরে টানে।

কেষ্টদা—তাঁর দয়া ছাড়া হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের দয়া তো আছেই। তার জন্য আপনার ভাবা লাগবে না। নিজের প্রতি দয়া করেন—তাহ'লেই হবে। আপনাদের একটা সুবিধা হয়েছে, হাতে-কলমে যে যতটা করেছেন না করেছেন, কিন্তু বাঁকাচোরা বোধের গোলমাল নেই, সোজা হ'য়ে গেছে। আপনাদের কাছে এসে কেউ মারা পড়বে না। কত জায়গায় আছে কী বলতে কী কয়, কী করতে কী করে, কোনটারই ঠিক নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলেন।

ইছাপুরের একটি ভাই জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা একজন মানুষকে অনুসরণ করব, না Ideal (আদর্শ)-কে অনুসরণ করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ideal (আদর্শ) বলতেই বুঝি মানুষ—যার মধ্যে Idea (ভাব) জীয়ন্ত। মানুষ না হ'লে concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া যায় না। যা'-কিছু নিয়ে concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া লাগে তাঁতে। তাতে আসে adjustment (নিয়ন্ত্রণ)। তাঁর প্রতি টান নিয়ে করা, বলা, চলা—সবটার ভিতর-দিয়ে common

factor (উপাদান সামান্য) বের করতে হয়। তখন নিজেকেই বোধ করা যায় সর্ব্বত্র। আমিটাই ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে দ্বনিয়াভর।

উক্ত ভাই—ভগবান কৃপাময় বলে, তার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কৃপা বলতে ব্বঝি ক'রে পাওয়া।

উক্ত ভাই—Man proposes, God disposes (মান্বষ প্রত্যাশা করে এক, ভগবান করেন অন্যরকম)—এর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তার মানে ব্বঝি, মান্বষ উদ্দেশ্য অন্বপাতিক করে, ভগবান তার ফল নিষ্পত্তি করেন।

উক্ত ভাই—তিনি দয়াময়—ব্বঝব কী করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের দয়া আছেই। তাঁর দিকে যে যত এগিয়ে যায়, সে তা' তত বোধ করে। তিনি আমাদের যত ভালবাস্বন না কেন, আমরা তাঁকে ভাল না বাসলে হবে না। শিক্ষকের ছাত্রের উপর যত টানই থাক, ছাত্রের যদি শিক্ষকে শ্রদ্ধা না থাকে তো কাজ হবে না।

উক্ত দাদা—ভগবান মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান বলতে আমি ব্বঝি, ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মান্বষ।

কিরণ (বস্ব)—ভগবানকে জানা যায় কিভাবে ? তার মনোমতন হওয়া যায়ই বা কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান তো তুইও হ'তে পারিস। 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' (সে যার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন সে তাই)।

কিরণ—ভগবান যে আছেন, তার প্রমাণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যখন আছি, তখন আমার থাকার একটা কারণ আছে—এই ভাবলেই হ'ল।

কিরণ—অনেকে বলে—ভয়ের থেকে ধর্ম্মের উদয় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই হোক না কেন, বাঁচার লোভ থেকে ধর্ম্মের উদয় হয়েছে। মান্বষ যাই কর্বক, বাঁচতে-বাড়তে চায়ই। আর তারই পন্থা হ'ল ধর্ম্ম।

কিরণ—অবতার মহাপ্বর্বষ ও ধর্ম্মের এত ছড়াছড়ি সত্ত্বেও আমাদের এ অবস্থা কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা করব না, মানব না, সে দোষ কার ?

কিরণ—নানা ধর্ম্মমত হ'য়েই তো যত গোল হয়েছে—বিবাদ, বিসম্বাদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্বঝের গোল, এমনি তো গোল নেই। যেখানে যেমন emphasis

(জোর) দরকার, তাই দেওয়া আছে। মূলে তো একই কথা—যখন যেমন ক'রে প্রয়োজন।

কিরণ--কিভাবে এই ভ্রান্তির প্রতিকার হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম বোঝা দরকার আমার। আমি বুঝে আচরণ ক'রে সকলকে বোঝাতে হবে।

কিছুক্ষণ বাদে নিজে থেকে বললেন—আগুন হয়তো জানে না, সে আগুন। আমরা রকম দেখে কই আগুন। জবর mathematician (গণিতজ্ঞ) হয়েও mathematician (গণিতজ্ঞ)-এর অহং যখন থাকবে না, তখন বোঝা যাবে যে mathematics (অঙ্ক) সত্তায় ঢুকেছে।

একবার পাবনায় একজন বিলাতফেরতকে বলেছিলাম যে, বিজ্ঞ মানুষ সেই, যার চরিত্র দিয়ে বিজ্ঞতা ফুটে বেরোয়, অথচ বিজ্ঞতা সম্বন্ধে তার কোন অহঙ্কার নেই। তাতে তিনি বলেছিলেন—তা' হবে কেন ? আমি বললাম—চোখ এত দেখে কিন্তু নিজেকে ঠাওর পায় না। যখন একটা কুটো যায়, তখন টের পায়। সেটা চোখের অসুস্থ অবস্থা।

কিরণ--প্রত্যেকেই কি ইচ্ছা করলে সব কিছু শিখতে পারে ? যতবড় সে হ'তে চায়, তত বড় হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর--যা' আছে তার উপর দাঁড়িয়ে আরও বাড়াতে পারে—তার ক্ষমতা-অনুপাতিক। Instinct (সংস্কার)-এর উপর দাঁড়িয়ে বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি ক'রে তার ভিতর-দিয়ে আরো এর প্রাপ্তির দিকে যেতে হয়। একজন হয়তো arts (কলা)-এর পণ্ডিত, সে যদি mathematics (অঙ্ক) শিখতে চায় ওর ভিতর-দিয়ে যেতে হবে।

কিরণ—Communism (সাম্যবাদ) কি আমাদের দেশের পক্ষে ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Communism (সাম্যবাদ) কী বুঝি না। জানাও নেই। আমরা বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চাই, বাঁচতে চাই, বাড়তে চাই, আদর্শে সংহত হতে চাই। সবাইকে ধনী ক'রে তুলতে চাই।

কিরণ--বিরুদ্ধ ভাবের প্লাবন ঠেকানো যাবে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার কৃষ্টিতে যদি অনুরাগ না থাকে, তা' পরিপালন যদি না কর, তবে যে-কোন জিনিসের খোরাক হ'তে হবে।

কিরণ—এতবড় বিরাট পরিবেশকে কিভাবে ঠিক করা যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি নিজে কর, নিজেকে বাদ দিয়ে যা' ভাববে, তা' করতে পারবে না। তুমি তোমাকে বাদ দিলে সব চ'লে যাবে। কৃষ্টিকে বোঝ, জান। তোমার

গা দিয়ে, চরিত্র দিয়ে ফুটে বেরোক তা', তখন লোকে বুঝবে। বোঝ, সবাইকে বোঝাও। তোমাকে কেন্দ্র ক'রেই সমষ্টি-ব্যক্তিত্ব হ'য়ে উঠবে তোমার মতো। একটা গাছের মূল থাকে একটা, ডালপালা হয় কত। উদ্বাস্তু কত আছে, কিন্তু তোমাদের মত ক'জন। তুমি এই অবস্থার মধ্যেও দুটো টাকা কেন দেও? ও দিয়ে তোমার প্রয়োজন মেটাতে পার, কিন্তু আমাকে ভালবাস ব'লে দেও। পরে সকলকে অমন বোধ হয়। প্রতিপ্রত্যেকের জন্য প্রতিপ্রত্যেকে করে। তাই আদর্শে অনুরাগ যত বাড়ে, ততই সুসংহতির পথ খুলে যায়।

কিরণ—একটা দুর্ভিক্ষে কত লোক মারা যায়। এ-সব ক্ষেত্রে কী করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মারা যাবে কেন? ইষ্টে অনুরক্ত ও সংঘবদ্ধ হ'য়ে যাতে সবাইকে বাঁচাতে পার, তার চেষ্টা করবে। সবাইকে আপন ক'রে নেবে, সবারই সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করবে।

কিরণ—আমরা পাশ্চাত্য কৃষ্টি এবং প্রাচ্য কৃষ্টির কোন্‌টা কিভাবে নেব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজ বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে নিজের সত্তাকে সমৃদ্ধ করার জন্য যেখান থেকে যা' নেওয়ার তা' নেবে।

এরপর কাগজ পড়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের পাঁচ কোটি স্বস্তিসেবক দরকার। তাদের কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এই চার রকম কাজ শিক্ষা দেওয়া দরকার, যেন চতুর্ভুজ। শান্তির সময়ে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য এইসব সংগঠনমূলক কাজ নিয়ে থাকবে যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্রতা নিয়ে। প্রত্যেক কাজের দল এক-একজন কমান্ডারের অধীনে থাকবে। যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষার দিক দেখবে। সংগঠনমূলক কাজগুলি করবে সামরিক উৎসাহ, কৌশল ও সংগঠন নিয়ে। মোটামুটি এই কাজগুলি শিখলে nerve (স্নায়ু), muscle (পেশী) ও brain (মস্তিষ্ক) অনেকটা allround (সর্বতোভাবে) educated (শিক্ষিত) হ'য়ে উঠবে। বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে নানারকম কাজের ভিতর-দিয়ে না গেলে nerve (স্নায়ু), muscle (পেশী) ও brain (মস্তিষ্ক)-এর latent capacity (সুপ্ত শক্তি) বাস্তবে ফুটে ওঠে না।

দেশে আর fallow land (পতিত জমি) বা fallow problem (অসমাহিত সমস্যা) ব'লে কিছু থাকবে না। তোমার দেশের—এতখানি সম্ভাবনা আছে যে তোমাদের তো চ'লেই যাবে, অন্য দেশকেও সরবরাহ করতে পারবে।

আমাদের উচিত প্রত্যেক district (জেলা), প্রত্যেক province (প্রদেশ), প্রত্যেক country (দেশ) তার sister district (পার্শ্ববর্তী জেলা), sister province (পার্শ্ববর্তী প্রদেশ) ও sister country (পার্শ্ববর্তী দেশ)-এর

বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য যাতে প্রস্তুত থাকে। প্রত্যেকটি ব্যক্তির এজন্য নিত্য ত্যাগ স্বীকার করা চাই। তাতে প্রত্যেকের যোগ্যতা বেড়ে যাবে। এতে জেলা, প্রদেশ ও দেশগুলি পরস্পর পরস্পরের স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠবে। তখন প্রত্যেকে লক্ষ্য রাখবে অন্য কেউ যাতে অত্যাচারিত না হয় বা দুর্ভোগের মধ্যে না পড়ে।

আমার মনে হয় প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক ইউনিয়ন, প্রত্যেক থানা, প্রত্যেক মহকুমা, প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেক প্রদেশ থেকে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে তাদের পছন্দমত দক্ষ ও সৎলোককে ভোট দিয়ে যদি নির্ব্বাচন করে এবং কেউ যদি প্রার্থী হিসেবে না দাঁড়ায় তাহ'লে বোঝা যায় লোক-অন্তরে সত্যিই কারা শ্রদ্ধার আসন অধিকার ক'রে আছে। সেইসব লোক যদি ব্যবস্থাপনাদি করে তাহ'লে ভাল হয়।

রাজনৈতিক মতবাদ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি শ্রেণীদ্বন্দ্ব বুঝি না, আমি বুঝি শ্রেণী সমন্বয়। আমি ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে মানি। সেইজন্য সহযোগী বর্ণ, সম্প্রদায়, সমাজ সবই মানি। আমি বাঁচতে চাই। এখানে আমি মানে সপরিবেশ আমি। তাছাড়া আমার বাঁচার কোন মানে হয় না, পারাও যায় না। আর, যে যা'-কিছুই করুক, সহজাত সংস্কারের উপর দাঁড়িয়ে করবে। এইভাবে বৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। কামারের ছেলে বড় professor (অধ্যাপক) হ'তে পারে, কিন্তু পয়সা নিতে পারবে না তা' ক'রে। আগে আমাদের বৃত্তি হরণ ছিল না, বেকার সমস্যা ছিল না। আমাদের বুদ্ধি ছিল যাতে ঘরে-ঘরে ভগবান হয়, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হয় প্রত্যেকে। প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল, ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া। এই মূল উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যা'-কিছু পরিচালিত করতে হয়।

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে বসে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে সোঽহং সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সোঽহম যদি বলি তা' হ'লে, প্রত্যেকটা যা'-কিছুর মধ্যেই সেই সোঽহং বোধ করা লাগবে। প্রত্যেকটা রকমে আমিকে উপলব্ধি করা লাগবে তার সব বৈশিষ্ট্যসম্বলিত তাৎপর্য্যসহ। এইভাবে সব-কিছুর মধ্যে common factor (উপাদান সামান্য)-টা অনুধাবন করা লাগবে। আর, তাকেই সার্থক ক'রে তোলা লাগবে ইষ্টে। এই যে ইষ্টে concentric হলেন, এর থেকে normally (স্বাভাবিকভাবে) যে sublimation (ভূমায়িতি) হবে তার ভিতর-দিয়েই 'যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র ইষ্ট স্ফুরে' অর্থাৎ 'বাসুদেব সর্ব্বমিতি' কিংবা 'শ্রীকৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ' এই এমনতর বোধ

জাগবে। এমনি ক'রে বোধ করতে-করতে Absolute (চরম) বোধ এসে যাবে। 'সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম' জপের ব্যাপারেও এই ভাবেই অগ্রসর হওয়া লাগবে। মানুষ এইভাবে বোধ করে, আমার ইষ্টই যা'-কিছু হ'য়ে আছেন—তাঁকে দুনিয়ার যা'-কিছুর ভিতর সেই বিশিষ্ট রকমে অনুভব করতে হবে। তখন বিশিষ্টতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জ্ঞান লোপ পায় না। বরং প্রত্যেকটা যা'-কিছু স্ব-বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে এবং তাদের প্রতি-পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক, পারস্পরিক সংযোগ, সমাবেশে কী হয় না হয় এবং তার ভিতরকার common factor (উপাদান-সামান্য) কী এবং সেই উপাদান সামান্যের সঙ্গে, ইষ্টের সঙ্গে, আমার সঙ্গে এবং যা'-কিছুর সঙ্গে সম্পর্কটা কী সব-কিছু নিয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জ্ঞান সহ একটা absolute (অখণ্ড) বোধ ফোটে।

বিশ্বাস সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিশ্বাসের আছে বিষয়, ব্যাপার আর তার নিদর্শন সম্বন্ধে সহজ যুক্তি। যেমন অশ্বত্থ গাছের একটা নিদর্শন আছে, পাতা। সেটা মিলালে ঠিক পাওয়া যায়, তা' বাদ দিয়ে যে বিশ্বাস সে একটা credulous conception (যুক্তিহীন বিশ্বাস)।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর শ্রীশ্রীবড়মা ও বুলুমাসহ বেড়াতে বেরুলেন। পিছনে কেষ্টদা, সুশীলদা (বসু), প্যারীদা (নন্দী), সুরেনদা (বিশ্বাস), মোহন (ব্যানার্জ্জী), প্রফুল্ল প্রমুখ ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে-বেড়াতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এসে নড়াইলের জমিদার বাড়ীর দেউড়ীতে ঢুকে বাড়ীটা ঘুরে দেখলেন। বড়ালের পিছন দিক দিয়ে একদিকে ছোটটিলা আর একদিকে ঝিল—তারই মাঝখানকার কাঁকরবিছানো লাল পথ দিয়ে যখন মন্থর পদক্ষেপে হেঁটে চলছিলেন—সূর্য্য তখন অস্তাচলে। সন্ধ্যার একটা মায়াময় পরিবেশ তখন যেন চারিদিকে রঙ্গীন সোনার স্বপ্ন বুনে দিয়েছে। শরিদ সন্ধ্যার সে মাধুর্য্য ভুলবার নয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়িয়ে তাঁবুতে এসে বসলেন।

কেষ্টদা, যোগেনদা (ব্যানার্জ্জী) প্রমুখের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার জীবনের প্রত্যেকটা activity (কার্য্যকলাপ), আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সব-কিছু ইষ্টার্থ-পরিক্রমায় চলবে—সেইই হল essence of concentration (একাগ্রতার তাৎপর্য্য)। কোন-কিছুতে আগ্রহ থাওয়া মানে concentration (একাগ্রতা)। আগ্রহ থাকলে বোধি impulse (সাড়া) receive করে (গ্রহণ করে) তদনুপাতিক।

Common factor (উপাদান সামান্য) ধরার কথা যে বলি—সেইটে হয়ে ওঠে concentrating agent (একাগ্রতা সাধনী উপায়)। খ্যাপলা জালের সুতোর মত উপাদান সামান্যকে ইষ্টে সার্থক ক'রে তুললে তার ভিতর-দিয়ে যা'-কিছু ফুটে বেরোয়। বাসুদেবই যে সব—এটা রক্তমাংসসঙ্কুল সত্য হ'য়ে ধরা দেয়। কোথায়, কোন্‌টা, কেন হয় খুঁটিনাটি ক'রে প্রত্যেকটি যা'-কিছু ধরা পড়ে। কোকিলের চোখ লাল হল কেন—এতদূর পর্য্যন্ত কার্য্যকারণ পরম্পরায় আমার কাছে ধরা পড়ত। আর, এর সব-কিছুর মূলে হলেন তত্ত্বপুরুষ বাসুদেব। সব-কিছুর মধ্য দিয়ে স্ফুরণ হ'য়ে তত্ত্বটা স্ফোট-শরীরে প্রকট হয়, তা' না হ'লে গুলিয়ে যায়।

যোগেনদা—অনেকে বলে আমরা finite (সসীম) তাই infinite (অসীম)-কে ঐভাবে ভাবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Infinite (অসীম) মানে আমি বলি unbounded finite (বন্ধনহীন সসীম)।

কেষ্টদা—নামটাই common factor (উপাদান-সামান্য)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! এটা হল abbreviated form of the whole structure (সমস্ত কাঠামোর সংক্ষিপ্ত রূপ)। কম্পন ও শব্দ—কম্পন বাদ দিয়ে শব্দ হয় না। আমি কই অন্য কোন নাম যদি কর, কর। কিন্তু আগে তা' কর পরে এটা। এর ভিতর-দিয়ে মূল কম্পনে পৌঁছান যাবে। এটা করলে পুরশ্চরণ হবে সব-কিছুর। যে যে-অবস্থায় থাক, এ করায় কারও কোন বাধা নেই।

যত যাই করেন না কেন—সেই মানুষটা না হ'লে আর চিঁড়ে ভিজবে না। বৈষ্ণবরা যেমন বলে, যা'-কিছুই হোক আমরা চাই রাধারমণ গোপীবল্লভ।

আদি মানবের শুরু সম্বন্ধে কথা উঠতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আদি মানব যেই হোক, তার কারণ ছিল তো? সেই কারণের সঙ্গে acquainted (পরিচিত) হ'তে হয়েছে তাকে। অনাদি প্রত্যেকের মধ্যেই অনুস্যূত হ'য়ে আছে।

২৯শে আশ্বিন, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ১৬।১০।১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

শরৎদা (হালদার) কতকগুলি নতুন বই নিয়ে এসেছেন, সেইগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালেন। তিনি বইগুলি দেখে খুশী হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে একটা ওমেগা রিস্ট ওয়াচ দিলেন।

শরৎদা ঘড়িটা হাতে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন। কেষ্টদা শরৎদার হাতে ঘড়িটা পরিয়ে দিলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসেছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), যোগেনদা (ব্যানার্জী) প্রমুখ কাছে আছেন।

সমবেত সকলের সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা করি, তার উপর দাঁড়িয়ে পরমপিতা যা' দিতে পারেন দেন। আমরা যদি না করি, আমাদের যোগ্যতা যদি না বাড়ে, তাতে তাঁর তৃপ্তি নেই। সন্তান যদি সক্ষম না হয়, পিতার তার জন্য শুধু ক'রে আরাম নেই। ভগবান সব সময়ই চাচ্ছেন আমাদের সামর্থ্যের উদ্বর্ধন। ভক্তি-বিশ্বাসের পরিচয়ও হলো এই যোগ্যতায়। তিনি বলেছেন

'আমারে ঈশ্বর ভাবে, আপনারে হীন
তার প্রেমে কভু আমি না হই অধীন,
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সকল জগৎ মিশ্রিত
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত।'

তিনি চান প্রবৃত্তিমুক্ত হ'য়ে আমরা নিখুঁতভাবে তাঁর কর্ম্ম ক'রে যাই। গীতায় সেই কথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে। প্রবৃত্তিমুখী হ'লে তো সেখানে আমার বন্ধন এসে গেল। সত্তা অভিভূত হ'য়ে পড়ল। অগ্রগতি রুদ্ধ হ'য়ে গেল। আবার, তাঁকে ভালবাসি অথচ তাঁর জন্য যদি কিছু করা না থাকে, তাহ'লে সে-ভালবাসা একটা সোনার পিতলে ঘুঘু। সে-ভালবাসা ভালবাসাই নয়। ওটা প্রবৃত্তিরই নামান্তর।

আজও বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বেরিয়ে নড়াইলের জমিদার বাড়ী পর্য্যন্ত আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর, বড়মা, সেবাদি প্রমুখ বাড়ীর ভিতর ঢুকে বাড়ীটা দেখলেন।

কেষ্টদা, সুশীলদা (বসু), প্যারীদা (নন্দী), হরেনদা (বসু), মোহন (ব্যানার্জী), প্রফুল্ল প্রমুখ সঙ্গে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ীর কম্পাউন্ডের ভিতর ঢোকার পর তাঁকে একখানা চেয়ার দেওয়া হলো। তিনি সেই চেয়ারের উপর ব'সে কেষ্টদার সঙ্গে টুকটাক কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। অন্যান্য সবাই ঘরটরগুলি ঘুরে দেখলেন।

৩০শে আশ্বিন, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ১৭।১০।১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায়।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু) প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে evolution (বিবর্ত্তন) সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

কেষ্টদা—Evolution (বিবর্ত্তন) ঠিক একটা continuous process (চলমান

পদ্ধতি) ব'লে সবসময় বোঝা যায় না। Sudden jerks (হঠাৎ ঝাঁকি), variations (পার্থক্য), mutations (পরিবর্ত্তন) ইত্যাদিই যেন বড় কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ Jerk (ঝাঁকুনি)-এর পিছনেও যে continuity (ক্রমাগত) নেই তা নয়। Attempt-এর (চেষ্টার) ভিতর-দিয়েই ওটা হয়েছে। ওই jerk-এর জন্য যে preparation (প্রস্তুতি) তা' বরাবর চলছিল। Palpable jerk (বোধগম্য ঝাঁকুনি)-টাই আমাদের চোখে পড়ে—কিন্তু তার আগে আমাদের লক্ষ্য পড়ে না।

কেষ্টদা—দুটো জিনিস আছে। একটা বিচ্ছুরণ, আর একটা তরঙ্গ। তরঙ্গের ক্রমাগতি আছে। বিচ্ছুরণ ক্ষণিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তরঙ্গের মধ্যে বিচ্ছুরণ আছে। বিচ্ছুরণের মধ্যেও তরঙ্গ আছে। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা নয়। বিচ্ছুরণ ও তরঙ্গ দুইয়ের মধ্যেই আছে expansion, contraction ও stagnation (প্রসারণ, আকুঞ্চন ও বিরমণ)।

কেষ্টদা নামের কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কইতে গেলেই আমার অনুভূতির কথা মনে হয়। ঐ কথা মনে হ'লেই কইতে পারি।

হরেনদা এসে বললেন—চাল পাওয়া যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই তো ভাল কথা। বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেলেই স্ফূর্তি লাগে। কুলীন কায়েতের ঘরে জন্মেছিস্ অথচ কাম গোছায়ে নিতে পারবি না, সে কি একটা কথা ?

কথাপ্রসঙ্গে বোধির অর্থ সম্পর্কে বললেন—বোধি—একটা জিনিস feel (অনুভব) ক'রে সেটাকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে যে জ্ঞান হয় তাই।

কেষ্টদা—সত্তা দিয়ে জানা, বুদ্ধি দিয়ে জানায় তফাৎ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা মিস্ত্রি কাঠ ফাড়ছে। সে এতো তলায়ে দেখে না—গাছের প্রাণটা, প্রকৃতিটা কি-রকম। কিন্তু আপনি হয়তো তার প্রত্যেকটি রকমারি বুঝলেন—সবরকম সঙ্গতি নিয়ে, তখন আপনার বোধি হ'ল। Anatomy-র (শারীরস্থানের) জ্ঞান এক জিনিস, আর Physiology (শারীরবিদ্যা) সহ যখন সেইটি জানেন,—তখন তাকে সঙ্গতি সহ জানলেন। Analytically (বিশ্লেষণাত্মকভাবে) ও synthetically (সংশ্লেষণাত্মকভাবে) জানলেন যেখানে, সেখানে বোধি হলো। ধরুন, ঐ গাছ সম্বন্ধে শুধু microscopic analysis (আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ)-এ যে জ্ঞান হয় তাতে কিন্তু বোধি হয় না।

কেষ্টদা—সবটা জানার ভিতর-দিয়ে practical utilisation (বাস্তব প্রয়োগ)-এর অসুবিধা হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হবে কেন ? জানার ভিতর দুটো দিক থাকে, individually (ব্যক্তিগতভাবে) জানা এবং collectively (সমষ্টিগতভাবে) জানা। যেমন বাঁশ গাছকে জানলেন as a class with its common factor (একটা শ্রেণীর উপাদান-সামান্য সহ), আর একটা বাঁশ গাছকে জানলেন individually with all its characteristics (ব্যক্তিগতভাবে তার সমস্ত বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যসহ)। তাতে common factor (উপাদান-সামান্য) সহ প্রত্যেকটা জিনিসের specific character (বিশিষ্ট চরিত্র) জানা থাকায় proper utilisation (বিহিত ব্যবহার) করা যায়।

কেষ্টদা—আপনি বলেছেন একজনকে যেমন খুশী পরিবর্ত্তন ক'রে দেওয়া যায়, কিন্তু যে স্তরে দাঁড়িয়ে সেটা করা যায়, সেখান থেকে বোধ হয় সব ঠিক আছে—এর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকেন্দ্রিক থেকে আপনার প্রকৃতিকে যদি কেউ বোধ করে, তখন সে বোঝে কিভাবে আপনার প্রবৃত্তির নিরসন হবে। তখন সহজ পরিক্রমার পথেই আপনার স্বাভাবিক বিবর্ত্তনই সে চাইবে।

কেষ্টদা—জেমস্ বলেছেন—জানার সমুদ্রের মধ্যে পড়লে জানা যায় না। একটা পথ চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য একটা সূত্র চাই এবং একসূত্রে সঙ্গতিলাভ করা চাই। সুরত যত চড়াই হ'য়ে থাকে, ততই প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি দিক ঠিক ক'রে চলতে ইচ্ছে করে, সেই ঝোঁক হয়। মাতালের মতন নেশা হয়।

শরৎদা—রামকৃষ্ণদেব বলেছেন দেহাত্মবোধ না গেলে ভগবান লাভ হয় না—তার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান লাভ কি, অঙ্ক কষছেন, ভাল ক'রে অঙ্ক কষতেই পারবেন না, যদি দেহাত্মবোধ না যায়। তখন কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির বেগ ঐটেকেই পূরণ করে, অযথা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায় না।

শরৎদা—রামকৃষ্ণদেব ডাব ও শুকনো নারকেলের উপমা দিয়েছেন। ডাবের খোল ও শাঁস আলাদা করা যায় না। কিন্তু শুকনো নারকেলের তা' করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি, আমরা যখন ইষ্টানুগ হই, তাঁর স্বার্থ আমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে যখন, তখন আমার স্বার্থ আর prominent (প্রধান) থাকে না। Negligible (তুচ্ছ) হ'য়ে যায়। ভক্তি ছাড়া ও হয় না।

দূর থেকে মন্মথদা (ব্যানার্জী)-কে অনেকগুলি ওষুধ নিয়ে আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লাস আবেগে চিৎকার ক'রে উঠলেন—বাবা, এ দেখি একেবারে royal approach (রাজকীয় আগমন)।

মন্মথদা ষাট গ্রাম স্টেপটোমাইসিন এবং আরও বহু মূল্যবান ওষুধ নিয়ে এসেছেন। আর তাছাড়া এক বড় ওষুধের দোকানের ম্যানেজারের দীক্ষার ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে বলতে লাগলেন—এ কি অসম্ভব কাণ্ড! আমি তো ভেবে পাই না কিভাবে কী করল? ওর কাণ্ড দেখে এখনও আমার বুকের ভিতর আনন্দের শিহরণ হচ্ছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রম থেকে গাত্রোত্থান করলেন।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় কানুভাই-এর কাছে নিম্নলিখিত চিঠিটি লেখালেন :—

কল্যাণবরেষু,

কানু,

তোমার চিঠি কয়েকদিন আগেই পেয়েছি।

তুমি law (আইন) পাশ করেছ এ সংবাদ আমি আগেই পেয়েছিলাম। তোমার চিঠি পেয়ে আরও খুশী হলাম। পরমপিতার চরণে প্রার্থনা আমার তুমি কৃতী হও, তোমাকে দিয়ে সকলেই পরিপূরিত, পরিপোষিত ও পরিতৃপ্ত হোক।

তোমার চিঠির জবাব আগেই দেব ভেবেছিলাম—কিন্তু এখানকার খবর তো জান।—আমার শরীর-মন ভাল নয়—আমি অশক্ত, অবসন্ন, দুর্ব্বল—তাই ইচ্ছা থাকলেও পারিনি।

তোমার বাবা ও পিসিমা কেমন আছেন? তুমি ভাল আছ তো? শাস্তু, তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা কেমন আছে? শাস্তুর পরীক্ষা কবে? আশা করি সে কৃতিত্বের সঙ্গেই পাশ ক'রে বেরুবে।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো ও যারা চায় তাদিগকে দিও।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার

দীন

'জ্যাঠামহাশয়'

১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ১৮।১০।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে ব'সে একটি বাণী দেবার পর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যে ব্যষ্টিকে জানে না, সে সমষ্টিকে জানে না, ব্রহ্ম জানা তো দূরের কথা। চৈতন্যদেব বলেছেন—তত্ত্বমসি নয়, তস্য ত্বম্ অসি।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শাস্ত্র-সম্বন্ধে যেমন বিকৃত পরিবেশন চলে, তা' দেখে মনে হয়, ও-সব পড়লে আমার তেইশ মারা যেত, কাম বেফাঁস হ'য়ে যেত।

ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভক্তি থাকলেই কর্ম্ম আসে আর কর্ম্ম-অনুযায়ী জ্ঞান হয়। ভক্তির ভিতর-দিয়েই কর্ম্ম ও জ্ঞান ফুটে ওঠে।

কেষ্টদা—অনেকে বলে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ-প্রধান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে প্রাপ্তি ও উপভোগই তো বড় কথা। সে-কথা বাদ দিয়ে শুধু ত্যাগ-ত্যাগ করলে সবই যে শূন্য হ'য়ে যাবে। কিছুই ত্যাগ করা লাগবে না, সব-কিছুকেই ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন ক'রে তোলা লাগবে। ব্যক্তিগত স্বার্থগৃধ্নুতাকে বাদ দিয়ে ইষ্টস্বার্থকে নিজের স্বার্থ ক'রে তোলা লাগবে।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অণ্ডকোষ যে ঝুলে থাকে, বরাবর আমার মনে হতো সেটা air-cooling (তাপ নিয়ন্ত্রণ)-এর জন্য। শুনছি আজকাল বিজ্ঞানে সেই কথা স্বীকার করে।

২রা কার্ত্তিক, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ১৯।১০।১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) নাম সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই নাম হ'ল সর্ব্বপ্রকার কম্পনের মূল mechanism (মরকোচ)। এই কম্পনে কম্পিত থাকলে যে-কোন কম্পনের original cause (মূল কারণ)-এ চলে যাওয়া যায়। কেউ যদি আগে অন্য নাম নিয়ে থাকে তবে এ নাম আগে করে অন্য নাম পরে করলে যে গতিটা cause (কারণ)-এর দিকে যাচ্ছিল—তা' effect (ফল)-এর দিকে চ'লে যাবে—ক্ষতি হবে। র-মহাপ্রাণ বর্ণ, কম্পনাত্মক ধ—stoppage (স্থগিতি), র ও ধ-র পর আ দিয়ে continuity of these waves—succession of these waves হয়। স্বামী—The original to and fro movement—গাড়ীর piston যেমন to and fro চলে। জলের উপর ঢিল পড়লে যেমন up and down movement হয়।

একটা ঘণ্টা যেমন বাজানো হ'ল। প্রথম হ'ল to and fro movement—তার vibration হ'ল শব্দ। প্রথমটা যেন স্বামী, পরেরটা যেন রাধা।

নাম যত মনে-মনে করা যায়—তত nerve (স্নায়ু)-এর উপর pressure (চাপ) ও vibration (স্পন্দন) বেড়ে যায়—তত দুনিয়ার যা'-কিছুকে—pull করার (টেনে তোলার) সুবিধা হয়।

কেষ্টদা—এটা যেন একটা vital spiritual formula (মূল আধ্যাত্মিক সূত্র)—যা' দিয়ে সারা দুনিয়াকে বোধ করা যায় ও explain (ব্যাখ্যা) করা যায়।

সাধনা-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Activity-র উপর না দাঁড়ালে হবার জো নেই। আর, concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে যা'-কিছু করা চাই, তাঁর স্বার্থটাই মুখ্য হওয়া চাই। তা' না হ'লে agile (তৎপর) না হ'য়ে fragile (ভঙ্গুর) হ'য়ে যাই।

ওঁ কথাটা হ'ল finest gross form of the original vibration (মূল স্পন্দনের সূক্ষ্মতম স্থূল রূপ)।

কেষ্টদা—সৎনাম বলতে কী বোঝা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎনাম বলতে বোঝা যায়, সৎ বা বিদ্যমানতার কারণীভূত প্রতীক। সেইরকম ভাবে আপনারা নাম যদি করতেন, urge (আকুতি) নিয়ে লাগতেন, সব মানুষগুলি যে কী হ'য়ে যেত, তার ঠিক ছিল না।

নিজের স্বার্থের knot (গেরো) থেকে গেলে এগোতে দেয় না। কপাট প'ড়ে যায়। তোমার স্বার্থটা মুছে ফেলে দেও। ইষ্টের স্বার্থটাই যেন তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে। তথাকথিত ভাল-মন্দ যা'ই কর। ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাকে যা' পূরণ করে, তাই কর। সেটাকে যা' পূরণ করে না তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেও।

যতীনদা (দাস)—যদি সংসারের জন্য দশবিঘা জমি কিনি, সেখানে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা কিভাবে দেখব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জমি কিনলে ইষ্টের নামেই কেনা উচিত, যদি খুব গোঁড়া হন। হুজুর মহারাজ মাইনে পেয়ে গুরুর কাছে সব টাকা দিয়ে দিতেন, স্বামীজী মহারাজ দয়া ক'রে যা' দিতেন, তাই দিয়েই সংসার চালাতেন। আত্মস্বার্থী হ'লেই কামের তেইশ মারা গেল। এক কলসী দুধে একফোঁটা গরুর চোনা পড়ার মতো অবস্থা হবে। আত্মেন্দ্রীয়-প্রীতি-ইচ্ছা হলেই সর্বনাশ। ভাবলেন ছেলের একটা সুব্যবস্থা করা, সেও তো ইষ্টস্বার্থেরই অঙ্গ, সেটা দেখব না কেন? এইভাবে সেইদিকে হয়তো ট'লে পড়লেন। এমনি ক'রে মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

কেষ্টদা—শিক্ষার ভিতর নূতন সংস্কার কি অর্জ্জন করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' আছে তার উপর দাঁড়িয়ে যা'-কিছু করতে পারেন। যেমন আপনি খাচ্ছেন, যা' আপনার পোষণীয় তাই আপনার শরীরে দাঁড়ায়। যা' তা' নয়, তা' বেরিয়ে যায়। একজন মিস্ত্রীকে যদি গণিতজ্ঞ করতে চান, তাহ'লে তাকে তার কাজের মধ্য-দিয়ে সেইদিকে নিতে হবে।

পারিবারিক যাজন জিনিসটাই আমাদের নেই। প্রত্যেকটি সন্তানকে দীক্ষিত ক'রে তুলতে হয়, ইষ্টমুখী ক'রে তুলতে হয়। যাতে সে প্রবৃত্তির হাতছানি অতিক্রম করতে পারে। আমরা অনেকেই আত্মস্বার্থের জন্য বেকুব ধুরন্ধর হ'য়ে ইষ্টস্বার্থকেই অবহেলা করি। ভাবি—আমি কি অতখানি বেকুব যে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আত্মস্বার্থ বিসর্জ্জন দেব? এটা প্রবৃত্তি ও আত্মস্বার্থের ব্যাভিচার ছাড়া কিছু নয়।

এরপর কাপুরদা ও মালহোত্রাদা আসলেন।

তাঁদের লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যদি ইষ্টকাজ ভাল ক'রে করতে চাও, তাহ'লে আগে বিশিষ্ট দেড় লাখ লোক দীক্ষিত ক'রে তোল। আমরা অনেক সময় নিজেদের স্বার্থই বুঝি না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অশ্বত্থ গাছের নীচে এসে একটা চেয়ারে বসলেন। বহুলোক সমবেত হয়েছে। পাখীর খাঁচা ও চেয়ার তৈরী হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই মনোযোগ দিয়ে দেখছেন।

জনৈক দাদা সাংসারিক অভাব-অভিযোগের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে খাটতে ভয় পায় না এবং যার ব্যবহার ভাল, তার আবার পেটের ভাতের ভাবনা কী?

সত্যদা (দত্ত)—জীবন্ত ইষ্ট থাকতেও তাঁর উদ্দেশ্যে যদি বাড়ীতে আলাদা ভোগ নিবেদন করি, তাহ'লে কি তিনি গ্রহণ করেন, না তা' আমাদের ব্যর্থ যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার ভিতর ইষ্ট যতখানি জাগ্রত, তিনি তেমনি গ্রহণ করেন।

ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিত্য এটা নিষ্ঠা সহকারে করলে মস্তিষ্কে এমন একটা ছাপ পড়ে যে বিপদ-আপদের সময় জাগ্রত হ'য়ে তা' রক্ষা করে। নিত্য এটা করতে থাকলে অস্তিত্বের একটা গুপ্তস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়।

ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নীর অর্ঘ্য চুরি গেলে ভিক্ষা করতে হয় কেন, সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে মনোযোগের অভাবের জন্য চুরি হ'ল, মানুষের কাছে গিয়ে ভিক্ষা করতে হ'লে সেটার খ্যাপন করতে হয়। অনেকে হয়তো মুখ বেঁকায়। অনেকে হয়তো কত প্রশ্ন করে। এর ভিতর-দিয়ে সে নিজের দোষ-সম্বন্ধে আরও সচেতন হ'য়ে নিজেকে সংশোধন করতে চেষ্টা করে।

৩রা কার্ত্তিক, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ২০।১০।১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে।

প্রসঙ্গতঃ কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রশ্ন করলেন—এমনি দিন কি কখনও আসবে যে মানুষের চোখ এত keen (তীক্ষ্ন) হবে যে microscope-এর দরকার হবে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দৃষ্টিশক্তি বাড়ানো চলে বহুদূর। আমি তো আপনাদের বলেছি, আমার কী হয়েছিল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বার্থপরতার কথা বলি, অহং তখন ঐ হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রবৃত্তিগুলি ওর সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যায়। সেটা ভেদ ক'রে আর কিছু চোখে পড়ে না, ওতেই আবদ্ধ হ'য়ে থাকে।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর হুজুর মহারাজ, সরকার সাহেব, পিতৃদেব ও মায়ের ফটো প্রণাম ক'রে আসলেন। তারপর বিজয়ার প্রণাম শুরু হ'ল।

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ২১।১০।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

আজই এখানের কারখানায় তৈরী করা নতুন চেয়ারে প্রথম বসলেন। চেয়ারে বসার পর সকলে আনন্দে 'বন্দে পুরুষোত্তমু' ধ্বনি দিতে শুরু করল।

কাল রাত্রে অনেকে প্রণাম করতে পারেননি।—আজ প্রাতে আবালবৃদ্ধবনিতার বিরাট সমাবেশ হয়েছে বিজয়ার প্রণামের জন্য। ভোরে শ্রীশ্রীঠাকুর ওঠার পর থেকেই প্রণাম শুরু হয়েছে। যতি-আশ্রমে এসে বসার পর যতি-আশ্রমের বেড়ার তিন দিক ঘিরে লোক দাঁড়িয়ে গেল শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ও প্রণাম মানসে।

একই পরিবারে এমনকি স্বামী-স্ত্রীকে বিভিন্ন ঋত্বিক দীক্ষা দেওয়া সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রসঙ্গে বললেন—স্বামী-স্ত্রীর দীক্ষা একই ঋত্বিক দিয়ে হওয়াই ভাল ও সমীচীন। স্বামী আগে একজন ঋত্বিকের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে, তাঁর স্ত্রী হয়তো সেই সময়—দীক্ষা নিল না, পরে দীক্ষা নিতে চায়, তখন তার স্বামীর ঋত্বিক হয়তো উপস্থিত নেই সেখানে, সেক্ষেত্রে আর একজন ঋত্বিককে যদি অনুরোধ করা হয় দীক্ষা দিতে, সেই ঋত্বিকের প্রথম চেষ্টা করা উচিত যাতে সেই মা'র স্বামীর ঋত্বিকের মাধ্যমে দীক্ষা হ'তে পারে। আর একান্তই যদি সম্ভব না হয় এবং তার যদি নিজেকেই দীক্ষা দিতে হয়, সে দীক্ষাপত্রে for অমুক অর্থাৎ সেই মা'র স্বামীর ঋত্বিকের for-এ নিজের নাম সই করবে এবং তাকে ব'লে দিতে হবে তুমি অমুকের

এইসব কথা হতে-হতে একজন দাদা দীক্ষা নিয়ে এসে বললেন—আমি যে আপনার উপর খুব attracted (আকৃষ্ট) তা' নয়, তবে শুনেছি আপনার কতকগুলি technique (কৌশল) আছে, তাই দীক্ষা নিলাম। মনে চাঞ্চল্য, অশান্তি, অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি আমাকে বড়ই পীড়া দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা নেওয়া লাগে দীক্ষার জন্য। তাহ'লেই ওসব adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে যায়। নয়তো মনের চাঞ্চল্য, অভাব, অভিযোগ, অশান্তি দূর করার জন্য যদি কেউ দীক্ষা নেয়, তবে goal (গন্তব্য) হয় ঐটে, behaviour (ব্যবহার)-ও ঐ-রকম হয়, তাতে সামঞ্জস্য আসে না। Concentrated (সুকেন্দ্রিক) হওয়া লাগে ইষ্টে। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হলাম না ইষ্টে, concentric (সুকেন্দ্রিক) হলাম to mitigate my sufferings with the help of Ista (ইষ্টের সাহায্যে আমার দুঃখ লাঘব করতে), তাতে হয় না। দুঃখ আসে কতকগুলি complex (প্রবৃত্তি)-র অসঙ্গতির দরুন। ইষ্টের প্রতি অচ্যুত অনুরাগ ছাড়া তাদের হাত থেকে রেহাই মেলে না। তাঁর জন্য তাঁকে যে চায়—তার সব হয়। সেইজন্য দীক্ষার জন্য দীক্ষা নেওয়া ভাল। জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না। প্রবৃত্তির অধীন যে-আমি সে-আমি একাকী একক নিজের চেষ্টাতেই প্রবৃত্তির উর্দ্ধে উঠতে পারি না। তেমনতর পুরুষমাণ ইষ্টে যদি অনুরক্ত হই, তাহ'লে কিন্তু সহজেই হয়।

উক্ত দাদা চ'লে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওর কথা শুনে মনে হ'ল যাজনেই ত্রুটি আছে। দীক্ষার field (ক্ষেত্র)-ই ওতে প্রস্তুত হয়নি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে আসলেন।

ডাঃ জে সি গুপ্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের Cardiograph করলেন।

এরপর ডাঃ গুপ্ত পূজনীয় অশোক ভাইকেও দেখলেন।

৫ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ২২।১০।১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। আজ শ্রীশ্রীঠাকুর ক্যাস্টর অয়েল খেয়েছেন। মাঝে মাঝে পায়খানায় যেতে হচ্ছে। সেইজন্য বহু লোকজন আসা সত্ত্বেও ঘরের ভিতর বিশ্রাম নিচ্ছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী) আছেন।

চুনীদা কলকাতা উৎসবে খুব ভাল বলেছেন।

সেই-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—বড়-বড় বক্তাদের বক্তৃতাগুলি যোগাড় ক'রে পড়া লাগে আর তাদেরও supercede (অতিক্রম) করতে চেষ্টা করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—নদীর স্রোতে যে জোর হয় সে দুই পার আছে বলে। যদি পার না থাকত তবে স্রোতের বেগ হত না।

বিপ্লব ও বিবর্ত্তনে তফাৎ আছে। বিপ্লবের মধ্যে বিবর্ত্তন নাও থাকতে পারে। হয়তো প্লাবিত ক'রে দিল, কেন্দ্রে আকৃষ্ট করলো না। কিন্তু বিবর্ত্তিত হতে গেলে কেন্দ্রে আকৃষ্ট হওয়া লাগে।

অনেকটা পরে কেষ্টদা Statesman থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন এক বছর পরে ব্রিটেনে একটা national festival (জাতীয় উৎসব) হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে দেড়লাখ ক'রে দেন, আমিও দেখেন festival (উৎসব) করবোনে।

৬ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ২৩।১০।১৯৫০)

কাল থেকে ঋত্বিক অধিবেশন শুরু হয়েছে। সংবাদ পাওয়া গেল, উৎসব সর্ব্বত্র খুব ভাল হয়েছে এবং বিশিষ্ট লোকের দীক্ষা-সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ত্রিপুরা স্টেটে আড়াইশো বিঘা জমি সংগ্রহের সম্ভাবনার খবর পাওয়া গেল নরেশদার (অধিকারী) কাছ থেকে।

আজ সকালে মদনদা (দাস) কলকাতা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য তৈরী চেয়ার নিয়ে আসলেন। চেয়ারটি বেশ সুন্দর হয়েছে। আরও তিনখানা চেয়ার-ধরনের বেঞ্চ এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসার পর চতুর্দ্দিক থেকে দাদা ও মায়েরা, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে এসে বেড়ার বাইরে সমবেত হলেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আইনস্টাইনের 'The world as I see it' বইটা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনতে-শুনতে খুশী হ'য়ে বললেন—আমার সঙ্গে অনেকখানি মিল আছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে সমবেত বিনতি-প্রার্থনাদি শুরু হল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিজয়ার আশীর্ব্বাণী কেষ্টদা পাঠ করলেন।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই বিজয়ার পর বাদ দশহরার দিনে আমার একান্ত প্রার্থনা তোমরা সুখে সুযোগ্যতর হ'য়ে সুসম্বর্ধনায় সুদীর্ঘ জীবন লাভ কর।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলেন।

বাইরে থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এসেছেন।

জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন—ধর্ম্মের জন্য গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস-এর প্রয়োজন হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্ন্যাস আপনি হয়। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস আপনি-আপনি আসে, আশ্রম-পরম্পরার ভিতর-দিয়ে সহজভাবে আসে।

উক্ত ভদ্রলোক—ভগবদ উপলব্ধির জন্য গৃহত্যাগ করতে হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে হয়, না।

উক্ত ভদ্রলোক—তাহ'লে বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব প্রমুখ করলেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যাস, বশিষ্ঠ গৃহত্যাগ করেননি। এও আবার দেখা যায় ঐ-রকম সন্ন্যাসের সৃষ্টি বৌদ্ধযুগের পর থেকে হয়েছে। তখন হয়তো প্রয়োজন ছিল। আমরা গৃহস্থরা বিধ্বস্ত। এদের বাঁচাবাড়ার জন্য কতকগুলি সন্ন্যাসী চাই, যারা মানুষকে ধর্ম্মের পথে পরিচালিত করবে। বাণপ্রস্থ মানে বুঝি, জঙ্গলে যাওয়া নয়। ছোট সংসার থেকে বড় সংসারে যাওয়া, বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকের দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারে চলা।

উক্ত ভদ্রলোক—সংসারে থাকতে গেলে তো লিপ্ত হ'য়ে পড়তে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকেন্দ্রিক হ'য়ে সন্তানুকুল কর্ম্ম করা চাই। নচেৎ হবে না। কর্ম্ম হওয়া চাই ইষ্টার্থে, প্রবৃত্তি পরিতোষের জন্য নয়।

কেষ্টদা—সবাই কি বহু বিবাহের যোগ্য ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকেন্দ্রিক যারা, ইন্দ্রিয়সংযম যাদের আছে, ধাক্কা দিলে যা'-খুশী করে না, সুনিয়ন্ত্রিত যারা, তারাই বহুবিবাহ করতে পারে।

কেষ্টদা—অমনতর সংযত যারা, তাদের বিয়ে করার দরকার কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ঋষিদের কল্পনা ছিল, যাতে ঘরে-ঘরে ভগবান জন্মায়। ভগবান ব্যাস, ভগবান বশিষ্ঠ, ভগবান মনু—এইসব জন্মেছিলেন আমাদের দেশে। সুপ্রজননের বিধান এমন ক'রে করা লাগবে যাতে ঐ-রকম মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়।

উক্ত ভদ্রলোক—নারীরও তো বহুবিবাহ হতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরুষ আদর্শপ্রাণ না হ'লে বিকেন্দ্রিক হয়, আর নারী স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ না হ'লে ব্যাভিচারী হ'য়ে ওঠে। বহুপুরুষের ছাপ মাথায় থাকায়, তাদের সন্তানও বিকেন্দ্রিক হয়। পুরুষের আদর্শপ্রাণ না হ'য়ে কামার্ত্ত হ'য়ে বহুবিবাহ করাও ঠিক নয়। ওতেও সমাজের ক্ষতি হয়।

৭ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ২৪।১০।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

বক্তৃতা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদা (রায়চৌধুরী)-কে বললেন—To the point (যথাযথভাবে) বলা লাগে। এমনভাবে বলবি—আগুন ক'রে তুলবি, সকলকে পাগল ক'রে দিবি। অভ্যাস করতে-করতে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে যায়। যা'-কিছু গুচ্ছ বেঁধে ঐ লাইনেই এসে যায়। শেষটা এমন হ'য়ে যায় যে preparation (প্রস্তুতি) করা লাগে না—এমনিই এসে যায়।

শরৎদা (হালদার) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলছিলেন—কেষ্ট দাসের 'মনুষ্যত্বলাভ' বইটা বেরিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করা হলো—কে publish (প্রকাশ) করেছে কোথা থেকে।

শরৎদা—তা' ভাল করে দেখিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই প্রসঙ্গে আপনাদের বলি, দেখেন অনুসন্ধিৎসা আপনাদের কত কম। Inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা) যদি keen (তীক্ষ্ণ) না হয় তাহ'লে পথে অন্ধকার থেকে যায়।

কেষ্ট দাসের প্রসঙ্গেই বললেন—ওর ক্ষেত্রেই বিশেষ ক'রে দেখা গেছে যে, মানুষকে যতই বড় করা যাক না কেন, সে যদি তা maintain (রক্ষা) করতে না পারে নিজের চরিত্র দিয়ে, তাহ'লে তা' টেকে না।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'স্বাতী নক্ষত্রের জল, পাত্র বিশেষে ফল'—শ্রদ্ধা, প্রীতি ইত্যাদি যদি যথাস্থানে concentric (সুকেন্দ্রিক) না হয় তাহ'লে কিন্তু মুশকিল।

কেষ্টদা, সুশীলদা—আপনিই তো কেষ্ট দাসের কাছে পাঠাতেন। আপনার কথাতেই তো অনেকে ভুল বুঝেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছে। অনেককে শত ব'লেও কিছু করা যায়নি।

শরৎদা—এখনও তো ঐ করেন। ভয়ের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না ক'রে উপায় কী? তা' না হ'লে কি আপনারা ঠিক হন? কম্বলের লোমা বাছতে তো গাঁ উজোড়।

বেলা দশটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে।

শৈলেশ সেন ব'লে সমস্তিপুরের একজন অফিসার শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করছিলেন।

শৈলেশবাবু—আমাকে আপনি কী মনে করেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মনে করি ভগবান কাউকে কিছু কম করে দেননি। আমরাই তা' অপব্যবহার করি। তাঁর সম্পদ প্রত্যেকের মধ্যে তাঁর মতো ক'রে দিয়েছেন। We do not know how to make it profitable (আমরা জানি না কেমন ক'রে তা' উপচয়ী ক'রে তুলতে হয়)।

শৈলেশবাবু—আমাকে আপনি একটু শক্তি দিয়ে দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শক্তি মানুষকে কেউ দেয় না, শক্তি মানুষ পায়—তার আগ্রহ দিয়ে, অনুসরণ দিয়ে। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—কৃপা-বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।

শৈলেশবাবু—সবাই কি দীক্ষার অধিকারী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভাবি, যারা বেঁচে আছে, জীবন আছে যাদের, তাদেরই দীক্ষার প্রয়োজন আছে। ওর ভিতর-দিয়েই জীবনের শক্তি ঠিক খাতে প্রবাহিত হয়।

শৈলেশবাবু—কতজনে গুরুকে পরখ ক'রে গ্রহণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম থেকেই যাদের ভালবাসা ও আত্মসমর্পণ জাগে, সেটাই বেশী কার্যকরী হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রতি মুহূর্তে আমাদের সামনে মৃত্যুর সমস্যা। জীবনের জন্যই দীক্ষার প্রয়োজন। আমরা চাই ইষ্টমুখী জীবন-যাপনের ভিতর-দিয়ে মৃত্যুকে ভেদ ক'রে যেতে। আমরা অমৃতের সন্তান।

শৈলেশবাবু—আপনি কি মনে করেন spiritual (আধ্যাত্মিক) ও material prosperity (জাগতিক ঐশ্বর্য্য) একসঙ্গে সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তাই কই। আমরা আধ্যাত্মিকভাবে যত উন্নতি করব, জাগতিকভাবেও আমাদের অন্তর্দৃষ্টি বাড়বে ততই। শেষটা দেখতে পাব spiritual prosperity (আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য) বাদ দিয়ে কোনও prosperity-ই (ঐশ্বর্য্যই) হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে spiritual এবং material (আধ্যাত্মিক ও জাগতিক), এ দুটো আলাদা নয়। Matter (বস্তু)-এর পিছনেই আছে spirit (আত্মা)। আত্মার প্রকাশই বস্তুতে।

শৈলেশবাবু—আপনি আমাকে টেনে নেন দয়া ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টেনে নেন নয়, আসুন। জগন্নাথের হাত নেই, পা আছে। তাঁকে আঁকড়ে ধরলে তিনি চালিয়ে নিতে পারেন। আমরা তাঁতে concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লে তখনই তিনি আমাদের সত্যিকার কল্যাণ করতে পারেন।

শৈলেশবাবু—আপনাকে বিরক্ত করছি, কিছু মনে করছেন না তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আজন্ম ভিক্ষুক। জন্ম থেকেই ভিক্ষুক মানুষের জন্য। আর মানুষকে উপভোগও করি খুব।

শৈলেশবাবু—আপনি আমাকে দিয়ে করিয়ে নিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ করেন, সুকেন্দ্রিক হন। Religion (ধর্ম্ম) মানে নিজেকে নূতন করে বেঁধে ফেলা গুরুর সঙ্গে—to be born again (নবজন্ম লাভ করা)।

শৈলেশবাবু—আমাকে দেখে তো আপনি বুঝছেন, কী মনে করেন আমার সম্বন্ধে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সম্পদ কিছু কম নেই। কাজে লাগালে ভালই হবে।

শৈলেশবাবু—আমাকে আপনি দয়া করুন, আশীর্ব্বাদ করুন, টানুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার নিজের কথার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন সারাজীবন। এবার আমার কথার উপর প্রাধান্য দেন। আমি বলি আপনার টানেই আসুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে ব'সে আছেন।

জনৈকা মা পুত্রশোকের কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানকে ডাক, তাঁকেই প্রাণ দিয়ে ভালবাস। ওছাড়া আর কোন ওষুধ নেই। প্রাণের জ্বালা আর কিছুতে নেভে না।

৮ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ২৫।১০।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে বললেন—এর মধ্যে অনেক-কিছু মাথায় এসেছিল। ভীড়ের মধ্যে দিতে পারিনি। জেব্রাইল ফেরেস্তা ক'রে যায়। বাণীর মতো আসে। তখন-তখন না দিলে ধ'রে রেখে পরে আর বলতে পারি না।

রাত্রে অশথতলায়। অনেকে উপস্থিত আছেন।

যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী) প্রসঙ্গতঃ জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা যথেষ্ট পরিমাণে শ্রেষ্ঠ যাজী হ'তে পারছি না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত সঙ্কোচ ছেড়ে যাবে, ততই পারবেন।

জনৈক মাড়োয়ারী যুবক—আমি আপানাকে চিনব ও পাব কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিনবি কি ? কর, করার মধ্যে-দিয়েই চিনবি। করা ও করার ফলই চিনিয়ে দেবে। ক'রে বড় হ'। ক'রে বড় হ'য়ে ওঠাটাই হবে চেনার পরখ। আপ্ত

না হ'লে কি প্রাপ্তি হয় ? যার যত আপন হই, তাকে তত পাই। তিনি যার জীবনে যতখানি জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠেন, সে তাঁকে ততখানি পায়।

শচীনদা (গাঙ্গুলী)—ইনি বহু তীর্থ করেছেন। কিন্তু শান্তি পাননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল তীর্থ বাদ দিয়ে কি কোন তীর্থে ফল হয় ? ইষ্টতীর্থই জগৎ-তীর্থ। গুরুপূজা না হ'লে, কোন পূজা হয় না। গুরুই গণেশ।

রমেশ (ঘোষ)—আমি কি বাইরে কোনও কাজ পেলে যাব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। সুবিধা হ'লে যাবি।

যতীনদা—ওয়াক'শপে কাজ করতে যাচ্ছে, ওর শরীরে তো তা' কুলোবে না। পেরেও উঠবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যেতে বললাম, এইজন্য যে যদি না বলি, ওর দাবি বেড়ে যাবে।

দীক্ষা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—টোপ ফেললে যে-মাছের ক্ষুধা আছে, সেই মাছই টোপ গেলে। ক্ষুধা না থাকলে ঠোকায়ে-ঠোকায়ে চ'লে যায়। ব'ড়শী গিললে টেনে উপরে তোলা যায়। না গিললে তোলে কি করে ? মানুষের মুক্তিক্ষুধা বা ঈশ্বরের ক্ষুধা থাকলে সদ্‌গুরু পেলেই তাঁকে গ্রহণ করে। আবার, ঐ ক্ষুধা থাকলেই আচার্য্য বা সদ্‌গুরুকে দেখেই চিনতে পারে। মাতাল যেন আবগারী চেনে।

৯ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২৬।১০।১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অশথতলায় এসে বসেছেন। বহু লোক জড় হয়েছেন।

স্বাস্থ্যের উপর যাজনের প্রভাব সম্পর্কে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাজনের মতো tonic (রসায়ন) আর কিছু নেই। এ একেবারে experimental fact (পরীক্ষিত সত্য)। খুব শীর্ণ মানুষও যে, তার যদি ঐ নেশা ধরে, এমন একটা vital elation (প্রাণদ উল্লাস) হয় যে শরীর আপনা-আপনি সেরে উঠতে থাকে।

দুলালদা (নাথ) একটি দাদার অভাবের কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গৃহস্থ-ঘরে সকলেরই উচিত নিত্য উপার্জ্জন ও খরচ থেকে রেখে দেওয়া। লক্ষ্মীর কৌটো যাকে বলে, তা' সৃষ্টি ক'রে, তাকে বৃদ্ধিপর ক'রে রাখা। তাতে একটা তহবিল জমে যায়। বিরাট তহবিল হয়। তা' খাটিয়ে সংসারের জন্য অনেক-কিছু করা যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে সমিতি গঠন সম্বন্ধে বললেন—সমিতিই কর আর যাই কর, একটা মানুষ অর্থাৎ crystalysing agent (দানাবাঁধার কারিগর) যদি না থাকে, কিছু হবে না। যেমন তোমার হাত-পা কাজ করে, তার পিছনে আছে তোমার মস্তিষ্ক।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য)—হিটলারের আন্দোলনে ছোট-ছোট হিটলার হ'য়েই খারাপ হ'ল। তারা মাত্রা ছাড়িয়ে চ'লে হিটলারের আন্দোলনে ব্যর্থতা এনেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোট হিটলার হয়ই। কিন্তু তারা যদি কপট হয়, তাহ'লে হবে না। তারা যদি বিশ্বস্তভাবে হিটলারের পতাকা বহন করে তাহ'লে দোষ হয় না। অবশ্য, যদি হিটলার পূরয়মাণ সত্তাসম্বর্দ্ধনী হয়।

কর্মিটি গঠন সম্পর্কে আবার কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের একটা দোষ আছে, বিশেষ ক'রে আমরা বাঙ্গালীরা টুকরো-টুকরো হ'য়ে পড়ি। তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমিতিতে সেই-টা বেড়ে যায়; তাতে শক্তি, তেজ, বীর্য হয় না। সংহতিতে ভাঙন যাতে না আসতে পারে, সেদিকে গোড়া থেকেই লক্ষ্য রেখে চলতে হবে।

আমরা যা' করেছি, তা' নিতান্ত কম নয়। কিন্তু দেখতে হবে, আমাদের কী ত্রুটি আছে, এবং তা' কখনও জীইয়ে রাখতে চেষ্টা করব না। যদি এর সম্বন্ধে সংগঠনমূলক সমালোচনা হয়, তাহ'লে দোষ দর্শন করা হচ্ছে ব'লে মনে করব না। সেই ত্রুটিগুলিকে অপনোদন ক'রে যা' করণীয় তা' রূপায়িত ক'রে তুলতে হবে। তাই ব'লে আমরা অযথা ঝগড়া করব না। কর্ম্মীদের মধ্যে থাকে দুই দল। কেউ-কেউ চায় নিজেকে ভাঙ্গিয়ে ইষ্টার্থ পূরণ, আর একদল চায় ইষ্টকে ভাঙ্গিয়ে আত্মস্বার্থ পূরণ। আত্মস্বার্থী যারা তারাই অনেক সময় সংহতিতে ভাঙ্গন ধরায়। অবশ্য, আদর্শের ব্যত্যয়ী কিছু হ'তে দেওয়া উচিত নয়।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়)—সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা তো ভাল। কেউ যদি অন্যায় করে তাকে বলা চলে, এটা তোমার দোষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওভাবে যদি বল, তার ego-তে (অহঙ্কারে) লাগবে। কথার diplomacy (কূটনীতি) চাই, যাকে বলে বাক্‌নিয়ন্ত্রণ।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা অকৃতকার্য্য নই, তবে সাফল্যটাকে এন্তার ক'রে তুলতে পারি না। কারণ, আমরা স্বার্থসন্ধিৎসু। ইষ্টস্বার্থকে যত আত্মস্বার্থ ক'রে নিতে পারি তত যোগ্যতা বেড়ে যায়। যা' চাই তা' করতে পারি না, কারণ, আত্মস্বার্থ বাগাবার বুদ্ধি থাকে।

অনিলদা (সরকার) ও জনার্দ্দনদা—প্রত্যেকের কি সবরকম সম্ভাবনা নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। সবার মধ্যে সব সম্ভাবনা সমানভাবে থাকে না। কিন্তু যার যে বৈশিষ্ট্য সে সেইটের উপর দাঁড়িয়ে বাড়তে পারে, হাত বাড়াতে পারে অন্যদিকে আরোর পথে। পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে সেইটেই বাড়তে পারে, যেটা জৈবী-সংস্থিতিতে আছে। জীবন আছে ব'লে আমরা পরিবেশকে কাজে লাগাতে পারি। আমি যদি না থাকি পরিবেশের সাহায্য নেবে কে ? পরিবেশ যদি আবার না থাকে, তবে আমিই বা থাকি কি করে ? জন্ম নিতেই লাগে মা-বাপ। জন্মের পরে বাড়তেও লাগে পারিপার্শ্বিক। পারিপার্শ্বিক বাদ দিয়ে বাঁচার উপায় নেই। পরিবেশের সাড়া থেকেই মানুষের বোধবিচারের অভ্যুদয় হয়। আর, তাদের সাহায্য নিয়েই হয় তার পুষ্টি-প্রবর্দ্ধনা। পরিবেশ থেকে মানুষ গ্রহণও করে তার জৈবী-সংস্থিতি-অনুপাতিক।

গণচেতনা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কয়েকজন মানুষই একটা আন্দোলনের জীবন হয়। তারাই সব নিয়ন্ত্রিত করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে লালমোহনদা (দাস)-কে ছোট-ছোট প্যামপ্লেট লেখার কথা বললেন।

১০ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ২৭।১০।১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), অনিলদা (গাঙ্গুলী), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ আছেন।

কেষ্টদা—আপনি হয়তো পাঁচ লাখ টাকা চেয়েছেন, একটা প্রতিলোম বিয়ে দিয়ে যদি পাঁচ লাখ টাকা পাওয়া যায়—তাতে ক্ষতি কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও টাকা দিয়ে করব কী ? ঐ টাকা কি আমি চাই ? টাকা চাই, তাই ব'লে অমনভাবে টাকা আনতে বলেছি ? যদি টাকা নেওয়ার মতলব হয়—তবে পাঁচ কোটি টাকা পেয়ে তোমরা একদিন বাংলাকে অন্যের হাতে তুলে দিতে পার।

জনার্দ্দনদা—অনেকের ঐভাবে profit (লাভ)-এর motive (মতলব) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Profit ভাল। কিন্তু ill-profit (খারাপ লাভ) ভাল নয়।

অনিলদা কেষ্টদাকে বলছিলেন একটি দাদার কথা—তাকে কিছুতেই ঠিক করা যাচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যদি নিজেকে শায়েস্তা করতে না পারি তবে অন্য মানুষকে শায়েস্তা করতে পারবো না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু,

খুকি!

তোমার প্রীতি-সম্ভাষণে তৃপ্ত হলাম। তুমি আমার ৺বিজয়ার আন্তরিক স্নেহপ্রীতি ও 'রাস্বা' গ্রহণ ক'রো।

তোমার শরীর ভাল নয়, অনবরত বমি হচ্ছে এবং গায়ে মাথায় কী eruption (স্ফোটক) বেরিয়েছে জেনে খুবই ভাবিত আছি। সুচিকিৎসার যেন কোন ত্রুটি না হয়। কেন এমন হ'লো? Blood test (রক্ত পরীক্ষা) করিয়ে না থাকলে করানো ভাল। রোগটাকে যথাসত্বর নির্ম্মূল ক'রে সেরে ফেলা চাই।

দুশ্চিন্তা, রোগ, শোক, অশান্তি, আতঙ্কে আমি ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছি। এর মধ্যে নূতন ক'রে কারও কোন অসুখের কথা শুনলে আমি যেন আরো হতবল হ'য়ে পড়ি।

খেপু ও বাদল ভাল আছে। এখানকার আর সব একপ্রকার। শাম্তু, কানু, তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা কেমন আছে জানিও।

কল্পনা ছেলেমেয়ে সহ কেমন আছে, জানলে লিখো।

ইতি

আঃ

তোমার

দীন দাদা।

শাম্তু,

তুমি আমার ৺বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশিস জেনো।

তোমার পিসিমার অসুখের কথা জেনে চিন্তিত রইলাম। কবিরাজ দেখাচ্ছ, সে খুব ভাল কথা, প্রয়োজন মনে করলে Blood (রক্ত)টা test (পরীক্ষা) করানো ভাল। যে চিকিৎসাই হো'ক চিকিৎসকের নির্দ্দেশ কাঁটায়-কাঁটায় পালন করতে চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত—নচেৎ আশানুরূপ ফল পেতে দেরী হয়।

তোমার পড়াশুনা কেমন হ'চ্ছে? প্রার্থনা তাঁর চরণে, তুমি কৃতী হ'য়ে সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন কর—সুস্থ দেহে সুযোগ্যতায় সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক।

তোমার বাবা ভাল আছে। তুমি কেমন আছ ?

কানু, তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা ভাল আছে তো ?

ইতি
তোমার
দীন
'জ্যাঠামহাশয়'

কল্যাণীয়াসু,

তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা !

লক্ষ্মী মা আমার !

তোমাদের প্রীতি-অভিনন্দন পেয়ে তৃপ্ত হলাম। তোমরা আমার 'বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশিস গ্রহণ ক'রো।

তোমাদের পিসিমা অসুস্থ—তাঁর দিকে খুব নজর রেখো—প্রীতিপ্রসন্ন সশ্রিৎসু সেবায় তাঁকে অচিরেই সুস্থ ক'রে তোল।

তোমরা ভাল আছ তো ? শরীর-মনে, অভ্যাস-ব্যবহারে, গৃহস্থালী কাজে-কর্ম্মে সব দিক দিয়ে তোমরা সুযোগ্য, সুনিপুণ হ'য়ে ওঠ।

তোমাদের বাবা ভাল আছেন। এখানকার আর সবাই একপ্রকার।

ইতি
তোমাদের
দীন
'জ্যাঠামহাশয়'

শ্রীশ্রীঠাকুর রাতে অশথ গাছের তলায় একটি চেয়ারে বসেছেন। বহু মানুষ আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে জনার্দ্দনদাকে (মুখোপাধ্যায়) শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Top (উপর)-এর মানুষগুলি খুব genuine (খাঁটি) হওয়া দরকার। অহংকার, অভিমান, স্বার্থবুদ্ধি—তাদের যদি কিছুমাত্র থাকে, তাহ'লে ঐ ফাঁকই তাদের মেরে দেবে।

১১ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ২৮।১০।১৯৫০)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। অনেকে উপস্থিত আছেন।

সুবোধ মিত্র ব'লে একজন journalist (সাংবাদিক) আসলেন।

সুবোধবাবু প্রশ্ন করলেন—কী করণীয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের চাই Common Ideal-এ (একাদর্শে) সংহত হওয়া—আর পারিপার্শ্বিকের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হ'য়ে সকলকে তুলে ধরা। কারণ, পারিপার্শ্বিক বাদ দিয়ে কারও বাঁচা সম্ভব নয়। আমরা উদ্বাস্তু। কিন্তু Common Ideal (একাদর্শ) ধ'রে পরস্পর পরস্পরের প্রতি interested (আগ্রহী) ব'লে তত suffer (কষ্ট) করি না। এর মধ্যে খারাপ লোকও কত আছে, কেউ হয়তো চোর, তারও প্রবৃত্তি হয় না নিজেদের কারও ক্ষতি করতে। এক আদর্শে সংহত হ'লে এই স্বার্থবোধটা গজায়। আর, আমরা গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, ধান, শাক-সবজী সবকিছুরই চাষ করি—কিন্তু মানুষের চাষ যদি না করি,—মানুষের জৈবী-সংস্থিতি যাতে ভাল হয় তেমন eugenic adjustment (সুপ্রজননের ব্যবস্থিতি) যদি না করি তো হবে না। Street dog-এর (রাস্তার কুকুরের) মতো হ'য়ে ঘুরব। কুলীনের মেয়ে মৌলিকের ঘরে যাবে এও ঠিক নয়।

সুবোধবাবু—আমাদের বাঙ্গালীদের একতা নেই। স্বার্থপরতা এত,—উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেপেলের বাপ-মার উপর শ্রদ্ধা নেই; ছাত্রের শিক্ষকের উপর শ্রদ্ধা নেই, Ideal (আদর্শ)-কে মানা নেই—তাঁদের প্রতি নতি নেই—এভাবে integrated (সংহত) হব কি ক'রে? Ideal (আদর্শ)-এ concentric (সুকেন্দ্রিক) না হ'লে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

সুবোধবাবু—উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় মহাত্মাজী যেমন প্রচার করেছেন, তেমনি কাগজে-কাগজে কৃষ্টি সম্বন্ধে নিত্য প্রচার করা দরকার। একদিন সতীত্ব আমাদের মেয়েদের পরম সম্পদ ছিল। ঘরে-ঘরে সাবিত্রীব্রত করতো। আজ তা antiquated idea (অপ্রচলিত ধারণা) হ'য়ে গেছে।

সুবোধবাবু—আমাদের শিক্ষাপ্রথাকে mould (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগবে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃষ্টির উপর দাঁড়ান লাগবে। শ্রদ্ধা জাগান লাগবে। শিক্ষাকে practical (বাস্তব) ক'রে তুলতে হবে—শুধু theoretical (পুঁথিগত) নয়। সত্যিকার বিদ্বান ক'রে তুলতে হবে শুধু লেখাপড়ার উপরই জোর না দিয়ে।

সুবোধবাবু—সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন চাই তো? যেমন পণপ্রথার জন্য অনেক মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের কোন movement-ই (আন্দোলন-ই) নেই পণপ্রথার বিরুদ্ধে। সে idea (ধারণা) propagate (সঞ্চারিত) করতে হবে।

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ৩০।১০।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ ও আরও অনেকে কাছে আছেন।

প্রথমে একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু,

অনুকা !

তোমার বিজয়ার প্রীতি-অভিনন্দন পেয়ে তৃপ্ত হলাম। তুমি আমার বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশিস জেনো এবং আর সকলকে আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিও।

তোমার শরীর এখন কেমন ? ওখানকার আর সবাই ভাল আছেন তো ?

তুমি গীটার শিখবে জেনে সুখী হলাম। পরমপিতায় ভক্তি রেখে যতই আমরা যোগ্য হ'য়ে উঠতে পারি ততই ভাল—ততই আমরা আনন্দ পেতে পারি এবং সেবায় সকলকে তুষ্ট-পুষ্ট ক'রে তুলতে পারি। প্রার্থনা তাঁর চরণে—তুমি যেন সকলকে নিয়ে সুস্থ শরীরে সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক।

তোমার কাজলদা ভাল আছে।

ইতি
তোমারই
দীন সন্তান—
"আমি"

দুপুরে খাবার পর বিন্দুমার সঙ্গে কথায়-কথায় বললেন—সব মানুষ চলে নিজেকে ঠকাবার জন্য—ভাবে পরকে ঠকাচ্ছে।

বিকালবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

যতিবৃন্দের পালনীয় নীতি-বিধি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর কতকগুলি নির্দ্দেশ দিলেন—

কাপড়-চোপড় নিজেরাই কাচবে। একান্ত অসুবিধা হলে ধোপাবাড়ী দিতে পার—কিন্তু তাও না দিয়ে পারলে ভাল।

নিজের বাসন নিজে মাজবে, মাঝে-মাঝে সকলেরটা মেজে দেবে। এ হ'লো habit (অভ্যাস) করা, achieve (আয়ত্ত) করা—এ ব্যাপারে বর্ণ নেই।

তোষক ব্যবহারের কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার একটা কম্বল ছিল। কোন সময় শুধু কম্বলেই শুতাম, কোন সময় একটা চাদর পেতে নিতাম।

মসুর, মাসকলাই খাওয়া সম্পর্কে বললেন—খেলে যে জাত যাবে তা' নয়, তবে

যথাসম্ভব বাদ দেওয়া ভাল। Non-irritating, soothing (অনুত্তেজক, স্নিগ্ধকর) সহজপাচ্য জিনিস খাবে।

মুখশুদ্ধি সম্বন্ধে বললেন—লবঙ্গ ও বড় এলাচ খাওয়া যেতে পারে। ছোট এলাচ aphrodisiac (কামোদ্দীপক)। ধনে, মৌরী, হরিতকী, আমলকী খাওয়া যায়। সুপুরী স্বল্প পরিমাণে এক-আধ সময় খাওয়া যায়।

ঘুম সম্বন্ধে বললেন—আমি তো দীর্ঘ দিন চার ঘণ্টা, সাড়ে চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটিয়েছি।

চেষ্টা ক'রে দিনে ঘুমের অভ্যাসটা ত্যাগ করা ভাল—কাজ গুছিয়ে কাজে লেগে যেতে হয়।

কোথাও গিয়ে তাদের তৈরি সরবত খাওয়া সম্বন্ধে বললেন—যাতে infection (সংক্রমণ) না হয় সেইজন্য যেখানে-সেখানে খেতে বারণ করি।

চিড়ে খাওয়া সম্বন্ধে বললেন—গরম জল দিয়ে ধুয়ে খেতে পার। Infection (সংক্রমণ) ও unbalanced excitement (সাম্যহারা উত্তেজনা) যাতে না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আহার্য্য নিয়ন্ত্রণ করবে।

বিষাক্ত ব্যবহার সহ্য করতে পার কেমন test (পরীক্ষা) করা লাগে। একজন হয়তো ইচ্ছা ক'রেই আর একজনকে বিষাক্ত কথা বলল—সে অবস্থায় সে কেমন হজম করতে পারে তা' দেখে অনেকখানি বোঝা যায়।

নিজেকে কখনো ছাড়বেন না—একটা pinhole of fault (দোষের ছিদ্র)-ও রেহাই দেবেন না।

সবসময় নাম করার অভ্যাস করতে হয়। নামের behind-এ (পিছনে) ধ্যান চাই। ধ্যানের behind-এ (পিছনে) অনুরাগ চাই, অনুরাগের সঙ্গে চাই character adjustment (চারিত্রিক নিয়ন্ত্রণ)।

যতি-আশ্রমে লোক সমাবেশ বেশী হ'লে আবহাওয়াটা যেন ঠিক থাকে না।

নিজের ভুল ধ'রে actively (সক্রিয়ভাবে) সেগুলি সংশোধন করা লাগে। Actively (সক্রিয়ভাবে) না করলে কিছু হয় না। যেমন, একজনকে হয়তো ব্যথা দিয়েছি বা তার সঙ্গে বিরোধ বাধিয়েছি, পরে সজাগ হলাম—তখনই তার কাছে গিয়ে সক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করা লাগবে। নিজে শায়েস্তা না হ'লে ছ্যাঁচড়ামি ক'রে যাওয়া লাগবে। স্মরণ রাখা উচিত—আমরা এখানে বৃত্তিগুলি পোষার জন্য আসিনি—সংশোধন করার জন্য এসেছি।

তপপ্রাণ হওয়া মানে নামধ্যান ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে-সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ

যতি-আশ্রমের জন্য পেঙ্গুইন সিরিজ, পেলিক্যান সিরিজের বিভিন্ন বিষয়ক বইগুলি জোগাড় করা লাগবে।

একা আমার জন্য আলাদা কিছু করব না যথাসম্ভব। অবশ্য আমার যদি অসুখ হয়, আমি যদি ওষুধ খাই, সেই ওষুধ যে সুস্থ মানুষদের খাওয়াতে যাব, তার মানে নেই। দোকানে খাওয়ার কথা বারণ করেছি। সদাচারেরও দিক আছে, আবার একাকী selfish enjoyment (স্বার্থপর উপভোগ)-ও checked (নিয়ন্ত্রিত) হয় ওতে।

কাউকে বিরক্ত ক'রে ভিক্ষা ক'রো না। এর জন্য ঢের এৎফাক করা লাগবে—যাতে বিরক্ত না হয়। বহু analysis (বিশ্লেষণ) ও synthesis (সংশ্লেষণ) ঐ সামান্য ব্যাপার থেকে হবে।

আপনাদের family (পরিবার) মানে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'।

মেয়েলোকের কাছে ঘেঁষো না, honourable distance (সম্মানজনক দূরত্ব) বজায় রেখে চলবে।

পরস্পর পরস্পরকে ধ'রে দিতে হয়। নিজেরটা নিজে অনেক সময় ধরা যায় না। আমার দাঁড়ানটা, কথা কওয়াটা, কাজটা আর একজনের কাছে কেমন লাগলো নিজে সব সময় বোঝা যায় না। ধ'রে দিলে তখন-তখনই adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিচার তো থাকবেই। দোষের কথা বললে যেন আবার চ'টে না যান—inferiority complex-এ (হীনম্মন্যতায়) ঘাই লাগে কিনা।

পেটটা সব সময় ভাল রাখা লাগে।

খুব সকালে উঠে ভোর চারটের মধ্যে প্রাতঃকৃত্যাদি, নামধ্যান সেরে বাড়ী-বাড়ী গিয়ে জাগরণী দিয়ে সকলকে জাগিয়ে নামধ্যানে বসিয়ে দিতে হয়। আগে যতদিন এইরকম ক'রে নামধ্যান করিয়েছি ততদিন মানুষও মরেনি। সৎসঙ্গীদের প্রত্যেককে করান লাগে।

কান্নাকাটি করলেও মেয়েদের service (সেবা) কখনও নিতে যাবে না। আর নিজের কাজ নিজেই করবে—যথাসম্ভব অন্যের সাহায্য না নিয়ে।

চা, পান, তামাক, বিড়ি, সিগারেট, দোক্তা ইত্যাদি কোন জিনিসই খেতে যাবেন না।

যার কাছ থেকে যা' নেবে সে elated (উদ্দীপ্ত) হ'য়ে না দিলে নেবে না, সে যেন discomfort (অস্বস্তি) feel (বোধ) না করে। তোমার ব্যবহারে যেন দিয়ে খুশি হয়, তৃপ্ত হয়। তুমি চাইলে কেউ না দিতে পারলেও তার মনে যেন ক্ষোভ না

দিলেও অখুশি হয়ো না। Inferiority complex (হীনম্মন্যতা) যেন না থাকে—অভিমান বা আক্রোশ যেন মনে না জাগে। তোমার উপজীব্য হ'লো প্রীতি অবদান।

এক-একটা বিষয় ধ'রে তুখোড়, তীক্ষ্ন, সর্ব্বতোমুখী আলোচনা করা ভাল—নিজেদের মধ্যে পরস্পর আলোচনা করা ও বোঝা লাগে এতে কথা ও reasoning (কারণ)-এর finer, finer (সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম) রকম বেরুবে। হয় discussion (আলোচনা), না হয় ধ্যান, ধারণা, পাঠ, কীর্ত্তন, কাজকর্ম্ম এর যে-কোন একটা নিয়ে লেগে থাকতে হয় নিরন্তর। আলোচনা স্বাধ্যায়ের একটা অঙ্গ। আলোচনা মানে সম্যক দেখা। শুধু বই পড়লে হবে না—'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্' চাই, বই-পড়ার সঙ্গে আলোচনা, লেখা, বলা, অভ্যাস সব চাই।

কিভাবে চলব, বলব, ব্যবহার করব, দাঁড়াব—rehearsal (মহড়া) দেওয়া লাগে। মনে-মনে ঠিক ক'রে সচেষ্ট হ'য়ে অভ্যাস ক'রে সেইভাবে চলা লাগে।

যতিদের dress (পোষাক) হবে সহজ, সুন্দর, পবিত্র।

যতিদের এইটুকু মনে রাখতে হয় যে, কোন দুঃখীর সঙ্গে, কোন অভাবপীড়িতের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তাদের পরিবারের সঙ্গেও সেই সম্পর্ক। যতিদের নিজ বাড়ী গেলেই যে পাপ হবে তা' নয়। বিশেষ প্রয়োজনে যাওয়া যেতে পারে। যেমন অন্য কোন পরিবারের অভাব বা দুঃখকষ্টের সময় যাওয়া উচিত।

Family-র (পরিবারের) লোকদের service (সেবা) নেওয়া যায় কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন--তাহ'লে তো হ'য়েছে।

কারও বিছানায় কেউ বসবে না, কারও বিছানা কেউ ছোঁবে না—অবশ্য রোগে শুশ্রূষার জন্য ছাড়া।

নামধ্যানের জন্য প্রত্যেকের আলাদা আসন থাকা ভাল।

যারা রান্নাঘরের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারা ছাড়া রান্নাঘরে কেউ কখনও ঢুকবে না; তাহ'লে ওর sanctity (পবিত্রতা) আর কিছু থাকবে না।

মেয়েদের থেকে যথাসম্ভব aloof (আলগা) থাকা লাগে। আর তাদের সঙ্গে সংস্রবের প্ররোচন বাড়াতে নেই।

খেতে বসতে হয় ফাঁক-ফাঁক হ'য়ে। খুব ঘন-ঘন বসলে—আমার মনে হয় salivation (লাল নিঃসরণ)-ও ভাল হয় না। কারণ, attention (মনোযোগ) diverted (বিপথগামী) হয়, digestion (হজম)-ও ভাল হয় না ওতে। একলা বসলে সব থেকে ভাল হয়।

দোকানের তৈরী কোন খাবার খাওয়া যাবে না।

ভিক্ষা ক'রে যা' পাবে সকলে মিলে খাবে। একটা বরবটী পেলেও পাঁচজনে তার পাঁচটা দানা ভাগ ক'রে খাবে।

সহনশীলতা বাড়াতে হয় অভ্যাস ক'রে। আমি যেমন নিজেকে কখনও খাতির করি না।

নিজেদের কাজ যথাসম্ভব নিজেরা ক'রো। সামর্থ্য থাকতে অন্যের সাহায্য নেবে না। 'পারি তো অন্যের করব'—এই বুদ্ধি রাখা লাগে। সব কাজ নিজের করতে অভ্যাস করতে হয়—যেমন হাঁড়িটা মাজলে নিজের হাতে।

যতিচর্য্যা, অষ্টশীল রোজই খুলে দেখা লাগে—কোন্‌টা কতদূর আয়ত্ত হ'ল। আবার test (পরীক্ষা) করতে হয়।

রুটি প্রভৃতি খেতে হ'লে ময়দা নিজে মেখে খাবে। ঘরে তৈরী মুড়ি, মুড়কী, চিড়া প্রভৃতি খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দোকানের কোনটাই খাওয়া যাবে না। Tinned food (টিনকরা খাদ্য) খাওয়া যাবে না।

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ৩১।১০।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে খাওয়ার পর বড়াল-বাংলোর ঘরে।

মায়া মাসীমা বলছিলেন—ওয়েষ্ট এণ্ডে এমন নোংরা ক'রে রাখে···!

শ্রীশ্রীঠাকুর—নোংরা মানে মনও নোংরা।

আমাদের প্রত্যেকের কাজে অবহেলা ও গাফিলতি দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—কেউ কিছু করবে না, একমাত্র পরমপিতার দয়ায় মুখে হাত ওঠে। এইভাবে কি ক'রে চলবে? কেউ যে মানুষ হ'লো না—ভেবে পাই না কী করা যাবে। এক একসময় মনে হয় কয়েকজনকে উঠতে-বসতে, কারণে-অকারণে মার লাগাই, তাড়া কষি, তাতে যদি আর সকলে ঠিক হয়। প্রফুল্লর উপর যদি ঐরকম করি—তাহ'লে হয়তো বুদ্ধিমানরা ঠিক হতে পারে। ভাববে ওকেই যখন এতখানি শাসন করছেন—আমাদের তাহ'লে কতখানি হওয়া দরকার। এমনটা যে করব তাও শরীরের জন্য পেরে উঠি না। একটু চিৎকার করলেই হাঁপিয়ে উঠি—পারি না। আবার কবন দিলে সইতে পারবার মতো লোকও কম।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অশথতলায় এসে বসলেন।

সুধীরদা (দাস) ও মনোহর (সরকার)-কে বললেন—দেখ্, ইষ্টকর্ম্মকে বাদ দিয়ে যা' করতে যাবি তাতেই কিন্তু নষ্ট পাবি। কিছুতেই উন্নতি করতে পারবি না। হাতে কাম করবি আর মুখ মিষ্টি রাখবি। দিন-রাত খাটবি। মাথা, চোখ, হাত-পা এমন ক'রে চলবে যে মানুষ অবাক হ'য়ে যাবে—ভাববে এ magic (যাদু)

নাকি ? আর, চরিত্রকে ঠিক করা লাগবে। আগে যেমন miracle (অলৌকিক)-এর মতন কাজ করতিস্ তেমনি আবার শুরু কর। তোরা যদি ঠিক না হ'স, তবে নূতন যারা আসবে তারাও খারাপ হ'য়ে যাবে। কাজ করবি দ্রুত, সূক্ষ্ম, সুন্দর ক'রে। কাজ যদি উপচয়ী না হয়, সস্তায় সুন্দর ক'রে তাড়াতাড়ি যদি না করতে পারিস, তাহ'লে দক্ষতা বাড়বে কেন ? লোকসানী ঢিলে কাজের ধার দিয়েও যাবি না—সবসময়ই কাজ করা চাই লাভজনক রকমে। চলতি বাজারের সকলকে ছাপিয়ে ওঠা চাই তোদের কাজ। তোদের কাজ এমন হবে যে, তাই-ই মানুষের কাছে একটা মস্ত যাজন হ'য়ে যাবে। কাজের ভিতর দিয়ে যে যাজন হয় তার তুলনা নেই। (সুধীরদার দিকে চেয়ে বললেন)—আগে আশ্রমে একদিন যেমন করেছিস তেমনি সুরু ক'রে দে।

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ১।১১।১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে।

অজয়দা (গাঙ্গুলী) এসে বললেন—অংশু কী পড়বে বুঝতে পারছে না। Philosophy (দর্শন) পড়তে চায়। কিন্তু সেটা ওর real test (প্রকৃত পছন্দ) কিনা তাও বুঝতে পারছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, science (বিজ্ঞান) পড়লেই ঠিক-ঠিক Philosophy (দর্শন) পড়া হয়। Philosophy (দর্শন)-এর চাবিকাঠি হ'লো science (বিজ্ঞান)। অবশ্য, নিজের test (পছন্দ) যাতে তাই পড়াই ভাল।

অংশু—এখন তো ভাল লাগে Philosophy (দর্শন), পরে ভাল লাগবে কিনা জানি না। পাঁচ বছর আগে জীবন সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা ছিল এখন তা' বদলে গেছে। এখন যা' ভাবছি, পরে তা' হয়তো পরিবর্ত্তন হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' কিছুই আমরা করি, তাতে একটা concentric (সুকেন্দ্রিক) রকম থাকা চাই, নচেং shift (পরিবর্ত্তিত) ক'রে-ক'রে চলে, বিচ্ছিন্ন রকম হয়, wisdom (জ্ঞান) আসে না। তবে যাই পড়, science (বিজ্ঞান)-এর জ্ঞান থাকাই লাগে।

সুশীলদা (বসু) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বর্ণনা দিয়ে বললেন—কাজলের নাম করার সময় কী সব অদ্ভুত অনুভূতি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম করেও অনেকক্ষণ বসে। ওর ওসব হ'তে পারে—ওর gene (জনি)-এর মধ্যেই আছে ওসব।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন।

জনৈক দাদা—Concentration (একাগ্রতা) আসে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentration (একাগ্রতা) মানে with centre (কেন্দ্রের সহিত)। যা'-কিছু কর, ইষ্টস্বার্থ-পরিপোষণী ক'রে কর। এর ভিতর-দিয়েই আসে concentration (একাগ্রতা)। আর, সন্ধ্যা-আহ্নিক যেমন-যেমন ক'রে করার উপদেশ আছে—সেইভাবে করা লাগে।

উক্ত দাদা—নামধ্যানের সময় বাজে চিন্তা আসলে avoid করা (এড়ানো) যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Avoid করতে (এড়াতে) চেষ্টা না ক'রে ভাব—কেমন ক'রে ইষ্টার্থ-পরিপোষণী ক'রে তুলবে সেগুলিকে। সবটার মধ্য-দিয়ে একটা common factor (উপাদান-সামান্য) বের করা লাগে, তারই তাৎপর্য্য কোথায় গিয়ে কিভাবে কী হয়েছে বোঝা লাগে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুলার বীজ এবং ছাতিম ছাল তিল তেলে ভেজে সেই তেল কানে দিলে বধিরতা সারে।

১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২। ১১। ১৯৫০)

কাল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর ফিক ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছেন।

আজ বেলা পৌনে এগারটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে আছেন।

হরেনদা (বসু) একজনের সম্বন্ধে বলছিলেন—তিনি হলেন typical (বিশেষ ধরনের) কায়েত। সোজা কথা একটাও ক'ন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কায়েত কি ওরে কয় ? কায়েত তাহ'লে দেখিসনি। সে যেমন বুদ্ধিজীবী, তেমনি ব্যবহারজীবী, তেমনি সহজ সেবাপ্রাণ।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিলেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে এসে বসেছেন।

ঘাটালের দু'জন উকিল দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'রে বললেন—যেন আমরা আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—**আপনারা উন্নত হোন,**

সংহত হ'য়ে উঠুন,

সমস্ত রাষ্ট্রে ছেয়ে যান,

বিশ্বে ছেয়ে যান,

সর্ব্বত্র ছেয়ে যান,

সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
বেঁচে থাকেন—এই-ই
আমার স্বার্থ।

উক্ত দাদারা—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার প্রার্থনা যে, আপনারা শুধু মেদিনীপুর কেন, সারা বাংলায় ছিটিয়ে পড়ুন। প্রত্যেকের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করুন।

১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭, শুক্রবার (ইং ৩।১১।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে ঘাটালের আশুদাকে বলছিলেন—যে জিনিসটা আমরা হারিয়েছি সেটা আমাদের blood-এ (রক্তে) আছে, কিন্তু conception-এ (ধারণায়) নেই। তাই কানের কাছে যদি বারবার বাজাতে পারি, তাহলেই বুঝতে পারবে এটা আমাদের কাছে বাইরের কিছু নয়—কইতে-কইতে বুঝবে।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজের interest (স্বার্থ)-এর জন্য যারা leader (নেতা) হয়—আদর্শ, মানুষ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি যাদের interest (স্বার্থ) নয়—তারা কিছু করতে পারবে না। বাংলার জঙ্গলে বাঘ নেই এ-কথা স্বীকার করতে বা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। আছেই—খুঁজলেই পাওয়া যাবে মনে হয়।

আমাদের নিজস্ব ব'লে এতটুকু যদি consolidated asset (সংহত সম্পদ) না থাকে তবে এগিয়ে যেতে পারবো না। টাকা, মানুষ দুই-ই চাই—মানুষ পেলে সবই পাওয়া যাবে। কৃতী মানুষ যারা তারাই সৃষ্টি করবে টাকা।

এগোতে গেলে চার আল বেঁধে দেওয়া লাগবে। এখানে একটু টুংটাং করলাম—ওখানে একটু টুংটাং করলাম, তাতে হবে না। Simultaneously whole world-এ (একই সঙ্গে সারা পৃথিবীতে) ছড়িয়ে পড়া লাগবে।

অচ্যুত নিষ্ঠা চাই। এমন সময় হয়তো আসলো যে দুই কোটি টাকা দিয়ে আমাকে কিনে নিতে চাইলো—অচ্যুত নিষ্ঠা যদি থাকে তবে কিছুতেই পারবে না।

দেড়লাখের প্রত্যেকে হ'লো আমার কৃষ্টি সৌধের এক-একখানি জীয়ন্ত ইট।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

একটি দাদা তাঁর ছেলের পড়াশুনায় অমনোযোগিতা ও অবাধ্যতার কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছেলেটাকে বললেন—ভাল ক'রে পড়াশুনা কর—বড় হওয়া চাই।

উন্নতি করা চাই। মা-বাবাকে ভক্তি করিস। মা-বাপের উপর ভক্তি থাকলে ভগবান ভালবাসেন তাকে। তার উন্নতি হয়ই।

উক্ত দাদাকে বললেন—ওর'পর অত্যাচার করিস্ না—নজর রাখিস্, নিয়ন্ত্রণ করিস্।

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭, শনিবার (ইং ৪।১১।১৯৫০)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অসুস্থ, মাথা ভার, পেট ভাল নয়, শরীরে অস্বস্তি।

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৫৭, রবিবার (ইং ৫।১১।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

ইছাপুর থেকে কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও প্রফুল্লদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) এসেছেন সদলবলে।

কিরণদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথাও উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তার একটা স্বভাবই হ'চ্ছে—অসৎ-নিরোধ। মানুষ যত আলসে হয়, তত যোগ্যতা ক'মে যায়। অসৎ-নিরোধের প্রবৃত্তিও স্তিমিত হয়। আমাদের মধ্যে আজ সেই অবস্থা। কিন্তু নিজেকে বজায় রাখতে হ'লে অসৎকে নিরুদ্ধ ক'রেই থাকতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিরণদার প্রশ্নের উত্তরে বললেন—Obsession (অভিভূতি)-ই problem (সমস্যা) সৃষ্টি করে এবং তা' যোগ্যতার পথে অন্তরায় হ'য়ে ওঠে।

কথাপ্রসঙ্গে সুশীলদা বললেন—বাহুবলই দুনিয়াকে আজ চালাতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাহুবলও দুর্ব্বল হ'য়ে যায় তাতে। আগে হয়ত যা' পারত, এখন তা' পারে না, পরে আরও পারবে না, যদি শ্রেষ্ঠানুসরণ না থাকে।

কিরণদা—আজকাল সমাজে সবাই যেন অশান্ত, ক্ষুব্ধ, কারও যেন শান্তি নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য' (যে যুক্ত নয় তার বুদ্ধি নেই)।

বিভিন্ন বাণী প'ড়ে শোনানো হচ্ছিল। একটি দাদা কিছু সময় পরে বললেন—ভাষাটা খুব গম্ভীর, সহজ ভাষা হ'লে সুবিধা হয় সবার পক্ষে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাষা আমি compose করে (গুছিয়ে) কই না তো! যেমন আসে তেমনি বলি। আমার মনে হয়, যান্ত্রিক ভঙ্গিতে গেলে অন্যরকম হ'য়ে ওঠে।

উক্ত দাদা—খুব sensitive (অনভূতিপরায়ণ) ও attentive (মনোযোগী) না হ'লে বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা না হ'লে হবে কেন? Idea (চিন্তা) মাথায় ঢুকে nerve, muscle (স্নায়ু, পেশী) বেয়ে কাজে নামবে না তাহ'লে।

২০শে কার্ত্তিক, ১৩৫৭, সোমবার (ইং ৬।১১।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে বৈশিষ্ট্যকে জানে না, সে ব্রহ্মচারী নয়। এক ব্রহ্ম বটগাছ হ'ল, কুকুর হ'ল, মানুষ হ'ল, গরু হ'ল—কেন হ'ল, কেমন করে, কোথায় কী জৈবী-সংহতি বা সংস্থিতি নিয়ে, তা' সে জানে না—সে আবার ব্রহ্মচারী কিসের?

দেবেনদা—কালীয় দমন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, নাগ ব'লে এক অবাধ্য জাতি ছিল। তিনি তাদের জয় করলেন। তারা তাঁকে ও তাঁর culture (সংস্কৃতি)-কে accept (গ্রহণ) করল।

দেবেনদা—গোবর্দ্ধন ধারণ মানে কী? আমার মনে হয় গো-জাতির বৃদ্ধি যাতে হয় তাই করেছিলেন—তাই কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গো মানে পৃথিবীও হয়। গোবর্দ্ধনধারী মানে, যিনি মানুষের জন্ম ও বৃদ্ধির ধারক। এটা একটা aspect (দিক)।

দেবেনদা—রাবণের দশ মাথা ছিল, সে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দশ মাথার বুদ্ধি তার এক মাথায় ছিল, তার যোগ্যতা এত ছিল যে, কুড়ি হাতের কাজ করত।

কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)—Concentration (একাগ্রতা) ও fixation (ত্রাটক)-এ তফাৎ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর Fixation (ত্রাটক) মানে কোনও একটা point (বিন্দু)-এ attention (মনোযোগ) দিয়ে থাকা। তাতে মাথাটা blunt (ভোঁতা) হ'য়ে যায়। অনেকে ত্রাটক ক'রে পাগলও হ'য়ে যায়। Concentration (একাগ্রতা) মানে যা'-কিছুকে ইষ্টস্বার্থে প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করা। Concentration মানে with centre (কেন্দ্রের সহিত)—তাঁরই অনুকূলে সব-কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করা।

প্রফুল্লদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)—অনেকে শুধু নামধ্যান করতে ভালবাসেন। মানুষের সঙ্গে মিশে যাজন করতে চান না। এটা কেমন? এতে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Temperament (মেজাজ) এক-একজনের এক-একরকম, তাতে বলার কী আছে? তবে ধাক্কা খেয়ে মানুষ যদি ঠিক থাকতে পারে, তবে বোঝা যায় ঈশিত্ব এসেছে। আবার, ওভাবে হবে না যে তাও বলা যায় না। কতজন হয়ত বনে জঙ্গলে গিয়ে আত্মবিশ্লেষণে, নামধ্যানে নিজেকে কোনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, তবে এতে অধ্যয়ন হয়, অধ্যাপনা হয় না।

কিরণদা—Cinema (চলচ্চিত্র) তো প্রচারে খুব কাজে লাগতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Cinema (চলচ্চিত্র) একটা মস্ত বড় লোকশিক্ষার বাহন। Cinema (চলচ্চিত্র)-র জন্য ভাল-ভাল বই লেখা লাগে যাতে পুরুষের মধ্যে, মেয়েদের মধ্যে ইষ্টস্বার্থানুগ জীবনীয় ভাবধারাগুলি ছিটিয়ে যায়। নানাভাবে এই জিনিসটা চারান লাগবে—Theatre (নাটক), Cinema (চলচ্চিত্র), কাগজপত্র সবটার মধ্য দিয়ে পরিবেশন করা লাগে—যেদিকে যাচ্ছে, ওই দেখছে।

প্রসঙ্গত দেবেনদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—টেলিস্কোপকে কি সুদর্শন বলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুদর্শন মানে সম্যক দর্শন। কেষ্ট ঠাকুরের ছিল সুদর্শন চক্র। চক্র মানে horizon (দিগন্ত), দূরে বা নিকটে যা'-কিছু আছে, খুঁটিনাটি যা'-কিছু penetrating vision (অন্তর্ভেদী দৃষ্টি) নিয়ে দেখছেন—কিছুই তাঁর চোখ এড়াচ্ছে না। এ দর্শন বিধিপ্রসূত। আর টেলিস্কোপকে বলতে পার তার একটা instrument (যন্ত্র)।

কিরণদা—চক্রের মধ্যে চক্রান্ত sense (বোধ) আছে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' থাকতে পারে। Dictionary (অভিধান)-টা দেখ তো!

পরে dictionary (অভিধান) দেখে ঐ অর্থ পাওয়া গেল।

২১শে কার্ত্তিক, ১৩৫৭, মঙ্গলবার (ইং ৭।১১।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসেছেন।

ব্রজেনদা (দাস) এসেছেন উপনয়ন নিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—তুই তো শেফালি?

ব্রজেনদা—জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জানিস না কী? আমার মনে হয়, শেফালি হয়েছে আর্যসমাজের শ্রীপালি, এই অর্থে। আর, ঐ শেফালিরাই ঠিক-ঠিক পারশব ব'লে মনে হয়। নমঃশূদ্রদের মধ্যে বহু কিছু ঢুকে গেছে। সাবধান! সবাইকে যদি উপনয়ন

দেওয়াও এবং সকলের সঙ্গেই যদি ক্রিয়াকর্ম্ম চালাও, কী যে হ'য়ে যাবে, ঠিক পাবে না—এক ঠেলায় প্রতিলোম হ'য়ে যাবে।

জনৈক দাদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলছিলেন—আশীর্ব্বাদ করবেন যেন আপনাতে মতি থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী একটা ছড়া আছে না? 'শক্তি দিও করতে পারি তোমার সেবা-বর্দ্ধনা,—কর্ম্মহারা এ প্রার্থনায় লুকিয়ে আছে পারব না।' ও ভাল না। আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসব—এই-ই ভাল। তুমি আমাকে ভালবাসাও—এ-কথা কোস না, তফাৎ অনেকখানি হয় ওতে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) পাটনার একটি দাদাকে নিয়ে এসেছেন।

অহিংসা-সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তা যেমন বেঁচে থাকতে চায়, তেমনি বাঁচার অন্তরায় যা', তাকে নিরোধও করতে চায়। রোগ হ'লে ডাক্তার ডাকি, বৈদ্যের দরকার হয়। মায় মাছি-মশা পড়লে অমনি হাত সেখানে চ'লে যায়। সত্তায় অহিংস হওয়া ভাল। কিন্তু অসতে অহিংস হওয়া কি ভাল? রোগ যখন হয়, ডাক্তার যখন ডাকি, তখন হিংসাকে হিংসা করি—ওকেই তো কয় অহিংসা। হিংসায় যে অহিংস—সে সত্তাকে হিংসা করে। আমি বাঁচতে গেলে যেমন আমার বাঁচার অন্তরায় যা', তা' নিরোধ করি। তেমনি আমার বাঁচার উপকরণ যখন পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করতে হয়, তখন তাদের বাঁচার অন্তরায় যা' তাও দূর করা দরকার। নচেৎ নিজের সত্তার প্রতিই হিংসা করা হবে। কারণ, তারা ক্ষুন্ন হ'লে আমি উপযুক্ত পোষণ পাব না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অশ্বত্থগাছের নিচে এসে বসেছেন।

সত্যদা (দে) আসলেন কলকাতা থেকে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যদাকে বললেন—মানুষের প্রকৃতি চায় বাঁচতে, কিন্তু তার প্রবৃত্তিগুলি সত্তাকে ধ্বংস করে। নিজেরা বাঁচতে চায়, পুষ্ট হ'তে চায়, এতেই হয় lussle, (সংঘর্ষ) তাতে আসে দুঃখ। প্রবৃত্তিগুলি ব্যক্তিত্বকে নিকেশ ক'রে দেয়। তখন তার ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। আমি এখন চাই যে তোমার সেই ব্যক্তিত্ব জাগুক, যা' সত্তার বিরোধী একচুল দুর্ব্বলতাকেও spare করবে (ছাড়বে) না, resist (প্রতিরোধ) করবে।

২২শে কার্ত্তিক, ১৩৫৭, বুধবার (ইং ৮। ১১। ১৯৫০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অশথতলায়' উপবিষ্ট।

কান্তিবাবুর (সিংহ) সঙ্গে নিভৃতে কথা হচ্ছে—আত্মোন্নয়ন কিভাবে হতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর--ইষ্টের প্রতি টান থেকে সশ্রদ্ধ সেবানুচর্য্যায় যে development (উন্নতি) হয় সেইটাই normal development (স্বাভাবিক উন্নতি)। জীবনের mission-ই (উদ্দেশ্যই) হওয়া ভাল ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা, নিজের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা নয়—আর ওটাই হল public work (জনসেবা)। তাহ'লে নিজের এবং সপরিবেশের integrity (সংহতি) আপনা-আপনি আসে।

সুশীলদা (বসু)—কান্তিবাবু বলছিলেন, হিংসাকে যখন হিংসা করা উচিত, তখন আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে তো হিংসা করা উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যদি সত্তাবিরোধী হয়। যাই ভোগ করি, এমনতরভাবে করা উচিত যাতে তা' সত্তাপোষণী হয়। এই হিসাব ঠিক রাখা উচিত।

শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)—এর ইষ্টকাজ করার খুব ইচ্ছা। কিন্তু পারিবারিক সমস্যা এর মনকে পীড়িত করে। জমিদারীটা ঠিক হ'য়ে গেলে ভাবনা নেই। কিন্তু তা' না হ'লে family starve করে (পরিবার উপবাস করে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত ঐ নিয়ে ভাবব, তত complex-এ (প্রবৃত্তিতে) ফেঁসে যাব। Up-এ (উপরে) না থাকলে, above-এ (উর্দ্ধে) না থাকলে একটা জিনিসকে control (নিয়ন্ত্রণ) ও adjust (উপযোগী) করা যায় না। পরিবারবর্গ starve (উপবাস) করে করুক, এমনতর ভাব নিয়ে যদি কাজে নামে, তবে starve (উপবাস) করা লাগবে না। 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'।

উক্ত দাদা—আমার স্ত্রী খুব মনোবৃত্ত্যনুসারিণী, সে আমাকে কোনও কষ্ট দেয়নি কখনও, আমি তাকে কষ্ট দেব ভাবতে কেমন লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনোবৃত্ত্যনুসারিণী যদি হয় তবে কষ্ট পাবে না। ভগবান পিছু-পিছু আছেন। হরিশ্চন্দ্রের কথা ভেবে দেখ। সে সপরিবার ইষ্টকর্ম্ম, ঈশ্বরকর্ম্মের জন্য যা'-যা' প্রয়োজন করেছিল। তার বা তার পরিবারের কিন্তু তাতে দুঃখ বোধ ছিল না।

কান্তিবাবু (সিংহ)—আমার মন বড় চঞ্চল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চঞ্চল মন স্থির করার কথা ভাববার দরকার নেই। সব চঞ্চলতা, সব অস্থিরতা নিয়ে আমি তাঁকে ভালবাসি—আর ভালবাসলে যা' করা লাগে, তাই করি। মন স্থির করার জন্য যত ব্যস্ত হব—ততই মন অস্থির হবে।

কান্তিবাবু—যখন কাজের মধ্যে থাকি, তখন একরকম থাকি। কিন্তু একটু নিরিবিলি থাকলেই প্রবৃত্তিগুলি চেপে ধরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' আসে আসুক—তবে আমি তাই-ই করব যাতে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা হয়। মন স্থির থাকে স্থির থাক, অস্থির হয় হোক, কিন্তু আমি চলব আমার পথে।

কান্তিবাবু—আমি যাই-ই করতে যাব, তাতেই আমার ভাইয়েরা interfere (হস্তক্ষেপ) করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Interfere করলে (হস্তক্ষেপ করলে) interference (হস্তক্ষেপ) ভেদ ক'রে যাওয়া লাগবে। যত আপদ আসুক, বিপদ আসুক, দুঃখ আসুক, কষ্ট আসুক, সব overcome (অতিক্রম) ক'রে ইষ্টকাজ যত করতে পারব ততই সেগুলি আমার উন্নতির সহায়ক হ'য়ে উঠবে। হনুমান তাই-ই চেয়েছিল, আর আজও তাই মানুষ হনুমান পূজা করে। হনুমান পূজা না করলে রামজীর পূজা সম্পূর্ণ হয় না।

শৈলেশদা—ওর এক ছেলে লক্ষ্নৌতে পড়ে, তাকে মাসে-মাসে টাকা পাঠাতে হবে, বাড়িতে যাতে দুটো ডাল-ভাত জোটে, তারও ব্যবস্থা করতে হবে, এই চিন্তাই ওকে অস্থির করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই সব চিন্তাই বন্দোবস্ত করতে দেবে না।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি মূর্খ, হিন্দী বলতে পারি না। একদিক থেকে মূর্খ হয়েছি, সে পরমপিতার আশীর্বাদ। পণ্ডিত হলে এসব fresh (তাজা) জিনিস দিতে পারতাম না। তবে দুঃখ হয়, অনেক মানুষের সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলতে পারি না, middle man (মধ্যস্থ) লাগে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ'। (হে শত্রুতাপন, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে উত্থিত হও)।

সুশীলদা (বসু)—Critical moment (সঙ্কট মুহূর্ত্ত) যখন আসে, তখন life turn করে (জীবনের গতি পরিবর্ত্তন হয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Critical moment (সঙ্কট মুহূর্ত্ত)-এর অপেক্ষা করব না। আমার জীবনই যেন এমন হয় যে সমস্ত critical moment overcome ক'রে যায় (সঙ্কট মুহূর্ত্ত অতিক্রম ক'রে যায়)।

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুর অশ্বথতলার উপবিষ্ট।

কান্তিবাবু (সিংহ), জগদীশদা (শ্রীবাস্তব), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গতঃ বললেন—এমন শ্রদ্ধার্হ চলনে চলতে হয় যাতে শত্রুও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন কৌরবদের কাছে। তিনি নারায়ণী সেনা ও স্বয়ং এই দুইয়ের মধ্যে একটাকে নিতে বলেছিলেন—তারাই নিল নারায়ণী সেনা। তাঁর বিরুদ্ধে তাদের অনুযোগ করার ছিল না কিছু। প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী যারা তারা ঐশ্বর্য্যকে চায়, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের প্রভু যিনি তাঁকে চায় না। তোমরা ঐশ্বর্য্যকে চেয়ো না—নারায়ণকে চেও।

নাম-সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শব্দের পিছনে কম্পন আছে। এই নাম হল কম্পনের vocal expression (বাচনিক অভিব্যক্তি)। জলদীবাজী করতে নেই, realisation-এর (উপলব্ধির) উপর আকৃষ্ট হ'তে নেই, আকৃষ্ট হ'তে হয় ইষ্টে। ওতেই সব আসে। অনুভূতিতে আকৃষ্ট হ'লে attention (মনোযোগ) চলে যাবে, তাতেই ইষ্টানুরাগ-উদ্ভূত চিন্তা কম হবে।

সত্যিকার ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হনুমানজী রামচন্দ্রের বোঝা হয়নি, তাঁকেই সে বহন করেছে। রামচন্দ্র রাবণকে ক্ষমা করতে চান। সে বলে, ও হোগা নেহি। সে একলাই সৈন্য সংগ্রহ করেছে, অর্থ সংগ্রহ করেছে, move করেছে (এগিয়েছে), command (আদেশ) করেছে—রামচন্দ্র পাছ-পাছ গেছেন। তোমরাও ঐ রকম হতে পার—তখন free India (স্বাধীন ভারত) কেন, free World (স্বাধীন পৃথিবী) হবে। Freedom (স্বাধীনতা) মানে প্রীতম-প্রিয়ের বাড়ী—সাকী স্থান, প্রিয়ের স্থান করে তুলতে হবে সারা জগৎকে, তখন প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে প্রিয় হ'য়ে উঠবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠবে। "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম।" (হে মনুষ্য, তোমরা সকলে একসঙ্গে চল, একসঙ্গে মিলিয়া আলোচনা কর, তোমাদের মন উত্তম সংস্কারযুক্ত হউক।) আবার হয়ত ভারতকে পৃথিবীর সব জায়গার সব জাতি দেবতা ব'লে নমস্কার করবে। ভারত পৃথিবীর গুরু হবে। ভারতে নাকি তেত্রিশ কোটি দেবতা ছিল—প্রত্যেকটি মানুষই যেন দেবতা—ওদের যেমন angels (দেবদূত) বলত। চাই ঈশ্বরকোটি মানুষ, চাই সেই সিংহের বাচ্চা। সিংহের বাচ্চা বলছি, তিনিই একদিন নৃসিংহ হ'য়ে অসুর বিনাশ করেছিলেন আমাদের দেশে। আবার তেমনি চাই।

চন্দ্রগুপ্ত ছিল এই পাটনায়। চাণক্য তার গুরু ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে দেখা হ'লে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, পারবি আমার কথামত কাজ করতে? চন্দ্রগুপ্ত—পারব। তখন পা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, যাতে নির্ব্বিচারে কৈফিয়ত তলব না ক'রে প্রতিটি কাজ করে। সে তোমাদেরই বাড়ীর কাছে—

আমাদেরই দেশে। আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—তোমরা পারবে? আর বলি পার।

কান্তিবাবু—হ্যাঁ।

টিকটিকি ডাকলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—টিকটিকিও বলল—হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ।

প্রবাদ আছে ক্ষণার জিভ থেকে টিকটিকি হয়েছে।

সহাস্যবদনে বললেন—তাই ব'লে আমি টিকটিকির মুখাপেক্ষী হতে বলছি না।

কান্তিবাবু—শক্তি দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হনুমানজীর মতো বলতে হয় শক্তি আছে, পারব, করব। আমি বলি—চাহনদার হ'য়ো না, তামিলদার হও।

সন্ধ্যার পর নড়ালের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এসে আবার বসেছেন অশথগাছের নীচে।

একটি ছেলে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করল—আপনি বলেছেন চতুর্দ্দিক'কে কোথায় কী ঘটছে—খেয়াল রাখতে, নজর রাখতে--কিন্তু একদিকে মনোনিবেশ করতে না পারলে তো কৃতকার্য্যতা আসে না—তার কী করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি কি সবসময় একদিকে মন দিয়ে রাখ? তা' যদি থাক, তাহ'লে চারিদিকে লক্ষ্য রাখবে কি ক'রে? আর, তা' যদি না থাক, যখনই ফুরসুত পাবে, তখনই চারিদিকে লক্ষ্য রেখে তোমাকে চলতে হবে। নয়তো ফেঁসে যেতে পার। হয়তো সম্ভাব্য বিপদ এড়াবার জন্য যা' করা উচিত ছিল, না করায় সেখানে বিপন্ন হ'য়ে পড়তে পার।